শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

সূচীপত্র।

—কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনা কার্য্যালয়,

হাবড়া।

বস্ত্রহরণ ঘাট।

বিশ্রাম ঘাট।

আলোচনা, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

স্বপ্ন।

স্বপনে তোমায় হেরিনু জননি!
সোণার তরণী মাঝে;
দীপ্ত-কিরীটিনী হৃদয়-ভুলান
ভুবন-মোহিনী সাজে!
রজত লহরী ক্ষীণ প্রবাহিনী
আকুল হরষ ভরে;
জ্যোছনা ছড়ান সারদ নিশায়
চঞ্চলা লহরী করে,
সুখ আলিঙ্গনে ধরেছিল তোমা
আপন হৃদয়'পরে;
গেয়েছিল সুখে প্রীতিমাখা গান
কোমল মধুর স্বরে।
উতরিয়ে সেই কল নিনাদিনী
তুমি মা, উঠিলে তীরে;
ভেসে এসেছিল হাসির লহর
সুদূর দিগন্ত ঘিরে!
আমি তারি পাশে শ্যামবন ছায়ে
কুসুম অঞ্জলি লয়ে;
পূজিতে তোমায় বসিয়াছিলাম
ধেয়ানে বিভোর হয়ে।
ধীরে কাছে এসে কত অনুরাগে
কোলে মা, লইলে তুলি';
ফুল উপাচারে নয়ন ধারায়
পূজিতে গেলাম ভুলি'!
সেই স্নেহ-বুকে মাথাটী রাখিয়া
কখন পড়িনু ঘুমি';
মৃদু সমীরণ চলে গেল ধীরে
নীহার পড়িল ভূমি'!
নাজানি কখন উষারাণী এসে
রজনী করিল ভোর;—
বিহগের গানে স্মৃতিতে মিশা'ল
সোণার স্বপন মোর!

মন-মহিষ।

(১)
আরে মূঢ় মন-মহিষ! আমার,
হিতকথা মোর ধর।
ছে'ড়ে পাগলামি ছুটাছুটি তোর
ঘর পথ যেতে ধর॥

(২)
মিছামিছি ওরে না কাটাস্ কাল,
হ'লো দিবা অবসান।

চকিতে আসিবে আঁধার ঘনায়ে,
বাঘ এসে নিবে প্রাণ ॥

(৩)

করিয়া সংসার-অরণ্যে প্রবেশ'
দেখিয়া বিষয়-তৃণে,—
শ্যামল সুন্দর,—হয়ে প্রলোভিত,
ছুটিলি তাহার পানে ॥

(৪)

'বিষয়' এ তৃণ হয় বিষময়,—
খে'লে খিদে নাহি টুটে।
যত খাবে তত খিদে বেড়ে যায়,
পিয়াসে হৃদয় কাটে ॥

(৫)

কামাদি মশক তৃণে ভরি রয় ;
ঘরিল যে সবে তোরে।
দংশনে তা'দের হইয়ে অস্থির,
উপায় কিছু না হে'রে,—

(৬)

কাপিস্ যাইয়া তুই বারবার
সাধু-সঙ্গ-নদ-নীরে।
যেই ছে'ড়ে নীর আসিস্, আবার
মশক তোরে যে ঘেরে ;

(৭)

সাধু-বাক্য-পঙ্ক মে'খে ভবে পায়,
উ'ঠে তুই কূলে আয়।
বিবেক রবির কিরণে দাঁড়ায়ে
শুষ্ক কর নিজ গায়।

(৮)

দেখিবে তখন মশক দংশনে
আর না ভুগিতে হবে।
—একে একে যত পালাবে মশক ;
তোর সে বিপদ যাবে ॥

(৯)

সাধু-সঙ্গ-নদ-তীর-জাত যত
খেয়ে লও দূর্ব্বাদল।
পিয়ে ভক্তি বারি চল, আয়ুঃ-রবি
না যাইতে অস্তাচল ॥

শ্রীজগবন্ধু চৌধুরী

ধর্ম্ম।

ধর্ম্মেণ জায়তে লোকঃ ধর্ম্মেণৈব প্রবদ্ধতে।
ধর্ম্মেণ গ্রসিতঃ কালে ধর্ম্ম এবাত্র কারণম্ ॥
(মহাভারত)

ধর্ম্মেতেই লোক যাত্রা নির্ব্বাহিত হয়, ধর্ম্মেতেই বর্দ্ধিত হয় এবং ধর্ম্মেতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ধর্ম্মই এ সকলের কারণ।

ধৃ ধাতু ধারণ করা হইতে ধর্ম্মের নাম হইয়াছে, এই হেতু ধর্ম্ম অর্থে জগতের কর্ত্তা। ধর্ম্ম প্রধানতঃ ধারণ-কর্ত্তা বটেন কিন্তু সৃষ্টি ও লয়ের কারণ ও ধর্ম্ম। উদ্ভব, প্রকাশাদি ভাবও ধর্ম্মের, আবার স্থিতি বৃদ্ধি এবং হ্রাসও লয়াদি ভাবও ধর্ম্মের। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই ত্রিবিধ শক্তি ধর্ম্মে সংস্থিত থাকাতেই জগৎ সংসারের কার্য্য সুনিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মবলেই মানব দেবভাব ধারণ করে। ধর্ম্ম গুণেই আমরা অন্যান্য প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছি। ধর্ম্ম সকলেরই আছে, ধর্ম্ম ব্যতীত কোনও পদার্থ বিদ্যমান থাকিত না। তবে

সাধারণ প্রাণী অপেক্ষা আমাদের ধর্ম্ম অধিক, যে পদার্থ অথবা সে জীব কিম্বা যে বিষয় যেরূপ, তাহাতে তদনুরূপ ধর্ম্ম আছে। হস্তী অতি বৃহদাকার বলিয়া যে মানবাপেক্ষা অধিক ধর্ম্মবান তাহা নহে, হস্তীতে যেরূপ থাকা উচিৎ তাহার তাহাই আছে। মানবে যেমন থাকা উচিত, মানবে সেইরূপই আছে। তথাপি সকল মানবে আবার সমান নাই, তাহার কারণ সকলের কার্য্য সমান নহে; আর সকলে সমান গুণান্বিতও হয় না। যাঁহারা যত সদ্‌-গুণান্বিত তাঁহারা ততোধিক ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা যেমন কার্য্য করেন তদনুরূপ ধর্ম্মই তাঁহাদের প্রকাশ পায়। এই ধর্ম্ম শরীরগত নয়, অথচ ধর্ম্মবলেই শরীর সংগঠিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। রক্ত চালিত, মাংস গঠিত অস্থি, মজ্জা, শুক্রাদি এবং জ্ঞান বুদ্ধি আদি যাবতীয় বিষয়ই ধর্ম্মবলে সংগঠিত হইতেছে। এমন কি মস্তকের একগাছি কেশ হইতে নখে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের কার্য্য দেখা যায়। অধিক কি শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গহীন, এমন কি জীবন ত্যাগ হইলেও এই ধর্ম্মের ব্যত্যয় বা অন্যতা হয় না। ইহলোক ও পরলোকে এই ধর্ম্মই আমাদিগের একমাত্র সহায়। যে শক্তির বলে মানবকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা ততোধিক দেবত্ব-ভাব প্রদান করে; পবিত্র আনন্দ উপভোগ করায় সেই শক্তিই ধর্ম্মের। এই ধর্ম্ম মনের শক্তির শক্তি, বুদ্ধি শক্তিরও শক্তি, এবং জ্ঞানের শক্তির ও শক্তি। ধর্ম্ম সামান্য বিষয় নহে। মনে করিলেই ধর্ম্ম হয় না। যুক্তি যুক্ত কর্ম্ম করিলে— বুদ্ধিকে সুমার্জ্জিত করিলে,—সদুপদেশ গ্রহণ করিলে এবং বেদ প্রতিপাদ্য ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে (ইত্যাদি সাধু সম্মত কার্য্যাবলম্বনে) ধর্ম্ম লাভে সক্ষম হওয়া যায়। আর অযত্নে ও অশ্রদ্ধায় সহিত শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান এবং লোক দেখান বাহ্যিক আড়ম্বরাদি ব্যাপারে ধর্ম্ম লাভ হয় না। তদ্রূপ স্থলে ধর্ম্ম লাভ হওয়া ত দূরের কথা, বরং গুরুতর অধর্ম্মই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব ঐরূপ ব্যবহার ত্যাগ করা ধর্ম্মার্থীর পক্ষে কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম সহজ বিষয় নহে; উহা পাইতে হইলে মনকে সুস্থির, বুদ্ধিকে সুমার্জ্জিত, জ্ঞানকে উন্নত করিতে হয়। মনের মলিনতা, অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যাদিকে একেবারে পরিহার পূর্ব্বক (শিক্ষাবলম্বন পুরঃসর) সাধু নির্দ্দেশিত পথে অবস্থান করিতে পারিলে ধর্ম্মলাভ হয়। দৃঢ় ভক্তি, দৃঢ় বিশ্বাস, দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে সৎ-কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে ক্রমে অধিকতর ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়। ভগবান্ বেদব্যাসের মতে অহিংসা সমতা, শান্তি, তপ, শৌচ ও অমৎসরতা এই ছয়টিই ধর্ম্মলাভের উপায়। পূর্ব্বোক্ত রূপ শিক্ষা হইলে এই ছয়টি সহজেই লাভ হয়, তথাপি ইহার এক একটির অনুষ্ঠানে সমস্ত গুলি আপনা হইতেই উপনীত হয়। অতএব উহার এক একটি উপায় অবলম্বনেও ধর্ম্ম পথের পথিক হওয়া যায়। সহজ কথায় তাহাকেই ধর্ম্ম বলে, যাহাতে কাহারও অনিষ্ট না হইয়া ইষ্ট হয় এবং যেরূপ কার্য্য করিলে ঈর্ষা ও দ্বেষাদির হস্তে পতিত হইতে না হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যাবতীয় শাস্ত্রে এই ধর্ম্মলাভের উপায় বিশিষ্ট রূপে বর্ণিত আছে; মহর্ষিগণ এই ধর্ম্মেই জীবন ক্ষেপন করিয়া গিয়াছেন, সর্ব্ব প্রাণীর

পক্ষেই ইহার তুল্য মধুর বিষয় আর কিছুই নাই, ইহাও তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ" এই ধর্ম্ম ব্যতীত কাহারও চলিবার উপায় থাকিতে পারে না, এই ধর্ম্মেই সৃষ্টি, স্থিতি আদির কারণ—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণে দেখা যাউক প্রকৃতই সৃষ্টি স্থিতি আদির কারণ কি না? জন্মভূমি হইতে যে মানব উদ্ভূত হইয়াছে, সেই জন্মভূমি হইতেই পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি যাবতীয় জীবগণ, তরু, লতা গুল্মাদি যাবতীয় উদ্ভিদগণ, স্বর্ণ রৌপ্যাদি যাবতীয় ধাতু সমূহ এবং শ্বেতকৃষ্ণ, নীলাদি বর্ণ, মধুর তিক্ত কটু কষায়াদি রস, স্নিগ্ধ, রুক্ষাদি গন্ধ, শীতল, উষ্ণাদি স্পর্শ, এবং ষড়জ ঋষভও সুখকরাদি শব্দ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় উদ্ভূত হইয়াছে। এইরূপে সকলেরই মূল জন্ম-ভুমি, মানবের মূলে যে জন্মভুমি, ছাগের মূলেও সেই জন্মভুমি। এই-রূপ অশ্বের মূলেও সেই জন্মভুমি। সকলেরই মূল এক বটে; কিন্তু ব্যাঘ্রে ছাগে, অশ্বে রসে, পশুতে মানবে এত বিভিন্ন কেন? কোনও প্রাণী মৃদু প্রকৃতির, আবার কোনও প্রাণী দুর্দ্ধর্ষ ও বলবান কেন? যে মাটিতে শ্বেত বর্ণ পুষ্প-উৎপন্ন হয়, সেই মাটিতেই আবার রক্ত বর্ণ পুষ্প উৎপন্ন হয় কেন? এইরূপ সকল বিষয়ের এত পার্থক্য কেন? যদি এ পার্থক্য না থাকিত তাহা হইলে পশুতে মানবে, সত্যে অসত্যে, কাষ্ঠ পাথরে, লৌহ স্বর্ণে, বিষ্ঠায় চন্দনে ইত্যাদি কোনও বিষয়ে পার্থক্য থাকিত না। জগতে সকলে এক বর্ণের পদার্থ হইয়া থাকিত—এমন নহে, কিছুই থাকিত না। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে—যাহাতে সমস্ত স্থিতি বৃদ্ধি এবং যে যেমন পদার্থ তাহাকে তদনুরূপ আকার ও শক্তি আদি প্রদান করে, ও যাহাতে এই জগৎ চলি-তেছে ঐ শক্তিই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের কার্য্য নিত্য মঙ্গলময়। যাহাকে যেমন করা আবশ্যক জগদীশ্বর তাহাকে সেইরূপই করিয়াছেন, অনু-মাত্রও ব্যতিক্রম করেন নাই; তাঁহার ঐ মঙ্গল-ময় কার্য্যই ধর্ম্ম। ধর্ম্মবলেই বীজ হইতে বৃক্ষ, শোণিতাদি হইতে জীবগণ উদ্ভূত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম আছেন বলিয়া সূর্য্য আলোক ও তাপ প্রদান করেন, ধর্ম্মবলেই মেঘ হইতে বৃষ্টি, আহার্য্য হইতে জীবন ধারণ এবং বিবিধ প্রকারে আমা-দিগের সুখ স্বচ্ছন্দতাদি সম্পাদিত হইতেছে। ধর্ম্ম না থাকিলে পুত্র পিতাকে মানিত না; স্ত্রী নিজ ধর্ম্ম পালন করিত না, কেহ আত্মীয় স্বজনের প্রতি প্রীতি ব্যবহার করিত না, অধিক কি কেহ কাহারও সহিত সম্বন্ধ পর্য্যন্ত রাখিত না। ধর্ম্ম ব্যতীত গোরুতে দুগ্ধ দিত না, কৃষক শস্যাদি উৎপাদন করিত না, সূর্য্য নিয়ত উদয়াস্ত হইতেন না, ঋতু সকল পরিবর্ত্তন হইয়া জীবন রক্ষা ও সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধন করিত না, পৃথিবীতে প্রাণী আদি জীবিত থাকিত না, অধিক কি পৃথিবীরও অস্তিত্ব থাকিত না। দুঃখের পর সুখ, রাত্রির পর দিন ও জন্মিলেই যথাকালে মৃত্যু আদি ও ধর্ম্মের বলে হইতেছে। পৃথিবীতে যত মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলেই জীবিত থাকিলে আহারাভাবে হয়ত প্রাণ বিয়োগ হইত, নয়ত প্রাণীর সমাবেশে পৃথিবীতে তিল মাত্র স্থান থাকিত না, পৃথিবী পাতালগামী হইত: অতএব মৃত্যু ও ধর্ম্মের কার্য্য। এই

সকল ভাবিয়া দেখিলে সৃষ্টির মধ্যে যে ধর্ম্ম, স্থিতির মধ্যেও সেই ধর্ম্ম এবং লয়ের মধ্যেও সেই ধর্ম্মের সমাবেশ লক্ষিত হয়।

কেহ বলেন অহিংসা পরম ধর্ম্ম, কেহ বলেন দয়াই পরম ধর্ম্ম, কেহ বলেন যজ্ঞে পশু বধ করাও ধর্ম্ম। এইরূপ স্বাপেক্ষ ও বিরুদ্ধ মত দেখিয়া ধর্ম্মের প্রতি সংশয়-চিত্ত জন্মিলে ধর্ম্ম লাভ হয় না। শাস্ত্র নানা মতের হইলেও, নীতি বিভিন্ন প্রকার বর্ণিত থাকিলেও, জ্ঞানীর চক্ষে উহা বিভিন্ন দৃষ্ট হয় না; অতএব জ্ঞানাবলম্বন জন্য চেষ্টা করা উচিত, একান্ত যত্ন থাকিলে উহা লাভও হইয়া থাকে। যখন উহা লাভ হইবে, তখন সকলেই সকল প্রকার শাস্ত্রীয় ও মহাত্মাগণের নীতিতেই অব্যক্ত পরমানন্দ বিদ্যমান দেখিতে পাইবেন, তখন সকল অনন্দ-ধর্ম্মানন্দ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এবং সকলকেই সার জানিবেন। তাহা ব্যতীত শাস্ত্র প্রমুখ নীতি ভিন্নরূপে বোধ হওয়া—অন্যথা হইবার নহে। অতএব ধর্ম্মাভিলাষীগণের ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ, ধর্ম্মশিক্ষাবলম্বন ও ধর্ম্মানুশীলনে মনোনিবেশ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ধৃতি ক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহং।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকো ধর্ম্মলক্ষণং ॥

(ষষ্ঠাধ্যায় মনুসংহিতা।)

সন্তোষ, ক্ষমা ধৈর্য্য, অলোভ, শুদ্ধাচার, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্রাদি তত্ত্বজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান সত্য ও অক্রোধ এই কয়েকটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

যাহা ধর্ম্ম তাহাতেই উক্ত দশটীর সমাবেশ আছে; উক্ত দশটী হইতেই ধর্ম্ম, আবার উহার একএকটীকেও ধর্ম্ম বলা যায়। সমস্ত এক হইলে পরম ধর্ম্মলাভ হয়। যশ, দয়া, স্থৈর্য্য, লজ্জা, শৌচ, দম, নিষ্ঠা, তপ, সত্য, ও সরলতা এই যে দশটীকে ধর্ম্মের শরীর বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক অভিহিত হয়, ইহাও পূর্ব্বোক্ত দশটীর প্রকৃত রূপে স্থিতি হয়। উক্ত দশটী লক্ষণের প্রকৃতি ক্রমান্বয়ে পঞ্চমোল্লাস হইতে যথাসাধ্য বলিয়াছি, উহা হইতে ধর্ম্মের বিষয় পাঠক মহাশয় ও পাঠিকা মহাশয়াগণ অনেকটা বুঝিতে পারিবেন এমন আশা করি। ধর্ম্ম সাধারণ বিষয় নহে। উহার প্রকৃত সত্ব ধারণ করা মানবের সাধ্য নয়। তপোনিরত মহর্ষিগণ চিরজীবন আলোচনা করিয়াও উহার শেষ পান্ নাই। কোনও মহাত্মা এইরূপে উহার মহিমা বর্ণন করিয়া মনের আক্ষেপ মিটাইয়াছেন;—

সর্ব্বং গচ্ছতু মে ধর্ম্ম মা যাহি ত্বং স্থিরোভব।
গতেত্বয়ি কুতো ভূমন! ভবানি ভবনাশনম্॥

আমার সমুদায় যাউক হে ধর্ম্ম, আপনি যাইবেন না আপনি স্থির হউন, হে বিশ্বরূপ! আপনি গেলে আমি বিনষ্ট হইব আপনি সকলের আশ্রয় এবং ভক্তি মুক্তির বিধাতা!!!

ধর্ম্মে, ইহাপেক্ষা ঐকান্তিকী নিষ্ঠা আর কি হইতে পারে। ইহাতে ধর্ম্মের অতি উচ্চ মহিমাই প্রকাশ করা হইয়াছে।

জ্ঞানাভাবে অল্প-মতি মানবের মনে নানা গোলোযোগ, অভক্তি ও সংশয়াদি উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম লাভের পক্ষে মহান বাধা ঘটিতে দেখা যায়। অতএব এই সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিবার জন্য দৃঢ় অধ্যবসায় অবলম্বন করাই বিহিত। ধর্ম্ম নিকেতনে যাইবার পথে যে দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ বন লক্ষিত হয়, প্রজ্ঞা বলে

সেই পথে গমন করিতে আরম্ভ করিলে আর তাহা দুর্গম বোধ হয় না. দৃঢ়তা উদ্যম ও ভক্তি আদি আপনা হইতেই সহায় হইয়া সে পথকে পরিষ্কৃত করিয়া দেয় এবং প্রজ্ঞাই তথায় প্রধান সহায় হওয়াতে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে। মত্ত, প্রমত্ত, শ্রান্ত, উন্মত্ত, ক্রুদ্ধ বুভুক্ষিত ত্বরান্বিত, লুব্ধ, ভীত ও কামী এই দশ বিধ বিকৃত স্বভাব লোকের ধর্ম্ম লাভের অধিকার নাই। অতএব উক্ত দোষ গুলিকে সমিত করিবার জন্য একান্ত যত্নবান হইলে নিশ্চয়ই সাফল্য লাভে শক্তি জন্মে।

"যত্র ধর্ম্মোদ্যুতিঃ কান্তির্যত্র হ্রীঃ শ্রীস্তথামতি।"
(মহাভারত ভীষ্ম পর্ব্ব)

যে স্থানে ধর্ম্ম আছেন—তথায় শোভা, কান্তি, লজ্জা, লক্ষ্মী ও বুদ্ধি আছেন। অভিনিবেশ সহকারে তত্ত্বানুসন্ধান করা এখন থাকুক, সাধারণতঃ দেখিতে গেলে পাঠক! এই সংসার হইতেই ইহার অজস্র প্রমাণ পাইবেন। যে সংসারে সকলি অনিয়ম সকলি বিশৃঙ্খল, সকলই বিপরীত, সে সংসারের শোভাই বা কোথা, সে সংসারীর লজ্জাই বা কোথা আর লক্ষ্মীই বা কোথা? পাঠক মহাশয় ও পাঠিকা মহাশয়াগণ ইহা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইবেন, কাম, ক্রোধ হিংসা, দ্বেষাদি পাপ যথায় বিরাজিত তথায় প্রভূত অর্থাদিতেও সুখ শান্তি আদি প্রদান করিতে কোন ক্রমেই সক্ষম নহে। মহর্ষি বেদব্যাস বলিয়া গিয়াছেন, "যিনি অর্থ সিদ্ধির অভিলাষ করেন তিনি অগ্রেই ধর্ম্মাচরণ করুন, যেমন সুরলোক ব্যতীত অন্যত্র অমৃত নাই, সেইরূপ ধর্ম্ম ব্যতীত অর্থ লাভেরও অন্য উপায় নাই।" ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বর পরায়ণ মহর্ষির এই বাক্য কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব! এই উপদেশ বাক্যে সত্যেরও সার নিহিত আছে। ধর্ম্ম কার্য্যের এরূপ পরমাশ্চর্য্য মহীয়সী শক্তি, যে সকল সময়েই ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মন পবিত্র ও উন্নত থাকে এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসের উদয় হইয়া সমুদায় দুঃখ বিষাদ ও তাপাদিকে দূরীভূত করিয়া থাকে। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই স্থানে বিবেচনা করিয়া দেখুন, মানব অর্থলাভের যে উপায় চিন্তা পুরঃসর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, যখন মন উন্নত ও পবিত্র থাকে সে সময়ে যদি উহা অনুষ্ঠিত হয়, তবেই সমধিক ফল লাভও করিতে পারে। কেবল পাপের কারণ যথাভিলষিত ফল পাইতে ব্যাঘাত হয়, ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত দেখুন অর্থ লাভে কত যত্ন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়াদি আবশ্যক করে। এত করিয়াও মানব সুখ দুঃখের হাতে নিপতিত হইয়া কার্য্য করে, সুখের পড়তায় পড়িলে সুখই লাভ করে আর দুঃখের পড়তায় দুঃখই পাইয়া থাকে। সুখের সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। কিন্তু দুঃখের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। সেই সতর্কতা ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য শক্তির বলে সাধিত হইতে পারে না। সুখ দুঃখের গতি স্বাভাবিক, কেহই ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। আর কখন সুখ দুঃখ আসে তাহা সকল মানবে জানে না। অতএব অর্থোপায়ের চেষ্টা কালীন তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখা উচিত। যদি সে সময় সুখের সময় হয়, তবে ধর্ম্ম সহায়ে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যে পরিমাণ ফল লাভ হইত

তাহারও অধিক লাভ হয়। আর যদি দুঃখের সময় হয়, তবে ধর্ম্মানন্দে হৃদয়কে পবিত্র করিয়া যাহা করা যায়, তাহা নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও সফল হয়। এতদ্ভিন্ন অধর্ম্মই দুঃখের এবং ধর্ম্মই সুখের মূল। অধর্ম্ম কার্য্য মাত্রেই যেমন মন অপবিত্র ও অধোন্নত হয়, তেমনি কার্য্যেও স্ফূর্ত্তি না থাকার কারণে দুঃখেরই কারণ হয়। আর ধর্ম্ম কার্য্যে নিশ্চয়ই যে সুখ লাভ হয় তাহাও উপরে বলিয়াছি।

অধর্ম্ম প্রভবঞ্চৈব দুঃখ যোগঃ শরীরিণাং।
ধর্ম্মার্থ প্রভবঞ্চৈব সুখ সংযোগমক্ষয়ং॥ ৬৪॥
(মনুসংহিতা ৬ অ।)

শরীরি-দিগের অধর্ম্ম প্রভাবে দুঃখ এবং ধর্ম্ম প্রভাবে অক্ষয় সুখ লাভ হইয়া থাকে।

যাহাতে নিরানন্দ বিরাজিত সেই অধর্ম্ম দ্বারা সুখ শান্তি পাইবার উপায় কোথায়? অজ্ঞানীরা মোহে ও ভ্রমে পড়িয়াই অধর্ম্ম কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানীগণ অধর্ম্মকে বিষাপেক্ষাও ভয়ানক বোধ করে। যাহাতে আনন্দ বিরাজিত সেই ধর্ম্মাবলম্বন মাত্রেই সুখ শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহারা একবার ধর্ম্মের মধুরাস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারা আর কখনই ধর্ম্ম ব্যতীত থাকিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহাদিগের সুখ শান্তি যে চির দিনই থাকিবে তাহারই বা বিচিত্র কি? আর অধার্ম্মিকদিগের পরিণাম বড়ই ভয়ানক। একবার দুঃখ-পঙ্কে পড়িলে তাহারা ক্রমশঃই বিপরীত দুঃখে পতিত হইয়া থাকে, ক্রমে আর সে পঙ্ক হইতে উঠিবার সামর্থ্য থাকে না; কচিৎ উঠিলেও নিতান্ত হীন অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে।

ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকানাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়॥১৭১॥
(মনুসংহিতা ৪ অ।)

ধর্ম্ম পথে থাকিয়া যদি অর্থাদির অভাব জনিত কষ্ট পাও তথাপি অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না। অধার্ম্মিক দিগের আপাততঃ সুখ সম্পদাদি লাভ হইলেও পরিণামে নিশ্চয়ই বিপদ ঘটে। ইহা দেখিয়া অধর্ম্ম বুদ্ধি ত্যাগ করিবে।

যাহারা অধর্ম্ম পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিখ্যাত ধনী হইয়া থাকে, তাহাদিগের পরিণাম কিরূপ মন-কষ্টের এবং তাহাদের সেই অর্থের পরিণাম কি শোচনীয় তাহা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ অধর্ম্মের অর্থ স্থায়ী হয় না। আর অধার্ম্মিক দিগের কষ্টেরও পরিসীমা থাকে না। বিশেষ উপায়ে অবগত হইলে ইহাও জানিতে পারিবেন। ধর্ম্ম ব্যতীত অর্থ স্থায়ী হয় না, ইহা স্থির নিশ্চিত আছে। আর ধার্ম্মিক দিগের যে অর্থ কষ্টের কথা শুনা যায়। সে কেবল সময় গুণেই হয়। ধার্ম্মিকেরাও যে প্রভূত অর্থ লাভ করেন ইহাও সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগের অর্থ যে অনর্থে ব্যয় হয় না সদ্বিষয়েই ব্যয় হয় তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন;—

ন ধর্ম্মো যত্র বৈ তাত! শূন্য মেবহি কেবলং।
পূর্ণাৎ পূর্ণং নয়েৎ ধর্ম্মো যতঃ পূর্ণ ভবঃ স্বয়ং॥

হে তাত! যেখানে ধর্ম্ম নাই তাহা কেবল শূন্য মাত্র। ধর্ম্ম পূর্ণ হইতেও পূর্ণ এবং পূর্ণেই উপনত করে।

ধর্ম্মই একমাত্র সার, ধর্ম্ম ব্যতীত আর

সকলই অসার। অধার্ম্মিক মানবের আর সারত্ব কোথায়? অতএব যে ধর্ম্ম সারত্ব প্রদান করে, তাহা ব্যতীত শ্রেষ্ঠ আর কি আছে? যদি সারত্ব থাকে তবে অভাবই বা কোথায়? এই অভাবকেই শূন্যত্ব বলে। আর অভাব দূরেই পূর্ণত্ব হইয়া থাকে। ধর্ম্ম বলে যে পূর্ণত্ব পাওয়া যায়, তাহা পূর্ণ হইতেও পূর্ণ এই কারণ ধর্ম্মের দ্বারা আমরা সম্পূর্ণরূপ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হই।

ধর্ম্মাবলম্বনে আপনার এবং অপরের সুখ-সৌভাগ্য সাধন করিতে পারা যায়। যাহা সর্ব্ব প্রাণীর পক্ষে হিতকর এবং আপনার পক্ষে সুখাবহ তাহা করা মানব মাত্রেরই উচিত। ঈশ্বরের নিকট এইরূপ কর্ম্মই সর্ব্বার্থ সিদ্ধির কারণ। ইহলোকে ধর্ম্ম সহায় হইয়া থাকেন কিন্তু পরলোকে সহায় হওয়া সম্বন্ধেই বা কিরূপে সত্য হইতে পারে তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। আবার মহর্ষি মনুও বলিয়া গিয়াছেন;—

মামুত্রঃ হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতি।
নাপুত্রং দারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥

(৮ অ, মনুসংহিতা।)

পরলোকে পিতা, মাতা, পুত্র, পত্নী ও জ্ঞাতি ইঁহাদের কেহই সহায় হন্ না কেবল ধর্ম্মই একমাত্র সহায় হইয়া থাকেন। অতএব কাহারো অনুরোধে ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না।

পিতা মাতার পুণ্যে সন্তান পুণ্যবান এবং শিক্ষিত, পুত্র পুং নামক নরক হইতে ত্রাণ,-স্ত্রী অর্দ্ধেক পুণ্য প্রদান ও জ্ঞাতির পরলোকে তৃপ্তি সাধনাদি করা শাস্ত্র সম্মত হইলেও যাহার যেমন পাপ পুণ্য সে তেমনই ফল ভোগ করে। কিছুতেই তাহা হইতে পরিত্রাণ পায় না, ইহা প্রসিদ্ধিই আছে অতএব কাহারও অনুরোধে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক জাতীয়ের ধর্ম্ম বিভিন্ন হওয়ার কারণ এই পুস্তকের লিখিত বিষয় নহে, ইহাতে বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মের বিষয় মাত্র বর্ণিত হইল। আমাদের যেমন দেশে বাস, জল, বায়ু যেমন, প্রকৃতি যেমন, আমাদের ধর্ম্মও তদনুরূপ। মহর্ষিগণ বহুকালীয় তপস্যা ও অসীম জ্ঞান বলে এই ধর্ম্ম বিধি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন; এজন্য যে কালের ধর্ম্ম যেরূপ হওয়া উচিত, তদনুরূপেই নীতি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।" কলিযুগে সকল যুগের ধর্ম্মই প্রবর্ত্তিত হইবে, ইহাও তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং প্রকৃষ্ট উপায়াবলম্বনে, এ কালের সনাতন ধর্ম্ম লাভ হইলে পারে। যে ধর্ম্মই মানবগণের শ্রেয়ঃ লাভের একমাত্র নিদান, তাহার জন্য সকলেরই যথা সাধ্য যত্নবান হওয়া বিধেয়। ধর্ম্ম কার্য্যের এরূপ অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শক্তি, যে কার্য্যানুষ্ঠান কালে, কার্য্য সময়ে এবং কার্য্য সময়ে এবং কার্য্য নিষ্পন্ন হওয়ার পরে অন্তঃকরণে অতীব পবিত্র আনন্দোদ্রেক করতঃ ভক্ত জনকে সুখ-নীরে অভিষিক্ত করাইয়া থাকে। সে সুখের সহিত কোন সুখেরই তুলনা হয় না। সে সময় শোক, তাপ, দুঃখ, বিষাদ ও বিপদ আপদাদি কোন কষ্টই মনে থাকে না, সে সময় অন্তঃকরণে এরূপ আনন্দ হয় কিনা সন্দেহ। অতএব যিনি সুখ, শান্তি ও সৌভাগ্যাদি লাভে বাসনা করেন, তিনি

ধর্ম্মের স্মরণাপন্ন হউন। যিনি ধর্ম্মের জন্য সর্ব্ব প্রযত্নে যত্নবান হয়েন, তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই ধন্য।

রঘুবীর।

আমাদের নদীয়ার রাজবংশের কথা, ভারতের সর্ব্বত্র বিদীত, ধনে মানে, অতুল সম্মানে তাঁহারা বংশানুক্রমে কোন অংশে হীন নহেন। যে রাজবংশের প্রতি কৃপা করিয়া মা লক্ষ্মী, তাঁহার ঝাঁপি দান করিয়া চিরকাল অতুল ঐশ্বর্য্যময় করিয়া দিয়াছেন, সেই বিশ্ব-বিশ্রুত নদীয়ার রাজ-বংশ কাহার না সুপরিচিত, সেই নদীয়ার রাজবংশের রাজাদের মধ্যে দুই একজন রাজা যে কিরূপ বলবীর্য্যশালী ছিলেন, তাহা হয়ত অনেকেরই অজ্ঞাত। আজ আমরা সেই রাজাদের মধ্যে ইতিহাস-বিখ্যাত রাজা রঘুরাম রায়ের বলবীর্য্যের কাহিনী পাঠকগণের গোচরে আনিব।

রাজা রঘুরাম রায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ নদীয়া জেলার মহারাজেন্দ্র বাহাদুর শ্রীমৎ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পিতা ও ঐ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ রায় হইতে অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ। রাজা রঘুরাম রায়, রাজা হইয়াও নিজের বাহুবলের ও যোদ্ধ বিদ্যার জন্য সর্ব্বত্র রঘুবীর নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি অতিশয় বলশালী ও অত্যন্ত সুকৌশলী ধনুর্দ্ধর ছিলেন। তিনি যেরূপ শারীরিক বলে বলবান তেমনি অসম সাহসী ছিলেন। সচরাচর বাঙ্গালীর মধ্যে নীচজাতীয়দিগকেই বলবীর্য্যশালী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাজা রঘুরাম রায়, রাজা হইয়াও অসীম বলবীর্য্যশালী ছিলেন। তিনি নিজেকে সর্ব্বত্র রাজা অপেক্ষা রঘুবীর, নামেই পরিচিত করিতেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার কথা অদ্যাপি রাজবাটীতে অনেক শুনা যায়, তন্মধ্যে দুইটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। তখন বলশালী লোকের ও পহ্লওয়ানের সর্ব্বত্র আদর ছিল, লোকে বীরত্ব গাথা গাহিতে, মল্লযুদ্ধ দেখিতে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এমন কি এখানকার বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও অবসর সময়ে তাঁহাদের নাতি নাতিনীগণকে বিষ্ণুপুরের রাজার বীরত্ব কথা, সীতারাম রায়ের ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ কাহিনী শুনাইয়া তাঁহাদেরও ঐ সকল বিষয়ে অনুপ্রাণিত হইতে উপদেশ দিতেন, তখন কোন স্থানে মল্ল বা পহ্লওয়ান আসিলে তাহার সহিত বলশালী লোকের কুস্তী হইত, আর গ্রামের ধনশালী ব্যক্তি বা রাজাগণ জেতাকে পুরস্কার দিতেন।

এমন সময়ে একদিন মুরশিদাবাদের নবাব বাটীতে কোন দেশ হইতে দুইজন অসীম বলবান মল্ল আসে। কিন্তু সেই মল্ল দুইজনের বাহুবল এমন জগৎ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল যে, কেহই তাহাদের সহিত বাহুবলের প্রতিযোগিতা করিতে সাহসী হইতে ছিল না। মুরশিদাবাদে একজ কেহই তাহাদের সহিত মল্লতা দেখাইতে সাহস করিল না। সুতরাং তৎকালীক নবাব নিতান্ত লজ্জিত হইলেন ও নদীয়ারাজ রঘুরাম রায়কে নদীয়া হইতে দুইজন উৎকৃষ্ট মল্ল তাহাদের সহিত প্রতিযোগীতা করিবার জন্য পাঠাইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু উক্ত মল্ল দুইজনের খ্যাতি নদীয়াতেও প্রকাশিত হইয়া

ছিল, সেজন্য নদীয়া হইতেও কেহ যাইতে সাহসী হইল না। তখন রাজা রঘুরাম রায় নিজে মুরশিদাবাদ উপস্থিত হইলেন ও নবাবকে জানাইলেন যে, নদীয়া হইতে উপযুক্ত মল্ল আনান হইয়াছে। উভয় দলের বিক্রম-প্রকাশ দর্শন করাইবার জন্য একটা দিন ধার্য্য হইল। ধার্য্য দিনে যথা সময়ে বিখ্যাত মল্ল দুইজন সমর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া বাহুবা স্ফোটনে, পদ ভরে মেদিনী টলটলায়মান করিয়া তুলেন। নবাব রঘুরামকে বলিলেন "তোমার মল্ল কই" তিনি বলিলেন, "এখানেই আছে, বলিয়া নিজেই গাত্রের বস্ত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের সহিত প্রতিযোগীতার জন্য মল্লভূমিতে অবতরণ করিলেন। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ রাজাকে স্বয়ং মল্লে অবতরণ করিতে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। রঘুরাম অপেক্ষা না করিয়া মল্লদুইজনকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ ঐরূপ ভাবে থাকিবার পর নবাব বলিলেন "যুদ্ধ কর।" রাজা বলিলেন, "যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব, তাহারা অনেক পূর্ব্বে পঞ্চত্ব পাইয়াছে।"

রঘুরামের বীরত্ব ব্যঞ্জক ঐরূপ অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কিম্বদন্তী রাজবাটীতে অদ্যাপি প্রচার আছে। যাহাহউক যদি পাঠকগণ এই সকল কিম্বদন্তীতে কিছু মাত্র সন্দিহান হয়েন, সেজন্য আমরা ইতিহাস-বিখ্যাত যুদ্ধ স্থানে রাজা রঘুরামের অসীম সাহস ও যুদ্ধ বিদ্যার বিষয় অবগত করাইবার জন্য নিম্নে তাহার উল্লেখ করিলাম।

সেকালে নবাব মুর্শীদকুলী খাঁ রাজস্বের জন্য বঙ্গের রাজা জমীদার, উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে কঠোর উৎপীড়নে জর্জ্জরিত করিতে ছিলেন ও রাজস্ব দিতে দেরী হইলে তাহাদিগকে অকথ্য অত্যাচারে নিষ্পিড়িত করিয়া শেষে কারাগারে বন্দী অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই সময় নদীয়ার রাজা রামজীবনও নিজ রাজস্ব দিতে না পারায় কারাগারে বদ্ধ হয়েন। সেই সময় রাজা রামজীবনের পুত্র রঘুরামও পিতার নিকট মুর্শীদাবাদে উপস্থিত ছিলেন।

মুর্শীদকুলীখাঁর অত্যাচর বাঙ্গালার সমস্ত রাজাই মাথা পাতিয়া সহ্য করেন নাই। অনেকে নিজ বাহুবলে তাহার অত্যাচার-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তার মধ্যে রাজা সীতারাম রায় ও রাজসাহির রাজা উদয় নারায়ণ প্রসিদ্ধ। রাজা উদয়নারায়ণের সহিত মুর্শীদকুলীখাঁর বীরকিটী * নামক স্থানে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ হয়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি সেই সময় রঘুরাম মুরশিদাবাদে ছিলেন। নবাব মুর্শীদকুলীখাঁ যখন লাহরিমাল ও সেনাপতি মহম্মদ জানকে উদয় নারায়ণকে স্ববশে আনিবার জন্য বিপুল সৈন্য সহ প্রেরণ করেন, সেই সঙ্গে রঘুরামও তাহা-

* বীরকিটীর গড়বাড়ী একটী নাতুচ্চ্য পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। পাহাড়ের নীচে পরিখা খনন করিয়া শত্রুর অগম্য করা হয়। ঐ পরিখা, বীরকিটীর গড় ও ক্ষুদ্র পাহাড়ের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। বীরকিটী ই, আই রেলের লুপলাইনের মুরারই ষ্টেসন হইতে প্রায় ৪।০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম ও সুলতানাবাদের বর্ত্তমান রাজধানী মহেশ পুরের নিকটে অবস্থিত। মুরশিদাবাদের ইতিহাস।

দের সহিত যুদ্ধে গমন করেন। জগন্নাথ পুরের গড়ের নিকট একটী উচ্চ প্রশস্ত পার্ব্বত্য প্রান্তরের নিকট নবাব সৈন্যেরা শিবির সন্নিবেশ করে। একদা লাহরী মাল স্বীয় সেনা নিবাসের বহুদূরে রঘুরামের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার সঙ্গে মাত্র পাঁচজন যোদ্ধা ছিল। বিপক্ষ পক্ষীয় সেনাপতি আলিমহম্মদ এই অসতর্কতার সংবাদ পাইয়া অসি চর্ম্ম ধারণ করিয়া দ্রুতগামী অশ্বারোহণে অস্ত্রধারী বলবান ঊনবিংশতি জন সৈন্য লইয়া সহসা লাহরী মালের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া লাহরী মাল নিতান্ত ভীত হইয়া রঘুরামকে বলিলেন—"আমাদের সৈন্যগণ বহুদূরে অবস্থিত, শত্রুগণ নিকটে উপস্থিত এক্ষণে কি করা যায়, আমরা দুর্ব্বল, বিপক্ষপক্ষ সবল, ও অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত, এসময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয় আমরা পরাভূত ও হত হইব।" রঘুরাম উপস্থিত বিপদে পড়িয়াও অত্যন্ত ধীরতা ও সাহসের সহিত বলিলেন,—" প্রথমতঃ রণ বিমুখতাই অতি লজ্জাকর, দ্বিতীয়তঃ আমরা পলায়ণ করিলে আমাদের সৈন্য গণ ও ভীত হইয়া পলায়ণ করিবে ; তৃতীয়তঃ এইরূপ যুদ্ধে পলায়ণ করিলে শত্রু হস্তেই হউক আর নবাবের হস্তেই হউক আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না, প্রথমে ৪। ৫ জনকে আমিই নিহত করিতে পারিব এবং সকলে মিলিয়া অবশিষ্ট কয়েক জনকে নিশ্চয় পরাভূত করিতে পারিব।

তাঁহারা এইরূপ কথোপকথনে নিবিষ্টচিত্ত রহিয়াছেন, এমন সময়ে আলি মহাম্মদ তাঁহাদের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার তরবারী নিষ্কাসিত করিয়া লাহরী মালের দিকে অগ্রসর হইল। লাহরী মাল হঠাৎ শত্রুর কবলে পতিত হইয়া নিতান্ত ভীতত্রস্ত হইয়া রঘুরামের পশ্চাতে আসিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইলেন ও নিতান্ত ভীত কণ্ঠে কহিলেন, শত্রু নিকটেই আসিয়াছে, তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, তুমিই না আমাকে আশ্বাস দিয়াছিলে? এখন উভয়কেই যে শমন সদনে যাইতে হইবে। রঘুরামবীর অসমসাহসী, সম্মুখ বিপদে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"ও আর একটু অগ্রসর হইলেই আমি উচিত শাস্তি দিতেছি।—" ইতি মধ্যে রঘুরাম আকর্ণ পুরিত সন্ধানে হস্তস্থিত তীরধনুক দ্বারা আলীমহাম্মদকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলেন। অব্যর্থ সন্ধান! বাণ আলীমহাম্মদের বক্ষ ভেদ করিয়া বহু দূরে গমন করিল। আলীমহম্মদ অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইল এবং কাতরস্বরে রঘুরামকে কহিলেন, "আমি অনেক সংগ্রাম করিয়াছি কিন্তু তোমার তুল্য ধনুর্দ্ধর কখনও দেখি নাই, তোমার বীর্য্য

† জগন্নাথ পুরের গড় বীরকিটী হইতে একক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত, এই স্থানে উদয় নারায়ণের দুর্গ নির্ম্মিত ছিল, ঐ দুর্গের মধ্যস্থলের ভূমি আরও উচ্চ ছিল সেই, উচ্চতর ভূভাগ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া তাহার অভ্যন্তরে সৈন্যাধ্যক্ষ্য গণের বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার নিম্নস্তরের ভূখণ্ডও প্রাচীর বেষ্টিত হইয়া সৈন্যগণের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। এই প্রাচীরের নীচেও সুগভীর খাত পরিখারূপে খনিত হইয়াছিল ; এই জগন্নাথ পুরের গড়ের পরীখাদি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যস্থলে সানন্দিত সাহাবের দরাপ স্থাপিত হওয়ায় এক্ষণে লোকে তাহাকে সানন্দিত সাহেবের গড় বলে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস।

ও অব্যর্থ শর সন্ধান দর্শনে ভীত হইয়া আমার সৈন্যগণ পলায়ন করিয়াছে। বীরবর, আমার বড়ই জল পিপাসা হইয়াছে, আমায় কিঞ্চিৎ জল দিয়া এই আসন্ন মৃত্যু কালে তৃপ্ত কর। দয়ার্দ্র চিত্ত রঘুরাম তাহাকে জল দিয়া বলিলেন, "আমার ইচ্ছা তোমাকে আমাদের শিবিরে লইয়া যাইয়া শুশ্রূষা করি। যদি আর তোমার কোন ইচ্ছা থাকেত বল, আমি তাহা পালন করিবার চেষ্টা করি। আলীমহম্মদ অতি কাতর বচনে বলিল—"আর ও কথা কেন বল, তোমার অব্যর্থ শর সন্ধানে আমার হৃদয় ভেদ হইয়াছে, আর কোন ক্রমে বাঁচিব না, সময় ও নাই। তোমার ন্যায় বীর পুরুষের হাতে মৃত্যুতে আমার কোন দুঃখ নাই। "সেনাপতির পতনে সৈন্যগণ ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িল। মূল কথা একমাত্র রঘুরামের সাহায্যেতেই বীরকিটীর যুদ্ধে লাহরীমাল জয় লাভ করিয়া মুসলমান পতাকা উড্ডীন করিতে পারিয়াছিলেন। একথা ইতিহাস অদ্যাপি ঘোষণা করিতেছে! নবাব মুরশীদকুলী খাঁ রঘুরামের পুরস্কার স্বরূপ তাহার পিতার কারা-মোচন করিয়া দিয়াছিলেন। *

বীরপুরুষ রঘুরাম, এইরূপে জগতে আদর্শ বীরের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইয়া, নির্ব্বিবাদে ত্রয়োদশ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ৺গঙ্গা প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার দানশীলতার বিষয়ে যথেষ্ট কীর্ত্তি অদ্যাপি লোকপরম্পরায় শ্রুত হওয়া যায়। §

শ্রীলাল গোপাল মিত্র।

---

* ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত ১২। ১৩। ১৪। পৃষ্ঠা,

§ ততঃ রঘুপতি কৃত যাগাদি ক্রিয়ঃ ত্রয়োদশ বর্ষ শাসিত রাজ্যঃ পঞ্চাশদধিক ষোড়শতিথকে ভাগীরথী তীরে মুক্ত প্রাণ পরম পতিব্রাণ। * * *

ক্ষিতিশবংশাবলী চরিতম্।

অন্ধ পদ্মলোচন।

হরিপুর নিবাসী ভৈরবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিষয়ী লোক ছিলেন; যিনি বিষয়ী, তিনি অবশ্যই হিসাবী, সুতরাং কাঁচা কাজ তিনি করিতে পারেন না। ভৈরবচন্দ্রও কাঁচা কাজ করেন নাই। তিনি একমাত্র পুত্র মহেন্দ্র-নাথের সহিত মহেশ্বরতলা নিবাসী হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া-ছিলেন। হরিহর বাবুর পুত্র ছিলনা, কিন্তু বিষয় সম্পত্তি আছে—সে বিষয় সম্পত্তি পুত্রবধূ মনোরমারই হইবে, এইটুকু ভাবিয়া তিনি পাকা চাল চালিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রনাথের বিবাহের এক বৎসর পরেই ভৈরবচন্দ্রের মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তিনি মহেন্দ্রনাথকে বলিয়া গেলেন—"দেখ বাবা, আমি যা' হয় কিছু রাখিয়া যাইতেছি; হিসাব করিয়া চলিতে পারিলে ইহাতেই তোমার মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান করিতে পারিবে। তা' ছাড়া তোমার শ্বশুরের বিষয় সম্পত্তিও তোমার হইবে। এজন্য আমি নির্ভাবনায় মরিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখে থাক। বউ মা আমার লক্ষী-রূপিনী, তাঁর কোলে একটি খোকা দেখিয়া আমার সেই পূর্ণিমার চাঁদ নাতিটির হাসি দেখিয়া, মরিতে পারিলে আমার সকল বাসনাই পূর্ণ হইত। কিন্তু বিধাতা ততটা সৌভাগ্য আমাকে দেন নাই, সেজন্য আর দুঃখ করিয়া কি হইবে! এখন একটি কথা তোমাকে বলি—তুমি জান যে, আমার দুই বিবাহ ছিল;

এখন তোমার মাতা বা বিমাতা কেহই নাই; মনে রাখিও, তাহাদের জীবদ্দশায় আমি সুখ পাই নাই। মৃত্যুকালে তোমার মাতৃনিন্দা করিতেছি, ইহাতে ক্রুদ্ধ হইও না! তোমাকে উপদেশ দিবার জন্যই আমাকে এত কথা বলিতে হইতেছে। তুমি কুলীনের ছেলে; দেখিও, আমার লক্ষ্মীরূপিনী বউমাকে অবহেলা করিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করিও না। "আমি হাড়ে হাড়ে ভুগিয়াছি, তুমি যেন সতীনের বেড়া আগুণে পুড়িয়া মরিও না। জানিও, ইহাই তোমার পিতার আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ।"

ভৈরবচন্দ্রের মৃত্যুর পর মহেন্দ্রনাথের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি পড়িল। পল্লীর বৃদ্ধগণ যখন তখন আসিয়া মহেন্দ্রনাথের বহির্ব্বাটীতে সমবেত হইতে লাগিলেন। বাড়ীতে তাঁহাদের তামাকের খরচ কমিয়া গেল—বিনা ব্যয়ে ধুমপানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা উপদেশ বিতরণেরও একটি পাত্র পাইলেন। তাঁহারা প্রায়ই মহেন্দ্রনাথকে বলিতে লাগিলেন—"যতক্ষণ আমরা আছি বাবা, ততক্ষণ তোমার কিসের ভাবনা? হাজার হোক, তোমার ঠাকুর তোমাকে নিঃসম্বল রাখিয়া যান নাই। একটু বুঝে শুনে খরচ পত্র কর, সকল দিক বজায় থাকিবে।" টাকা কর্জ্জ লইবার সময়েই বৃদ্ধগণ এইরূপে অযাচিতভাবে মহেন্দ্রনাথকে উপদেশ দান করিতেন। এদিকে গ্রামের যুবকগণ দেখিল যে ভৈরবচন্দ্রের মৃত্যু হওয়ায় তাহাদের সকল দিকেই সুবিধা হইয়াছে। তাহারা মহেন্দ্রনাথের বহির্ব্বাটীতে আড্ডা স্থাপন করিল। নেশাখোরের নেশা জমিতে লাগিল, গায়কের গীতবাদ্যের আয়োজন হইল, লম্পটের মন্ত্রণাগার সৃষ্টি হইল। আর মনোরমা প্রাণপাত করিয়া স্বামীর সেবা করিতে লাগিল—মনোরমাকে বালিকা বয়সেই সংসারের ভার বুঝিয়া লইতে হইল।

(২)

এইভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথের জীবনে পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যাইতে লাগিল। একদিন মহেন্দ্রনাথ আহার করিতে বসিয়াছে, এমন সময়ে মনোরমা একখানি পাখা লইয়া স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল। স্বামীর চক্ষু রক্তবর্ণ, আহারে রুচি নাই দেখিয়া মনোরমা বলিল, "আমার একটা কথা শুনিবে?"

মহেন্দ্রনাথ। কি? উপদেশ হয় ত বলিও না, অন্য কথা থাকে ত বল।

মনোরমা। আমি কি তোমাকে উপদেশ দিবার যোগ্য? তুমিই আমাকে উপদেশ দিবে, আমি তোমার কাছে আব্দার করিব মাত্র।

মহেন্দ্রনাথ। কি কথা, শুনি।

মনোরমা! পাখা ফেলিয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি মদ ছাড়। মদে তোমার কি সর্ব্বনাশটা করিতেছে, তাহা কি দেখিতেছ না? তোমার সোণার অঙ্গে যেন কে কালি ঢালিয়া দিয়াছে। তোমার আহারে রুচি নেই, আলাপে প্রবৃত্তি নেই, নিদ্রায় আরাম নেই। তুমি কি এমনই ছিলে? তোমার পায়ে পড়ি, আর যা হয় তাই কর, মদটি ছাড়।

মহেন্দ্রনাথ সেই দণ্ডেই জলের গ্লাস মুখে তুলিল। জল পান করিতে করিতে বক্রদৃষ্টিতে মনোরমার মুখের দিকে চাহিল। মনোরমা ভয় পাইল। তাহার চক্ষে জল আসিল। সে দক্ষিণ হস্তে পাখাখানি লইয়া বাম হস্তে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছিল। সেই মুহূর্ত্তেই মহেন্দ্রনাথ পরুষবচনে বলিল,—"তুই বড় বেড়েছিস্! আমি মাতাল? একরত্তি মেয়ে তুই, তোর আবার লম্বা চওড়া কথা! ভাল না লাগে, বাপের বাড়ীর পথ খোলা আছে, চলে যা'। তোদের মতন তু'দশটা লোক গলায় কাপড় দিয়ে, আমাকে মেয়ে দিয়ে যাবে।"

মনোরমা আর শুনিতে পারিল না, মহেন্দ্রনাথেরও আর বক্তৃতা চলিল না। সে বাহিরে চলিয়া গেল, মনোরমা মৃৎশয্যায় শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মহেন্দ্রনাথের বহির্বাটীতে তখন ইয়ারের অভাব ছিল না। সে গড়গড়ার নল মুখে তুলিয়া একটি ইয়ারকে বলিল, "হাঁ হে কিশোরী, তুলগাঁয়ে হারাধন বাড়ুয্যের মেয়েটি ত তোমরা দেখেছিলে—কেমন দেখতে বল ত!"

কিশোরী। সেদিন তো তোমাকে বলেছি দাদা, এমন মেয়ে আমি কোথাও দেখি নি। সে যে কি মুখ, কি চোখ, কি রং—তা' কেমন ক'রে বলব?

মহেন্দ্রনাথ। দেখতে পারিস? কাল বুঝি তোর মাঠে জল লাগবে? তা পরশু তুই বা, দেখে আয়। দেখে আর কেন, পারিস্ তো সব ঠিক ক'রে আয়।

কিশোরী সম্মত হইল। কথায় কথায় মনোরমার কর্ণে এই কথা পৌঁছিল। মনোরমা ভাবিল—সে ভাল; সুন্দরী বউ আসে, আমি তাহাকেই রাজরাণী করিয়া রাখিব; যাহাতে সে স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে পারে, আমি তাহাই করিয়া দিব, তাহাই তাহাকে শিখাইয়া দিব। তাহাকে পাইলে স্বামী যদি মদ ছাড়েন, সে আমার পরম সৌভাগ্য।

ভৈরবচন্দ্র মৃত্যুকালে যথার্থই বলিয়াছিলেন যে তাঁহার বউমা মনোরমা লক্ষ্মীরূপিনী। হতভাগ্য মহেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিল না। পিতার আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিল। তুলগ্রামের হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় বিনা আয়াসে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইল।

এই বিবাহের কিছুদিন পরেই মনোরমা একটি সুকুমার প্রসব করিল! মনোরমার প্রতি মহেন্দ্রনাথের বিরাগ জন্মিলেও পুত্রের মুখ দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দপ্রবাহ উথলিয়া উঠিল। মনোরমা সেই পুত্রের জননী, কাজেই তখন সে মনোরমাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথ সকল দিকে এমন ব্যবস্থা করিয়া দিল, যাহাতে মনোরমার কোন কষ্ট না হয়। মনোরমা উদ্দেশে স্বামীকে প্রণাম করিল, ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিল যেন স্বামীর সুমতি হয়। মহেন্দ্রনাথের বহির্বাটীতে আনন্দের প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। যথাসময়ে সবিশেষ ধুমধামের সহিত মহেন্দ্রনাথ পুত্রের অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সমাপন করিল।

(৩)

গ্রামের মধ্যে মহেন্দ্রনাথের দুই একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে এইবার হতভাগ্যের আক্কেল হইবে, তাহার মতি ফিরিবে। কিন্তু তাহা হইল না। বুঝি বা ভৈরবচন্দ্রের অভিশাপেই তাহার সর্ব্বনাশের পথ খোলসা হইল।

মহেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম করুণাময়ী, কিন্তু তাহাতে করুণার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। আয়ুর্ব্বেদে বিষের নাম অমৃত, এক্ষেত্রেও নির্ম্মমতার নাম করুণা। সেইজন্য আমরা কন্যার নামকরণের জন্য হারাধনের দোষ দিতে পারিলাম না, কেন না হারাধন নজীর দেখাইবে—তাহাকে দোষী করিতে গেলে, আয়ুর্ব্বেদের রচয়িতাকেও দোষী করিতে হয়। অন্ধের নাম পদ্মলোচন, সেটা শুনিতে ভাল লাগে না সত্য, কিন্তু আজকাল ত সর্ব্বত্রই অন্ধ-পদ্মলোচন। সুতরাং নিষ্করুণা বালিকার নাম করুণাময়ী শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলে চলিবে কেন?

মনোরমার পুত্র শশিকলার ন্যায় যতই বাড়িতে লাগিল, করুণার সপত্নী বিদ্বেষও সেই পরিমাণে বাড়িতে লাগিল। মনোরমা গৃহলক্ষ্মী হইলেও লক্ষ্মীভ্রষ্ট মহেন্দ্রনাথ মনোরমাকে চিনিতে পারিল না। তাহার নেশায়-বিভোর-চক্ষু ক্ষণে ক্ষণে রূপের ওজন করিত,মনোরমাও করুণাময়ীকে দেখিয়া মহেন্দ্রনাথকে বুঝাইয়া দিত যে করুণাময়ীর রূপের ওজনই বেশী। মহেন্দ্রনাথ রূপেরই আদর করিত, সেই অন্ধপদ্মলোচন তাই গুণের আদর করিত না। করুণাময়ী যখন স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া স্বামীর কর্ণে হলাহলের ধারা বর্ষণ করিত, তখন মহেন্দ্রনাথ নেশায় বিভোর হইয়া তাহার মুখ পানে চাহিয়া থাকিত, কানে সকল কথাই শুনিত। কেবল শ্রবণ মাত্র নহে, তদনুসারে কার্য্যও করিত। করুণার রূপের তাড়িৎ শক্তিতে সে পরিচালিত হইত, এইজন্যই মনোরমার প্রতি অনাদর উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল।

করুণাময়ী যখন স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে,হাসিতে হাসিতে, দুলিতে দুলিতে স্বামীর সোহাগ যাচ্ঞা করিত, মনোরমা তখন দাসীর মত গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিত, মনোরমা পাছে ফাঁকি দেয়, সেই জন্য করুণাময়ীর পরামর্শে মহেন্দ্রনাথ পরিচারিকাকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন। একদিকে শত সহস্র কর্ম্ম, অপর দিকে শিশুর ক্রন্দন ও আব্দার একা মনোরমা দুই দিকই বজায় রাখিত। করুণাময়ী যখন স্নানান্তে বেশভূষায় ব্যাপৃত হইত, মনোরমা তখন গোবর-জল লইয়া চারিদিক পরিষ্কার করিত, ঝাঁট দিত, রন্ধনশালা নিকাইত। করুণাময়ী যখন মাছের মুড়া পাতে লইয়া দগ্ধোদর পূরণ করিত, মনোরমা তখন স্বামীর ভোজনাবশেষ প্রসাদটুকু তৃপ্তিসহকারে ভোজন করিত, শিশু আব্দার ধরিলে তাহা হইতেই মাছের মাংস, উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন পুত্রের মুখে তুলিয়া দিত। মনোরমা বাসন মাজিত কিন্তু আহার্য্য পরিবেশন করিত করুণাময়ী। প্রতিবেশীরা কোন কোন দিন বলিত,—আহা! মনোরমার পেট ভরে না। মনোরমা তাহা শুনিয়া বলিত, সে কি মা! পেট আবার ভরে না, আমি খাইতে পারি না বলিয়াই ছেলেটাকে সঙ্গে লই,

স্বামীর প্রসাদ ফেলিয়া রাখিতে নাই, তাই খুঁটিয়া খুঁটিয়া সব খাই।"

করুণাময়ী যখন দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিত, মনোরমা তখন আর্দ্র মেজের উপরে অঞ্চল পাতিয়া শয়ন করিত, পুত্রটির জন্য একখানি কাঁথা সেলাই করিয়া লইয়াছিল। মহেন্দ্রনাথ যখন মাতাল হইয়া ধুলিশয্যা গ্রহণ করিত, করুণাময়ী তখন সেদিকে আসিত না, মনোরমা স্বামীর অঙ্গের ধুলি ঝাড়িয়া অতি সাবধানে তাহাকে ভাল করিয়া শয়ন করাইয়া দিত। মহেন্দ্রনাথ বমি করিলে করুণাময়ী নাকে সাতপুরু কাপড় জড়াইয়া বকিতে বকিতে গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া যাইত এবং আতর লইয়া সর্বাঙ্গে মাখিত, আর মনোরমা স্বহস্তে সেই বমি পরিষ্কার করিয়া ভাবিত যে স্বামিসেবা করিয়া সে ধন্য হইল।

মুখুর্য্যের বাড়ীর ক্ষুদ্র সংসারে এমনই ধারাবাহিকরূপে সকল কাজ চলিতেছিল। মহেন্দ্রনাথ সকলই দেখিত; কিন্তু যথার্থ কিছুই বুঝিতে পারিত না, কিছুই চিনিতে পারিত না। সে বুঝিত যাহার যে কাজ, সে তাহাই করিতেছে সে চিনিত করুণাময়িকে। শিশুকেও সকল সময়ে ক্রোড়ে লইবার সাহস তাহার ছিল না। একদিন করুণাময়ীর নিকটে তিরস্কৃত হইয়া মহেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা, তুমি এতে বক কেন? এমন ছেলে, একে তুমিই বা কোলে লও না কেন?"

করুণাময়ী প্রহৃতা ফণিনীর ন্যায় গ্রীবা তুলিয়া রোষভরে বলিল—"কে তোমার পায়ে ধরে বলেছে যে, ওগো অমন ছিচকাঁদুনে, পোঁটা পড়া অলক্ষুণে ছেলেটাকে কোলে নিও না। আমার তো আর ছেলে নয়, আমি যদি কোলে না নিই। কি আমার আদর গো, সোহাগ আর ধরে না, আমাকে আবার বলা হচ্চে, কোলে নাও না কেন? সতীনের কাঁটা সাধ করে গায়ে তুলব—আহা হা, কি আমার মায়া গো!" করুণাময়ী ক্ষিপ্র গতিতে চলিয়া গিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিল—কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথ অপরাধীর মত করুণার মান ভাঙ্গিবার উপায় দেখিতে গেল।

হরিহর চট্টোপাধ্যায় কন্যা মনোরমার দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। তিনি কন্যাকে লইয়া যাইবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। তাহাতে মহেন্দ্রনাথের কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু মনোরমা যাইতে চাহে নাই। যে স্ত্রীলোকটি মনোরমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল, মনোরমা তাহাকে বলিয়াছিল—বাবাকে বলিও, আমি সুখেই আছি। দশজনের মুখের কথা শুনিয়া তিনি যেন বিচলিত না হন। আমার সুখের চেয়ে কার সুখ আছে? এমন সোনারচাঁদ ছেলে পাইয়াছি, ভগবানের কৃপায় অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল আমি নই, স্বামী তো আমাকে কোন কষ্ট দেন না। বাবাই আমাকে ছেলেবেলায় শিখাইয়াছিলেন যে স্বামিসেবাই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম। আজ তিনি আমাকে স্বামীসেবায় বঞ্চিত করিতে চাহিতেছেন কেন? তুমি যাও বাবাকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিও যে আমি শীঘ্রই তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাইব। আমার কোন ক্লেশ নাই, তিনি যেন না ভাবেন।

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। মহেন্দ্রনাথের সংসারেও দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। মনোরমা শারীরিক কষ্টকে যতই উপেক্ষা করিতে লাগিল, করুণাময়ী ততই ভাবিতে লাগিল—এ মাগী যেন লোহার গতর লইয়া আসিয়াছে। ততই সে মনোরমাকে অধিকতর কষ্ট দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে এক এক সময়ে ভাবিত যে যতটা কঠোরতা অবলম্বন করিতে সে চাহে, কার্য্যক্ষেত্রে বুঝি সে ততটা কঠোর হইতে পারে না, তাই মনোরমার চক্ষের জল দেখায় যে তৃপ্তি, সে তৃপ্তি তাহার ভাগ্যে ঘটিতেছে না। ফলে করুণাময়ী অবোধ শিশুকে অবহেলা করিতে লাগিল, শিশু সে অনাদর মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিত বলিয়াই দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। মনোরমা প্রত্যহ প্রত্যূষে মৃৎশয্যা ত্যাগ করিত; শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই সে স্বামীর পদযুগল হৃদয়ে ধ্যান করিত, মুখে শতবার দুর্গানাম জপ করিত, ভাবিত, সমস্ত দিনটা তাহার সুখে যাইবে, কিন্তু ঘটিত অন্যরূপ, তিরস্কার ও গঞ্জনা সমস্ত দিনই যেন তাহার কর্ণে ঢক্কানিনাদের মত বাজিত। অন্য কেহ হইলে হয়ত ভাবিত এই কি দুর্গানামের ফল? এই কি স্বামিপদচিন্তার পরিণাম? কিন্তু মনোরমা যে সতী, সাবিত্রী স্বরূপিনী, সে ভাবিত বুঝি সে একাগ্রচিত্ত হইয়া ধ্যান করিতে পারে না। হায় মহেন্দ্রনাথ! তুমি কাঞ্চন ফেলিয়া কাচের আদর করিতেছ!

কালক্রমে করুণাময়ীও একটী সন্তান প্রসব করিল। মহেন্দ্রনাথ নবকুমারের মুখ দেখিয়া সুখী হইল সত্য কিন্তু মনোরমার পুত্রের জন্মগ্রহণ কালে সে যেরূপ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়াছিল, এবার সেরূপ ব্যবস্থা করিল না। সে যে করুণাময়ীর পুত্রকে কুদৃষ্টিতে দেখিল, তাহা নহে—এই সময়ে সে বড় মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল, মদ তাহাকে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিয়াছিল। কাজেই সে নেশা লইয়াই ব্যস্ত রহিল, দশজনকে খাওয়াইয়া বা অন্য কোন প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিল না।

করুণাময়ী ইহাতে বঞ্চিত হইলে, তাহার হৃদয়ে সপত্নী বিদ্বেষ বহ্নি আরও জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাবিল—ঐ হতভাগা ছেলে তো সবই করিবে, অথচ দাসীপুত্র হইয়াও সে সকলের আনন্দবৰ্দ্ধন করিয়াছিল। আর আমার এই সোণার চাঁদ, ননীর পুতলি—ইহাকে দিয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল হইবে, তথাপি ইহার জন্য ধুমধাম কিছুই হইল না। আমাকে এতটা অবহেলা, এতটা ঘৃণা! আচ্ছা, দেখা যাইবে, তেজ কোথায় থাকে।

মুখোপাধ্যায় দিগের ক্ষুদ্র সংসারে দেখিতে দেখিতে অশান্তির অনল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এতদিন কেবল মনোরমা ও তাহার পুত্রই নির্য্যাতন ভোগ করিতেছিল, অতঃপর মহেন্দ্রনাথও কথায় কথায় তিরস্কৃত হইতে, লাগিল। কিন্তু এই ভবের হাটে রূপের আদরই আজকাল অধিক। লোক মূল্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে না, বাহ্য সৌন্দর্য্যই দেখিয়া থাকে—বরং যে দ্রব্যের বাহ্য সৌন্দর্য্য অধিক অথচ মূল্য অল্প সেই দ্রব্যই বাজারে বিকাইয়া থাকে। মুখুর্য্যে সংসারের ভাঙ্গা হাটেও তাহাই হইল। মনোরমার গুণ আছে, করুণাময়ীর রূপ আছে।

মহেন্দ্রনাথ গুণের মূল্য বুঝিল না, রূপের মোহে ভুলিয়া করুণাময়ীকেই সাদরে গ্রহণ করিল, তাহার তিরস্কার মহেন্দ্রনাথ নেশার ঝোঁকে প্রেমালাপ বলিয়াই ভাবিল। করুণাময়ীও বুঝিল, সে রূপে জগজ্জয়ী—মহেন্দ্রনাথ অন্ধ-পদ্মলোচন, সে কি সে রূপের আদর না করিয়া থাকিতে পারে?

মহেন্দ্রনাথের আদরে আদরিনী হওয়ায় করুণাময়ী পিশাচী হইয়া উঠিল। মনোরমা প্রাতঃকালে উঠিয়া সম্মার্জ্জনী লইয়া চারিদিক পরিষ্কার করিত, করুণাময়ী তাহার অলক্ষে আবার আবর্জ্জনা ফেলিয়া বলিত, বয়স আর এত কি বেশী হইয়াছে, ইহারই মধ্যে চখের মাথা খাইয়াছ? এর নাম কি ঝাট দেওয়া?" মনোরমা আবার ঝাট দিত।

পুষ্করিণী হইতে বাসন মাজিয়া আনিয়া মনোরমা একস্থানে রাখিয়া দিত, করুণাময়ী তাহার অলক্ষ্যে সেই বাসনে একটা ভাত আনিয়া টিপিয়া দিয়া যাইত; শেষে মহেন্দ্র-নাথের সমক্ষে বলিত—"এমন করিলে লক্ষ্মী আর কত দিন থাকিবে? কি 'ঘেন্নার' কথা তুমি না ভদ্রলোকের মেয়ে? মাগো মা, জাত জন্ম আর রহিল না।" শেষে মহেন্দ্রও মনো-রমাকে তিরস্কার করিত। মনোরমা আবার বাসন মাজিয়া আনিত।

মহেন্দ্রনাথ যদি মনোরমাকে একখানি কাপড় কিনিয়া দিত, করুণাময়ীর তাহা সহ্য হইত না। সে বলিত, এই এক সৃষ্টিছাড়া ব্যবস্থা। ঘরের পাট ঝাঁট করবে, সে আবার নূতন কাপড় পরিয়া করিয়া থাকে, শেষে করুণাময়ী খোঁচায় কাপড়খানি লাগাইয়া ছিঁড়িয়া দিত এবং মহেন্দ্রের সাক্ষাতে বলিত "সর্ব্বনাশী ঘরে এসেছে, সে কি আর কিছু রাখিবে?"

মনোরমা নিভৃতে বসিয়া কাঁদিত। পুত্রটী তাহার ক্রোড়ে গিয়া বলিত—"কাঁদ কেন মা? আমি বাবাকে ব'লে দোবো।" মনোরমা নিষেধ করিয়া বলিত ছি! তোমার মা হয় না? কিছু বলিতে নাই। এই যে আমি কি তোমাকে বকি না! দোষ হ'লে সবাই বকে।' বালক চুপ করিয়া থাকিত।

এই সময়ে, পিতার শেষ অবস্থার সংবাদ পাইয়া মনোরমা পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। ইহার দুইদিন পরেই হরিহর চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করিলেন।

মনোরমা পিত্রালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবা-মাত্র করুণাময়ী তাহাকে বিদায় করিয়া দিতে চাহিল। মহেন্দ্রনাথকে বলিল," কেন, দুদিন না দেখলে কি মারা যাও? বাপটা মরে গেল, না হয় দুদিন বাপের বাড়িতেই রইল? এটুকুও কি প্রাণে সয় না? তা না সয়, আমাকে বিদেয় করে দাও—কাজ কি আমার রাজভোগে, না হয় আমার বাপ গরীব—করুণাময়ী মায়া কান্না আরম্ভ করিল। মহেন্দ্রনাথ তখন নেশায় বিভোর। সে অন্ধ পদ্মলোচন, মনোরমার অবস্থার কথা ভাবিল না, বলিল "তাই যা, তাই যা—দুদিন সেখানে থাক, আবার নিয়ে আসব।" মনোরমা মহেন্দ্রনাথের পা জড়াইয়া ধরিয়া, কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথ নেশার মুখে বলিল—"এ কি উপন্যাস তৈরী হচ্চে।

ওরে মাকুনা তোর মাকে ডেকে এনে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা। ভাল গরু জুটো নিস্. বেলা-বেলি যেতে পারবি।”

মনোরমা কোন দিন অভিমান করে নাই. আজ করিল। সে বিদায় লইল।

করুণাময়ী নিশ্চিন্ত হইয়া রাণীগিরি করিতে লাগিল। তাহার পিতা দরিদ্র; সে যাহা পাইত তাহাই পিতাকে পাঠাইয়া দিত। মহেন্দ্রনাথকে বলিয়া নিজের দুই তিন সুট অলঙ্কার তৈয়ার করিয়া লইল। মহেন্দ্রনাথ নেশা লইয়া ব্যস্ত, করুণাময়ী অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত, সে বুঝিয়াছিল যে যেরূপ অত্যাচার, তাহাতে মহেন্দ্রনাথ অধিক দিন বাঁচিবে না। তখন ত সংসার ভাগ করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং এখন যাহা সে সরাইয়া রাখিতে পারিবে, তাহাই তাহার উপরি পাওনা রহিল।

এই সময়ে নেশার ঝোঁকে মহেন্দ্র নাথ করুণাময়ীর পুত্রকে একদিন প্রহার করিল। সেই প্রহারের ফলেই বালক শয্যাগত হইল। মহেন্দ্র সহর হইতে ডাক্তার আনাইয়া তাহার চিকিৎসা করিল, কিন্তু বালক রক্ষা পাইল না। করুণাময়ী স্বামীর শত্রু হইয়া দাঁড়াইল, বলিল—তুমিই ত আমার ছেলেকে খেলে। বাবা আমাকে এমন রাক্ষসের হাতেও দিয়েছিলেন। পুত্রের মৃত্যুতে মহেন্দ্রনাথ অত্যন্ত শোক পাইয়াছিল—সে মাতাল হইলেও তাহার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় করুণাময়ী তাহার প্রতি অসদাচরণ করায় সে একদিন আপন মনেই বলিল—মনোরমা কখনও আমাকে রূঢ় কথা বলে নি; আমি সহস্র দোষ করলেও সে আমার কোন দোষ দেখে নি।

একে মদে মহেন্দ্রনাথের শরীর নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, তাহার উপর পুত্রশোক তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। রোগভোগের ফলে যদি করুণাময়ীর পুত্রের মৃত্যু ঘটিত, তাহা হইলে বোধ হয়, মহেন্দ্রনাথ এতটা অবসন্ন হইত না। সে প্রায়ই ভাবিত যে, খোকাকে সে খুন করিয়াছে। যাহা হউক, নেশায় ও দুশ্চিন্তায় মহেন্দ্রনাথ শয্যাশায়ী হইল, তাহার হৃদ্‌রোগ দেখা দিল। মহেন্দ্রনাথের হিতৈষী বর্গ তাহাকে বলিয়া ভাল ডাক্তারের ব্যবস্থা করিলেন, ডাক্তার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু মহেন্দ্রনাথের সেবার অভাব ঘটিল। সে একবার ভাবিল, মনোরমাকে আনিবে। কিন্তু সে লজ্জায় লোক পাঠাইতে পারিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভৈরবচন্দ্র যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, মহেন্দ্রনাথের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব হইত না। কিন্তু এখন মহেন্দ্রনাথ নিঃসম্বল। নেশায় প্রচুর অর্থ সে ব্যয় করিয়াছে, কোন কোন সময়ে নেশার জন্য দুই এক বিঘা জমিও সে বিক্রয় করিয়াছে। তাহার পর, করুণাময়ীর অলঙ্কার ও তাহার পুত্রের চিকিৎসার্থ বহু অর্থ সে কর্জ্জ করিয়াও ব্যয় করিয়াছে। কাজেই প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এখন তাহাকে জমিজারাত বিক্রয় করিতে হইল।

এক মাস পরে মহেন্দ্রনাথ অনেকটা আরোগ্য লাভ করিল বটে, কিন্তু তখন সে ভিখারী। সোনার থালা পর্য্যন্ত বিক্রিত হইয়া

গিয়াছে। চাকর নাই, চাকরাণী নাই—পূর্ব্বে যে মহেন্দ্রনাথ দশজনকে টাকা কর্জ্জ দিত, আজ সে পরের নিকটে হাত পাতিল।

হাত পাতিবার অনেক কারণ ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ, নিজের চিকিৎসার জন্য জমি বিক্রয়ের পূর্ব্বে মহেন্দ্রনাথ যখন করুণাময়ীর নিকট হইতে দুই একখানি অলঙ্কার চাহিয়াছিল, তখন করুণাময়ী বলিয়াছিল—"এমন দেওয়া কেন? নিজের দোষে ভুগ্‌বে, তারপর ঘরে ক্ষুদ কুঁড়ো যা আছে, নষ্ট করবে। তাই কি শেষে বাঁচ্‌বে? তাও বাঁচবে না—বাস ভুমিও যাবে, আর তার পরদিন বাঘিনী এসে বিষয় দখল করে বস্‌বে। তখন আমি কোথায় দাঁড়াই বল ত?"

মহেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার আর পত্নীর নিকট হইতে অলঙ্কার প্রার্থনা করে নাই। দ্বিতীয়তঃ রোগের যন্ত্রণায় যখন মহেন্দ্রনাথ ছটফট্ করিত, একটু জল চাহিত, তখন করুণাময়ী রন্ধনশালায় বসিয়া নিজের দগ্ধোদর পূরণের চেষ্টা করিত—স্বামীর সেবা করা বা স্বামীকে একটু জল দেওয়া যে তাহার কর্ত্তব্য, সেকথা সে বিস্মৃত হইত।

এইরূপ নানা কারণে মহেন্দ্রনাথ পশুর মুখোস খুলিয়া আবার মানুষ হইবার সঙ্কল্প করিল। অন্ধ পদ্মলোচন অন্ধত্বনাশের জন্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকার সন্ধান করিতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে, মনোরমা স্বামীর দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া পুত্রকে লইয়া স্বগৃহে আগমন করিল। করুণাময়ী তাহাকে দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিল—জোনাকী পোকার পক্ষাচ্ছাদিত আগুণ যেন মহেন্দ্রনাথের দুর্দ্দশাতামসাবৃত সংসারে আত্মপ্রকাশ করিল। মনোরমা করুণাময়ীকে বলিল—"কেন বোন্, রাগ কর। এত অসুখ গেল, আমাকে একটি দিনও জানাও নি। আমি কাল খবর পেয়েছি ব'লে আজ এসেছি।" করুণাময়ী বাক্যের ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল—"সোয়ামীর ওপর কি আমার দরদ্ গো! 'কাল খবর পেয়েছি, তাই এসেছি!'—কেন, নাই বা আস্‌তে, কে তোমায় মাথার দিব্বি দিয়ে আস্‌তে বলেছিল? বাপের বাড়ীর দুধ ভাত খেয়ে সেইখানে থাক্‌তে হয়। কথার ঢং দেখ না—ছুঁড়ি আবার এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে বাড়ী ব'য়ে ঝগড়া কর্ত্তে এল।'

মনোরমা দ্বিরুক্তি না করিয়া ভিতরে গেল। মহেন্দ্রনাথ তখন শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। মনোরমা তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল "আমি সর্ব্বনাশী কেন অভিমান ক'রেছিলাম, কেন রোজ রোজ তোমার সংবাদ নিই নি!" মহেন্দ্রনাথ সতীর করস্পর্শে যেন রোগমুক্ত হইল, শরীরে বল পাইল—কিন্তু অনুতাপানলে তখন তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। সে কথা কহিতে পারিল না। মনোরমা স্বামীর পদসেবায় প্রবৃত্ত হইল। মহেন্দ্রনাথ হাত দুইটি বাড়াইয়া দিল, মনোরমা ধীরে ধীরে স্বামীর হাত দুইখানিতে পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ এই ভাবেই কাটিল। মহেন্দ্রনাথ মনোরমার বদনে স্বর্গীর শোভা দেখিতে পাইল। তখন অন্ধ পদ্মলোচনের নেত্রে জ্ঞানাঞ্জন লাগিয়াছে।

করুণাময়ীর ইহা সহ্য হইল না। সে স্বামীর সমক্ষেই মনোরমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আহা, আমার নব আদরের আদরিণী এসেছেন! আমি মর্‌ব রোগের সময়ে সেবা ক'রে, আর উনি আস্‌বেন বিছানায় ব'সে সোহাগ জানাতে। এতদিন কি হ'য়েছিল, আস্‌তে পার নি? এখন যাও, যেখানে ছিলে, সেইখানে যাও, এবাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যাও।"

মহেন্দ্রনাথ এতক্ষণ নীরব ছিল, এখন আর সে নীরব থাকিতে পারিল না। সে শয্যা হইতে সেই দণ্ডে উঠিয়া বসিয়া রোষভরে বলিল—দূর হ'বে তুমি. মনোরমা নয়। তোমার বড় তেজ!"

করুণাময়ী তখনই নয়নপ্রান্তে জলধারার সমাবেশ করিল। বলিল, "তা, ভাঙ্গো না— তেজ দেখে থাকো. ভাঙ্গ। এখন তেজ দেখবে বই কি!"

মহেন্দ্রনাথ। ভাঙ্গবোই ত!

করুণা। বেশ ত! কিন্তু এ আমার শ্বশুরের বাড়ী—তুমি দূর হ'তে ব'ল্লেই কি আমি দূর হ'ব? এ বাড়ীতে আমার অধিকার।

মহেন্দ্রনাথ "আচ্ছা তোমারই বাড়ী" বলিয়া রুগ্ন দুর্ব্বল মহেন্দ্রনাথ বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার পুরাতন ভৃত্য মাখনকে ডাকিয়া বলিল—"মাখ্‌না. আজ. আমি গরিব. এতদিন ছিলাম না। তোর অনেক উপকার ক'রেছি, আজ তুই আমার একটী উপকার কর। তোর গাড়ীখানা নিয়ে আয়।" মাখন যে আজ্ঞে" বলিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরেই মহেন্দ্রনাথ পুত্রের হাত ধরিয়া, মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। যাইবার সময়ে করুণাময়ীকে বলিল- তুমি এই বাড়ীতে থাক, আমার ছেলে এখন বিষয় সম্পত্তির অধিকারী, আমি ছেলের অন্নেই জীবন রাখব। আমি তোমাকে ত্যাগ কল্লাম।"

মনোরমা স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিল; পরে করুণাময়ীকে বলিল—"না বোন্, তুমি ভেবো না। দুটো দিন পরে সুস্থ হলেই আবার আমারা এখানে আসব।"

দেখিতে দেখিতে মহেন্দ্রনাথের গাড়ী গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তখনও মনোরমা ও মহেন্দ্রের পুত্র জলগ্রহণ করে নাই। মহেন্দ্র পাষাণে বুক বাঁধিয়া, অনাহারী পুত্র ও স্ত্রীকে বুকে লইয়া যাত্রা করিল। অন্ধের নয়ন পদ্ম-লোচনই হইল।　　শ্রীপাঁচু গোপাল মল্লিক।

ঠাকুর কবির উপকথা।

বাল্যে, অনেকে ঠাকুর দাদার উপকথা শুনিয়াছেন। ঠাকুরমার উপকথাও শ্রবণে অনেকের শিশু হৃদয়ে কত বিচিত্র কল্পনার ছায়াপাত হইয়াছে। কিন্তু ঠাকুর কবির উপকথা বোধ হয়, কল্পনার দৌড়ে, ভাষার হেঁয়ালীতে, ভাবের ডাল খিচুড়িতে, বর্ণনার বাহাদুরিতে—সেই সকল কাহিনীকেও পরাস্ত করিয়াছে। আরব্য উপন্যাসে পড়িয়াছি— আলাউদ্দিনের হাতে আশ্চর্য্য প্রদীপ ছিল— সেই আশ্চর্য্য প্রদীপের সাহায্যে,—আশ্চর্য্যতর ঘটনা সংঘটিত হইত; আর এখন "প্রবাসী পত্রে", "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" পড়িয়া

বুঝিতেছি যে ঠাকুর কবির হাতেও সেই প্রদীপের মত "অঘটন ঘটন পটিয়সী" লেখনী আছে—সে লেখনী চালনায় নিমেষ মধ্যে "অদ্ভুত তত্ত্বাবে ষী" প্রত্যয় হইয়া থাকে।

যাহা প্রাচীন কাহিনী, শাস্ত্র-প্রমাণ পূর্ব্বাপর ঘটনার সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাই ইতিহাস-রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে, আর যাহা উৎভ্রান্ত অনুমান ও অদ্ভুত কল্পনার সাহায্যে ব্যক্ত, লোকে তাহাকে উপকথা বলিয়াই মনে করে। কবি রবীন্দ্র নাথের 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" সেই উপকথার মধ্যে গণ্য। অতএব পাত্র, দেশ ও কাল হিসাবে, এই উপকথার বক্তা—সাহিত্য পরিষদে অভিনন্দিত কবি সম্রাট রবীন্দ্র নাথ—স্থান—শানকিভাঙ্গার তেমাথার মোড়ে, খৃষ্টানদিগের বক্তৃতাগার "ওভারটুন হল"; শ্রোতা—শাস্ত্রজ্ঞান বর্জ্জিত কালেজী শিক্ষা নবিশ নব্য যুবকের দল; আর সময় বা কাল ৩রা চৈত্র শনিবারের বারবেলা। সুতরাং দেশ কাল ও পাত্র হিসাবে, এই অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক তত্ত্ব কিরূপে অসার উপকথায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দিবার ঔৎসুক্য দমন করিতে পারিলাম না।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, রবিবাবুর বক্তৃতাটিকে এই ভাবে আখ্যাত করিয়া আমরা বড়ই অন্যায় করিতেছি। রবি বাবু যখন নব্য যুবকদলের প্রিয়, তখন তাঁহার কথার উপর কথা কহিলে বড়ই বে-আদবি প্রকাশ হয়। রবির প্রতিভা, সর্ব্বতোমুখী—সে প্রতিভার যথার্থ মূল্য বর্ত্তমানের যুগধর্ম্মী লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার মহাবাক্যগুলি অভ্রান্ত সত্যরূপে পরিগৃহীত হইবে। এইরূপ এবং অন্যবিধ উক্তি রবিস্তাবকদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইবে। আমরা পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে বলি যে আমরা "প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামন।" এই কবি বচনের সার্থকতা করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। রবি বাবু বিচিত্র কল্পনা বলে ভাব-সাগরে ডুবিয়া প্রাকৃতিক নগ্ন সৌন্দর্য্যের নিখুঁৎ ছবি আঁকিয়া, যুবকদিগকে বিহ্বল করুণ, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। যুবকেরা নিঝুম নীশিথে, স্বপ্নাবেশে নীবা-কেশরবৎ কণ্টকিত দেহে—"সেথা কি হাসেনা চাঁদিনী" বলিয়া আধ আধ স্বরে বিজন-বিলাপ করুন, তাহাতে কবি-কল্পনা সার্থক হউক।

কিন্তু সমগ্র বঙ্গীয় যুবক যখন, তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া আছেন, তাহার কথাকে ধ্রুব সত্য বা প্রত্যাদেশ বলিয়া মনে করিতেছেন, সেই অবস্থায় রবি বাবুর ঐতিহাসিক তত্ত্ব, তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইলে, তাহারা যে হিন্দুশাস্ত্রে কিরূপ অদ্ভুত পণ্ডিত হইবে, সেটুকু ভাবিলে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সন্তানের হৃদয় বিচলিত হয়। একে তো বাবুরা বর্ণাশ্রমের বিধান মানিতে চাহেন না, তাহাতে আবার শাস্ত্র পাঠের অবসর, সুযোগ ও প্রবৃত্তি অনেকের নাই। এ অবস্থায়, সাহেবদিগের শাস্ত্র ব্যাখ্যা পড়িয়া বা মিশনারীদিগের সমালোচনা দেখিয়া এবং রবি বাবুর শাস্ত্রার্থের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া, ছোকরাবাবুদের মতি গতি

কোন্ পথে ধাবিত হইবে, সমাজের কি পরিণতি হইবে, ইহা ভাবিয়া—চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই, রবি বাবুর বক্তৃতার ভাব ও অর্থের বিচার করিতেছেন।

রবি বাবু ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমে দেখিয়াছেন যে, ভারতে আর্য্য অনার্য্যের সংঘর্ষ হইয়াছে—সকল সভ্য দেশে এইরূপ হইয়া থাকে। এই সংঘর্ষের ফলে মানুষ রূঢ়িক হইতে যৌগিক বিকাশ লাভ করে। একেই বলে সভ্যতা। আর্য্যেরা অল্পে অল্পেভারতে প্রবেশ লাভ করিতেছিল, সেই সময় অনার্য্যদিগের সহিত সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে যাহারা হিংসা প্রণোদিত হইয়া, বাধা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম দুই একটি খুঁজিয়া পাইলেও—তাহাদের প্রতিপত্তি নাই। কিন্তু যাহারা আর্য্য অনার্য্যের মিল করিয়াছিলেন সেই সকল বীর পরবর্ত্তী কালে অবতার বলিয়া পূজা পাইয়াছিলেন। এই দলের নেতা ছিলেন—ক্ষত্রিয় বীর—যথা রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ! ব্রাহ্মণেরা এই দলের প্রতিপক্ষ ছিলেন। কারণ ব্রাহ্মণেরা কেবল বাহ্য শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন আর ক্ষত্রিয়েরা অন্তরের ঐক্য শক্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষ ভাবে ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা হইয়া উঠিয়া ঋক, যজু, সাম প্রভৃতিকে অপরা বিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত, হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম কাণ্ডকে নিস্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টতই দেখা যায় একদিন পুরাতনের সহিত নূতনের বিরোধ চলিয়াছিল।

রবি বাবুর প্রহেলিকাময় ভাষা হইতে ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক চিত্রের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, ইহাই তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম। এক্ষণে এই প্রথম কল্পনাটির ভাবার্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক।

রবি বাবু, ভারতের প্রথমাঙ্কে; আর্য্য ও অনার্য্যদিগের জাতি সংঘাত কল্পনা করিয়াছেন। এই কল্পনার খেই কোথা উঠিল তাহা দেখুন—“গ্রীস রোম ব্যাবিলন প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন মহাসভ্যতার গোড়াতেই একটা সংঘাত আছে।” অতএব ভারতের ইতিহাস লিখিতে গেলে—ঐ নজীরের সহায়তা লইতে হইবে। অর্থাৎ গ্রীসে, রোমে বা ব্যাবিলনে আদিতে যাহা হইয়াছিল, ভারতেও কেন তাহা না হইবে? যখন রবি বাবু কল্পনা করিতেছেন তখন অবশ্যই হইবে বৈ কি? ইহারই নাম হইল—ইতিহাস লিখিবার ধারা!

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

গোয়েন্দা অজীতকুমার। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস শ্রীযুক্ত পাঁচু গোপাল মল্লিক প্রণীত মূল্য ১৲ টাকা, হাওড়া বিজয় প্রেস হইতে মুদ্রিত। পাঁচু বাবু সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন, বিশেষতঃ আলোচনার গ্রাহকবর্গের নিকট তিনি সুপরিচিত! এই উপন্যাস খানির কিয়দংশ ইতিপূর্ব্বে আলোচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট, এই

উপন্যাস খানির গল্পাংশ এত চিত্তাকর্ষক যে, পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। স্থানে স্থানে গ্রন্থকার গোয়েন্দা চরিত্রের এরূপ লোমহর্ষণ ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন যে, পাঠে সকলেই মোহিত হইবেন। যাঁহারা বাজারের অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস পাঠে আনন্দ লাভ করিতে পারেন নাই। আমরা তাঁহাদিগকে এই মনোমুগ্ধকর উপন্যাস খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কলিকাতা গুরুদাস বাবুর দোকানে ও হিতবাদী পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়!

ব্রজ-দর্শন—শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর নাথ ব্রজবাসী প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। শ্রীধাম বৃন্দাবন সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে সরল ও সহজ ভাষায় বিবৃত করা হইয়াছে। বৃন্দাবন যাত্রী গণের পক্ষে যে এ পুস্তকখানি নিতান্ত আবশ্যকীয় হইবে—তাহা বলাই বাহুল্য। এক খানি কাছে থাকিলে আর যাত্রীগণের কোন প্রকার অসুবিধা বা কোন বিষয় অজানা থাকিবে না। যাহারা কখন শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন নাই তাহারা ও একখানি "ব্রজ-দর্শন" কিনিয়া রাখিলে ঘরে বসিয়া বৃন্দাবন দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিবে। এই অল্প মূল্যের পুস্তকে গ্রন্থকার বহু অর্থব্যয় করিয়া সুন্দর ১৬ খানি হাপটোন ছবি দিয়াছেন। ছবি গুলি অতি পরিপাটি ও মনোরম। ১৬ প্রকার ভিন্ন স্থানের এই মনোমুগ্ধকর চিত্র দিখিলে বাস্তবিক প্রাণে সেই পূর্ব্বভাব নবীভূত হইয়া উঠে। শ্রীভগবান কংস বধ করিয়া যমুনার যে ঘাটে আসিয়া বিশ্রাম করিয়া ছিলেন। যথায় ব্রজ গোপিনী গণের বস্ত্র হরণ করিয়া ভগবান বৃক্ষারোহণ করিয়া ছিলেন। আমরা আলোচনার পাঠকগণকে সেই দুই ঘাটের দুইখানি সুন্দর চিত্র এবার উপহার দিলাম। এইরূপ বহু সুন্দর চিত্রে পুস্তক খানি সুশোভিত। আমরা হিন্দু মাত্রেকেই ইহার এক একখানি ক্রয় করিতে অনুরোধ করি। প্রাপ্তি স্থান—শ্রীশ্রীমদন গোপাল প্রেস্ শ্রীবৃন্দাবন ধাম—উক্ত গ্রন্থাকরের নিকট পত্র লিখুন।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

"আলোচনা" ষোড়শ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। আলোচনার ন্যায় বহু পুরাতন, ধর্ম্ম সমাজ সম্বন্ধীয় সারবান মাসিক পত্র বাঙ্গলা দেশে খুব কমই আছে। এবার উপহার অতি উৎকৃষ্ট বাঁধাই, বিশুদ্ধ সংস্করণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অতি বৃহৎ, ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ১৸০ ও উপহারের খরচ বাবদ ॥০ মোট ২৲ টাকা দিলে সকলেই পাইবেন। পুস্তক আর বেশী নাই. সত্বর হউন। আমরা পুরাতন গ্রাহক গণের নিকট এই মাস হইতে ক্রমশঃ ভিঃ পিঃ করিব. যাঁহাদের আপত্তি থাকে, সপ্তাহ মধ্যে জানাইবেন। নতুবা বৃথা ক্ষতি গ্রস্ত করিবেন না। যাহারা, আলোচনার নমুনা লইয়াছেন. আমরা তাঁহাদের নামে প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাইতেছি। অতঃপর আমরা তাহাদের নামে ক্রমশঃ ভিঃ পিঃ করিব। আশা করি—অনুগ্রহ পুর্ব্বক তাঁহারা ইহা গ্রহণ করিয়া আমাদের এই সৎকার্য্যে উৎসাহদান করিবেন। যদি কোন প্রকার আপত্তি থাকে. সত্বর জানাইবেন। ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদের ক্ষতিগ্রস্থ না করেন—ইহাই প্রার্থনা।

কর্ম্মকর্ত্তা।

অনুকরণই গুণের পরিচয়।

দ্রব্যের গুণ না থাকিলে, বিক্রয়াধিক্য না হইলে লোকে লোভ পরতন্ত্র হইয়া তাহার জাল করে না। আমাদের গোলাপফুল মার্কা "তাম্বুলবিহারই" আদি ও অকৃত্রিম এবং গুণে অতুলনীয়। তাই জঘন্য জালে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। ক্রেতাগণ সাবধান, ক্রয়কালীন আমার নাম ও মার্কা দেখিয়া লইবেন। নচেৎ ঠকিতে হইবে।

তাম্বুলবিহার।

বাজারে যত প্রকার "তাম্বুলবিহার" বাহির হইয়াছে, আমাদের আবিষ্কৃত গোলাপ-ফুল মার্কা "তাম্বুলবিহার" সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মনোপকারী, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই আদি ও অকৃত্রিম পান ও তামাকের মসলা। দাঁতের গোড়া শক্ত রাখিতে, মুখের দুর্গন্ধ নাশ করিতে—ইহা অতুলনীয়। মূল্য ১ ডজন ২৶০ আনা, অর্দ্ধ ডজন ১।৵০ আনা। ৬ কৌটার কমে পাঠান হয় না।

সুশীলমালতী।

ইহা স্বদেশী পমেটম, গাল ফাটা, ঠোঁট ফাটা, রং মেচেতা, ছুলি ও যাবতীয় চর্ম্মরোগ নাশ করিতে ইহার তুল্য লেপন অদ্যাবধি আবিষ্কার হয় নাই। ইহার গন্ধও অতি মনোহর। সকলে অন্য পমেটম ব্যবহার না করিয়া ইহা ব্যবহার করিলে দুই দিক বজায় থাকিবে। মূল্য ডজন ১।৵০ আনা, অর্দ্ধ ডজন ৸৵০ আনা, মাশুল সমেত। ছয় কৌটার কমে পাঠান হয় না।

দেলখোস তৈল।

সেই সর্ব্বজন বিদিত, বিলাসিনী রমণীগণের চির সোহাগের বস্তু। ইহা মর্দ্দন করিয়া কেশপাশ বিন্যস্ত করিলে, কেশ শ্রীসম্পন্ন ও দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি হয়। ইহার ব্যবহারে প্রাণে স্ফূর্ত্তি উপস্থিত হয়, তাই ইহার নাম "দেলখোস" ইহা অদ্বিতীয় কেশ পোষক তৈল। প্রতি শিশি মূল্য ॥০ আনা মাশুল স্বতন্ত্র। অগ্রিম কিছু না পাঠাইলে তৈল পাঠান হয় না।

দাদারি।

যেরূপ ও যত দিনের কঠিন দাউদ হউক না কেন, আমাদের "দাদারি" ব্যবহারে সত্বর আরোগ্য হয়, ইহাতে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রনা নাই, আজ বিশ বৎসর পরীক্ষায় ইহা স্বদেশী মহোদয়গণ বিশেষরূপ অবগত হইয়াছেন, তাই ইহার কাটতী এত অধিক। মূল্য প্রতি কৌটা।০ আনা, ৬ কৌটা ১।৵০ আনা, ডজন মাশুল সমেত ২॥০ টাকা।

শ্রীকিশোরী লাল জৈনী।
১২৫নং পুরাতন চিনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন।

জুয়েলারী ফারমের যুগান্তর।

টুকটুকে হাতে গিনির শাখা।
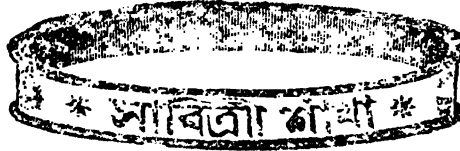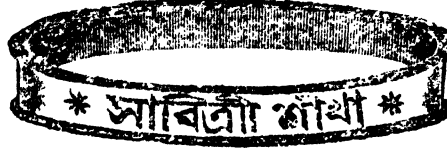
সতীর আদরের ধন।

আসল গিনির পাত চাঁদি রূপার শাঁখার উপর মোড়া। বিন্দুমাত্র পান নাই। হাই প্যালিশ, প্রিয়জনকে উপহার দিন,—কন্যা, জায়া, স্ত্রীকে মহামূল্য অলঙ্কার ১৪৲ টাকায় কিনিয়া দিন। আদরে, সোহাগে প্রেমে ও স্নেহে তৃপ্তিলাভ করিবেন। মূল্য ১৪৲ মাত্র।

গিনির গহনা ও মূল্যাদি।

কানের চাপ ৮৲ হইতে ১৪৲ টাকা। নাকছাবি নানাবিধ ২৲ হইতে ৫৲ টাকা, পার্শী মাকড়ি ১ জোড়া ১৪৲ হইতে ২২৲ জাপানি মাকড়ি ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকা। নেকলেস, ব্রেসলেট, চেন, চুড়ি, হার, বালা, অনন্ত, বোতাম, অঙ্গুরী প্রভৃতির জন্য আমাদের ফারমের সুন্দর ও ফ্যান্সি, ক্যাটলগ পাঠ করুন এবং অগ্রিম সিকি বা অর্দ্ধ মূল্য পাঠাইয়া যে কোন জিনিষ লইয়া বাজার অপেক্ষা আমাদের জিনিষের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করুন।

বিখ্যাত জুয়েলার্স—

মণিলাল এণ্ড কোং। ৪০নং গরাণহাটা চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

"জীবন সংগ্রাম" "সংসার চিত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত

সাহিত্যিক শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মানব চিত্র।

এরূপ বৃহৎ সারগর্ভ উপন্যাস বঙ্গ ভাষায় এই প্রথম। কিরূপে সংসার সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হয়, জীবনের কর্ত্তব্য কি, যদি জানিতে চান "মানব চিত্র" পাঠ করুন। সুরেশ, হিরন্ময়ী ও শৈলবালার চরিত্র পাঠে স্বর্গের পথ দেখিতে পাইবেন। সাতকড়ীর জীবনী পাঠে অশ্রুপাতের সহিত যাহা শিখিবেন—লক্ষ মুদ্রার বিনিময়েও তাহা পাইবেন না। দুই খণ্ড একত্রে বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা, গ্রন্থকারের ফটো সহ ৫০০ পৃঃ পূর্ণ। মূল্য ১।০ ভিঃ পিঃ তে ১।৵০

"অমৃত বাজার" লিখিয়াছেন—আবাল বৃদ্ধ বণিতার রামপদ বাবুর "মানব চিত্র" পড়া উচিত। "বঙ্গবাসী" লিখিয়াছেন—মানব চরিত্রের বৈচিত্রে সুখ পাঠ্য এই গ্রন্থ! খুব শিক্ষার বিষয় আছে। ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে প্রসংশিত।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নাম উল্লেখ করিবেন।

মেহ প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের একমাত্র মহৌষধ।

এক মাত্রায় উপকার। ২৪ ঘণ্টায় জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ,

সপ্তাহে রোগ মুক্তি।

হিলিংবাম সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়ে সর্ব্বদেশীয় স্ত্রী পুরুষ সকলেরই ব্যবহার্য্য। গণো-কোকাই নামক একপ্রকার কীটাণু মেহ, প্রমেহ রোগের মূল কারণ। কেবল মাত্র "হিলিংবাম" দ্বারাই এই সকল কীটাণু সমূলে বিনষ্ট হয় বলিয়া হিলিংবামই মেহ প্রমেহাদি রোগের একমাত্র মহৌষধ।

হিলিংবাম সেবনে

মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, প্রস্রাবকালীন জ্বালা, খড়িগোলার মত বা রক্তবর্ণ প্রস্রাব, বারংবার প্রস্রাবের বেগ কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে প্রস্রাব নির্গমন এবং তজ্জনিত দারুণ যন্ত্রণা, প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষমতা, সপূঁজ ও সূত্রতার ন্যায় বিকৃত ধাতু নির্গত প্রস্রাবের পূর্ব্বে বা পরে শুক্রপাত, কাপড়ে হরিদ্রা বর্ণ দাগ লাগা, মূত্রনালীর টন্‌টনানি প্রস্রাবপথে ক্ষত, স্ফূর্ত্তিহীনতা, হাত পা জ্বালা, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা ও কোষ্ঠকাঠিণ্য, সর্ব্বদা আলস্য, কার্য্যে অনুৎসাহ ইত্যাদি উপসর্গ সকল "হিলিংবাম" সেবনে আরোগ্য হয়।

হিলিংবাম নিজগুণে বহু খ্যাতনামা উচ্চ উপাধিধারী ডাক্তার গণের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। নিম্নে কয়েকজন মাত্র ডাক্তারের নাম দেওয়া গেল—কর্ণেল কে,, পি, গুপ্ত,—(আই, এম, এস) এম, এ, এম, ডি ইত্যাদি; মেজর বি, কে, বসু—(আই, এম, এস) এম, ডি, সি এম; মেজর এ, পি, সিংহ—(আই, এম, এস) এম, আর, সি, পি; এম, আর, সি, এস; ডাঃ ইউ গুপ্ত—এম, ডি, এফ, সি এস; ডাঃ এন, চক্রবর্ত্তী; এম, ডি, (লণ্ডন; ডাঃ ই, এস পুষং এম ডি (লণ্ডন); ডাঃ জি, সি বেজবড়ুয়া—এল আর, স, পি এল, এফ, পি, এল, এম; ডাঃ আর, জি কর,—এল, আর, সি, পি এণ্ড এস; ডাঃ আর, বনিয়ার—এম, বি, সি, এম; ডাঃ এ, ফারমী—এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; ডাঃ আর, নিউজেণ্ট—এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশেষ বিবরণাদির জন্য স্বতন্ত্র পুস্তক বিনামূল্যে পাঠান হয়, পত্র লিখিলে পাইবেন। মূল্য বড় শিশি ২॥০ ছোট শিশি ৸০। ভিপিতে ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং, কেমিষ্টস

টেলিগ্রাম—হিলিং, কলিকাতা। ১৪.৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন

শ্রীরামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরঞ্জন স্থাপিত

১০২নং খুরুট রোড,

হাওড়া, কুষ্ঠ-কুটীরে

আশ্চর্য্যভাবে গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত ও পারদদোষাদির চিকিৎসা করাইবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

বাতরক্ত, পারদ বিকৃতি ও উপদংশজন্য যে সকল রোগীর গাত্রে চাকা চাকা দাগ, কিম্বা মিশ্র-বর্ণের অসমতল বিবিধ ফুস্কুড়ি আরম্ভ হইয়াছে, এবং ঐ সঙ্গে দাস্ত সাফ হয় না, শরীরে দাহ বর্ত্তমান আছে, মানসিক অবসাদ, মূত্রবিকার, মধ্যে মধ্যে চর্ম্মরোগ প্রকাশ হয় আবার বিনষ্ট হয়, অত্যন্ত ঘর্ম্ম বা ঘর্ম্মরোধ, স্থানে স্থানে চাকা চাকা কৃষ্ণ ও বিকৃত-বর্ণের ফুস্কুড়ি প্রকাশ, স্পর্শশক্তির লোপ, কোন কারণে ক্ষত হইলে শুষ্ক না হওয়া, এবং বেদনা, সন্ধি-সমূহের শৈথিল্য ভাব, কৃষ্ণ বর্ণের পীড়কোৎপত্তি, স্থানে স্থানে পিপীলিকাসঞ্চলনবৎ অনুভব করা, জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, হস্ত, পদ ও সন্ধ্যাদি স্থলে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, স্ফুরণ এবং মধ্যে মধ্যে বিদারণবৎ পীড়া, গুরুত্ব, স্পর্শ শক্তির হ্রাস ও কণ্ডূয়নস্থানে পুনঃ পুনঃ বেদনা, এবং নিবৃত্তি হওয়া, ইহা ছাড়া সর্ব্বাঙ্গে বা স্থানে স্থানে সড় সড় করা, এবং নাক, মুখ, উদর হস্তের অঙ্গুলীসমূহ ও পাদদ্বয়ের পাতা বা উচ্চাংশ শূন্য কিম্বা বিস্তর স্ফীত হওয়া, অঙ্গ বিশেষের অতি মসৃণ বা খরস্পর্শ, দাহ, শুড়শুড়ানি, বোলতা দংশনের ন্যায় শোথযুক্ত চাকা চাকা দাগ, ক্ষত হইলে শীঘ্র শুষ্ক না হওয়া অথবা শুষ্ক হইবার পর রুক্ষভাব, রোমাঞ্চ, কৃষ্ণবর্ণতা, এবং ইহা ছাড়া বৃহৎ ও ক্ষুদ্রকুষ্ঠাদি ১৮ অষ্টাদশ হইতে অশীতি প্রকার কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইলে ঈশ্বরের কৃপায় নির্দ্দোষ আরোগ্য হইতে পারে। ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। এই স্থানে যে কোন ক্ষত রোগ অতি অল্প সময়ে আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্য হইয়া থাকে।

আবশ্যক হইলে ডাক্তার ইনস্পেক্টার, উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কালেক্টার, জমীদার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের মতামত পাঠান হয়।

মহবলাদ্য ঘৃত।

গব্যঘৃত /৪ সের, শতমূল রস ।৬ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, অশ্বগন্ধারকাথ /৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের, গোধূমের কাথ /৪ সের, পৃথক পৃথক ঘৃত প্রস্তুতের নিয়মে পাক করিয়া উহার সঙ্গে বিশুদ্ধ কাশীর চিনি /১ সের মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিয়া পূর্ণ মাত্রায় ।০ সিকি তোলা হইতে এক তোলা পর্য্যন্ত অগ্নিবলানুসারে অর্দ্ধপোয়া গরম দুগ্ধসহ

পর পৃষ্ঠায় দেখুন।

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন।

মধ্যাহ্ন আহারের উপর কিম্বা প্রাতে সেবন করিয়া তাহার পর তাম্বুলাদি ভক্ষণ কর্ত্তব্য।

এই ঘৃত নিয়ম-মত সেবন করিলে ক্ষীণ শুক্রযুক্ত পুরুষ শুক্রশালী হইয়া থাকে। যে যে সকল রোগীর দেহ ক্ষীণ, রক্তমাংসের অভাব এমন কি পঞ্জর বিশিষ্ট তাঁহাদের সত্বরেই দেহস্থূল ও কান্তিমান এবং লাবণ্য যুক্ত হয়।

যাঁহাদের ইন্দ্রিয় ক্ষীণতা, মানসিক সচ্ছন্দতা বিনষ্ট হইয়াছে, যাঁহারা ধাতুদৌর্ব্বলতা জন্য সর্ব্বদা খিটখিটেমেজাজযুক্ত,যাহাদের অযথা শুক্রপাত জন্য রতিক্ষীণতা উপস্থিত হইয়াছে, যাঁহাদের শুক্রধাতু জলবৎ তরল, যাঁহাদের শুক্র-ধারণাশক্তি আদৌ নাই, যাঁহাদের অকাল-বার্দ্ধক্য জন্য দেহক্ষীণ, উত্তেজনা-শক্তির অভাব, এবং স্ফূর্ত্তি হীনতা ঘটিয়াছে, যে সকল স্ত্রীর মৃতবৎসা-দোষ, রজোবিকৃতি, অনিয়মিত রজঃ, স্বল্পরজ বা ঋতুরক্তের দোষ হইয়াছে, তাঁহাদের ইহা অমৃতবৎ উপকার দর্শাইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন এই ঔষধ বায়ুরোগ রক্তদোষ নেত্ররোগ, ক্ষয়রোগ, প্রভৃতি উৎকট ব্যাধি-নাশক মহৌষধ।

এই ঘৃতের এতই আশ্চর্য্য ক্ষমতা,বৃদ্ধগণেরও প্রফুল্লতা সম্পাদন করিয়া ঠিক যৌবনের-ন্যায় তেজঃ সম্পন্ন করিয়া থাকে। সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার জন্য আমরা এই ঘৃতের মূল্য ১০৲ দশ টাকা ধার্য্য করিয়াছি। বিদেশে মাশুলাদি স্বতন্ত্র। এক পোয়ার নিম্নে বিক্রয় নাই।

শাস্ত্রীয় ঔষধাবলী।

চ্যবনপ্রাশ	প্রতি সের	...	...	৬৲
ছাগলাদ্য ঘৃত	ঐ	...	...	১২৲
বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত	ঐ	...	...	২০৲
বৃংহণ ঘৃত	ঐ	...	...	৪০৲
অমৃতপ্রাস ঘৃত	ঐ	...	...	২৪৲
অমৃতপ্রাস তন্ত্রোক্ত	ঐ	...	...	৩০৲
বৃহৎ অশ্বগন্ধারিষ্ট	ঐ	...	...	১০৲
দ্রাক্ষারিষ্ট	ঐ	...	...	১০৲
অশোকারিষ্ট	ঐ	...	...	১০৲
অশোক ঘৃত	ঐ	...	...	১৬৲
কোষ্ঠশুদ্ধি	৭ দিন	...	...	৸৴০
চ্যবনপ্রাশ	প্রতি সের	...	...	৬৲
কামেশ্বর মোদক	ঐ	...	...	৪৲
মদনানন্দ মোদক	ঐ	...	...	১৬৲

অর্ডার দিবার সময় প্রত্যেক পত্রে * এইরূপ নক্ষত্র চিহ্ন দিবেন।

সমিতির ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক

পণ্ডিত—শ্রীরামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরঞ্জন।

১০৫নং খুরুট রোড, হাওড়া, আয়ুর্ব্বেদ প্রচার সমিতি।

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন।

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন।

কর্ম্মযোগ পুস্তক ভাণ্ডার।

কর্ম্মযোগীন—সেই বিশ্ব বিখ্যাত সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের একবৎসরের একত্র বাঁধাই; ইহাতে যে সকল উপাদেয় প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে সকলেই মোহিত হইবেন। সুন্দর বাঁধাই প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ পুস্তক ১৲ টাকা, মাশুল ৵০ আনা। অনাথিনী ঐতিহাসিক উপন্যাস। বাজারে আজ কাল যে রকম অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস বাহির হইয়াছে; ইহা সেরূপ নহে, ইহার প্রত্যেক ছত্রে পবিত্র প্রণয়ের প্রশস্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা ডাঃ মাঃ ৵০ আনা।

হোমিওগীতি—একত্রে দুই খণ্ড মূল্য ১৲ টাকা, মাশুল ৵০ আনা, কবিতাচ্ছন্দে হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা। এ পুস্তকখানি ঘরে রাখিলে আর ডাক্তার ডাকিতে হইবে না। সময়ে অনেক উপকার হইবে, মফঃস্বলের ডাক্তারগণ ইহা দেখিয়া ডাক্তারী করিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। এত সহজ ভাষায় লিখিত যে, সামান্য লেখাপড়া জানিলেও ইহা পাঠ করিতে পারিবেন।

ধর্ম্ম প্রবন্ধ—একজন এম, এ, প্রণীত মূল্য ১৲ টাকা মাশুল ৵০ আনা। সুন্দর বাঁধাই, ইহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইবে। ধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রাণে অপার শান্তি লাভ করিবেন

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।

ম্যানেজার—কর্ম্মযোগ প্রেস, ৪নং, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া।

FREE BOOK.

বিনামূল্যে গ্রন্থ বিতরণ।

স্বপ্ন-বিচার।

অর্থাৎ

স্বপ্ন, স্বপ্নফল এবং তদ্দর্শনের লাভালাভ বিশদরূপে এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাওয়া যায়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গত বৎসর লক্ষ্যাধিক শিশি প্রশংসার সহিত বিক্রয় হইয়াছে।

উপকার না হয় দ্বিগুণ মূল্য ফেরৎ দিব।

যদি সবল ও মোটা হইবার ইচ্ছা থাকে,—

স্বর্ণ টিত

কোহিনুর সালসা।

সেবন করুন।

ইহা সুস্থ শরীরে আনন্দের সমুদ্র, অসুস্থের মৃতসঞ্জীবনী সুধা! পারা সংক্রান্ত রোগের ব্রহ্মাস্ত্র প্রমেহ রোগে ধন্বন্তরী; অম্ল, অর্শ হাঁপানি রোগে মূর্ত্তিমান যম। বাতরোগে অব্যর্থ অগ্নিবান, ধাতুক্ষীণতা প্রভৃতি যাবতীয় রোগে সাক্ষাৎ সুদর্শন চক্র।

স্বর্ণখটিত কহিনুর "সালসা"

সেবনে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত শরীর সবল ও সতেজ থাকিবে যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম হইবেন, সহজে কোন রোগ শরীরে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

ইহা সেবনে পুরাতন মেহ, শুক্রের তরলতা ক্ষীণ শুক্র, ইন্দ্রিয় শিথিলতা, বহুমূত্র প্রভৃতি যাবতীয় রোগ এই সালসায় আরোগ্য হয়। কিছুদিন সেবন করিলে লাবণ্য বৃদ্ধি করে, স্মরণশক্তি ও মেধা বৃদ্ধি পায়। ইহা সুমিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। ৩ শিশি ২৸০ দুই টাকা বার আনা।

প্রত্যেক শিশির সহিত ঔষধ সেবনের পরিমাণ মত একটী
করিয়া জর্ম্মান রৌপ্যের চামচ দেওয়া হয়

কার্ব্বলিক টুথপাউডার।

ইহা ব্যবহারে দাঁতের গোড়া ফোলা, কন কন করা, রক্ত পুঁজ পড়া, আলগা হওয়া, জল খাইবার সময় কন্ কন্ করা প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হইয়া দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। সুস্থ শরীরে ব্যবহার করিলে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করে এবং দাঁত মুক্তার ন্যায় উজ্জল হয়। প্রতি কৌটা ৴১০ ছয় পয়সা। ডজন ৸৵০ পনর আনা, মাশুলাদি ।০ পাঁচ আনা।

প্রতি ডজনের সহিত ১টী করিয়া দাঁত মাজিবার ব্রস দেওয়া হয়।

এ, টি, দে, এণ্ড কোম্পানি

রামকৃষ্ণপুর বেজর পাড়া

২৮ নং গোপাল ব্যানার্জির লেন

পোঃ আঃ হাওড়া।

বঙ্গের রাজন্য ও জমীদার বর্গের পৃষ্ঠপোষিত

টেলার্স, মেসার্স কালিকা এণ্ড কোম্পানী।

১০৯ নং পঞ্চাননতলা রোড হাওড়া।

আমরা সুন্দর নূতন ফ্যাসনের শীত ও গ্রীষ্ম উপোযোগী সকল প্রকার কাপড়ের যথা—লংক্লথ, নয়ানসুক, সুইজ, আর্দ্দি, ছিট, জিন, সাটীনজিন, ড্রিল, বাপ্তা, আলপাকা, প্যারামিটার, গরদ, কুটক্লথ, ফ্লানেল এংগোলা, কাশ্মীরায়, সার্জ্জ, বনাত, সেরুণে, সিল্ক, সাটীন, প্রভৃতি কাপড়ের কামিজ, সার্ট, পিরান, পাঞ্জাবী, কোট, ওয়েষ্টকোট, চাপকান, চোগাই পেণ্টুলন, অলেষ্টার, লংকোট, চেষ্টারফিল্ড কোট, জ্যাকেট ববডী, ফ্রগ, পেটিকোট, সলুকা পেশোয়াজ, সাচ্চা সলমা চুমকী কাজ করা জ্যাকেট, কোট, পাঞ্জাবী পেস্কিফগ, মোজা নানারকম রুমাল আলোয়ান, র‍্যাপার, সাল প্রভৃতি যাবতীয় পোষাক বাজার দর অপেক্ষা অনেক সুলভ মূল্যে এবং পছন্দমত দ্রব্যাদি ডাকে পাঠাইয়া থাকি। ইহার মধ্যে দুএকটী জিনিসের নাম ও মূল্য লিখিত হইল। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

পায়ের মাপ পাঠাইলে অল্প দিনের মধ্যে অর্ডার মত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া থাকি। অর্ডারের সহিত কিছু অগ্রিম পাটাইতে হয়।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ—ম্যানেজার।

সুবিখ্যাত আর, এন, ম্যাথো এণ্ড কোম্পানীর আবিষ্কৃত

দদ্রুদাবানল।

এই ঔষধ দদ্রুস্থানে লাগাইলে, বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় তিন দিনে সর্ব্বপ্রকার দদ্রুরোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে পারা নাই। এই ঔষধে একবার দদ্রু আরোগ্য হইলে ভবিষ্যতে আর হয় না। মূল্য ১ কৌটা।০ চারি আনা, মাশুল।০ চারি আনা। একত্র ৪ চারিকৌটা মাশুলসহ মূল্য ১৲ এক টাকা।

(স্বর্ণঘটিত "মহাশক্তি" সালসা)

ইহা সেবনে যেরূপ ভাবের যত দিনের শোণিতের দোষ থাকুক না কেন, সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইবে, উপদংশের বিষ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, শরীরে নব বল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, কান্তি, পুষ্টি, মেধা, স্মৃতি ও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূত্রযন্ত্রের সকল রূপ পীড়া নির্দ্দোষভাবে আরাম করিতে ইহার তুল্য ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই, অধিকন্তু ইহা মস্তিষ্কের বিকার, জ্বর, স্বরভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য নাশ করিয়া থাকে, দুর্ব্বল স্নায়ু ও পেশীকে সবল ও পূর্ণভাবে কার্য্যক্ষম করিতে অদ্বিতীয়।

হেড অফিস—৪৫নং ডায়মণ্ড হারবার রোড, আলিপুর, কলিকাতা।

সচিত্র মাসিক পত্রিকা **বসুধা।** ও সমালোচনী।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর সম্পাদিত।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ কাব্যকণ্ঠ বিশারদ।

বার্ষিক মূল্য উপহার সমেত ১৮৴০ মাত্র। (উপহারের ডাকমাশুল স্বতন্ত্র) বঙ্গের লেখক মাত্রেই "বসুধা"য় লেখেন, তাহার উপর বিনামূল্যে উপহার।

৪ দফার মধ্যে যাঁহার যে দফা পছন্দ, এক দফার বেশী লইলে মূল্য প্রতি দফায় ৮৴০ আনা স্বতন্ত্র দিতে হয়। ১ম দফা—পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের "লোহার বাঁধান"—৪০০ পৃষ্ঠা বাঁধানো। ২য় দফা—ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বঙ্কিম বাবুর গুপ্ত কথা"—৬০০ পৃষ্ঠা বাঁধানো। ৩য় দফা—হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, প্রণীত "কলিকাতা রহস্য"—৬০০ পৃষ্ঠা বাঁধানো। ৪র্থ দফা—৫ খানি সুবৃহৎ ও সুখপাঠ্য

A
DELIGHTFULLY SCENTED
HAKIMI
For
The Hair
OIL
বেগম বাহার।

অর্জ্জুন, সুভদ্রা ও সত্যভামা।

[পৃষ্ঠা ১২৮ ।

আলোচনা, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩১৯।

ভক্ত-চরিত।

ভক্তমাল রত্ন বরে, অন্তর উজ্জ্বল করে,
নিত্যানন্দ-সাগরে ভাষায়।
কৃষ্ণপ্রেম মহাধন, সকল ধনের ধন,
যদি পাবে করহ আশ্রয়॥

জগতে এক শ্রেণীর ভক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে সহজে চিনিবার উপায় নাই। ইহাঁদের বাহিরের কোন বেশ নাই, কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নাই। ইহাঁরা সাধারণ মানবের ন্যায় সংসারের কার্য্য করেন—দেখিলেই বোধ হয়, যেন ঘোর সংসারান্ধ বিষয়-মুগ্ধ জীব। ইহাঁরা ভজন সাধন অতি গোপন ভাবে করেন, জগতের কেহ তাহা জানিতে পারে না, এমন কি প্রিয়তমা পত্নী পর্য্যন্তও তাঁহাদের হৃদয়ের গুপ্ত ভাবের রহস্য ভেদ করিতে অসমর্থা হন, অথচ ভক্তের এমনি মাহাত্ম্য, ভগবানের এরূপ কৌশল যে সামান্য সূত্র সংযোগে তাঁহাদের মহিমা জন-সমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ইতর সাধারণ তখন বুঝিতে পারে, তাঁহাদের কি তেজ, কি প্রভাব, কি মাধুর্য্য, কি গৌরব, হৃদয়-নিহিত ভক্তি-কুসুমের কি সৌরভ!! ইহাঁরা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী নহেন' আমাদের ন্যায় সংসার করিয়া থাকেন; পার্থক্যের মধ্যে বারির ন্যায় নির্লিপ্ত। নারিকেল ফলে বহিরাবরণ কঠিন, কিন্তু উহার অভ্যন্তর অ[illegible] উপাদেয় শস্যে ও সুস্বাদু জলে পূর্ণ। এই সক[illegible] মহৎ লোকের বাহ্য ভাব ঠিক তদ্রূপ; অন্ত[illegible] প্রদেশ অমৃতে অভিষিক্ত, সুকৃতি বলে আস্ব[illegible] দন করিবার সুবিধা হইলে আমাদের প্র[illegible] শীতল হয়—হৃদয় প্রেমের মধুর গন্ধে ভরপ[illegible] হইয়া উঠে—সাংসারিক মলিনতায় পূর্ণ মন, [illegible] এক দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হইতে থাকে[illegible] অদ্য আমরা এইরূপ এক মহাপুরুষের চরি[illegible] কথা কীর্ত্তন করিব। এই ভগবৎ নিষ্ঠ পুর[illegible] একজন ভক্ত রাজা।

আমাদের দেশেই পূর্ব্বকালে ইনি ব[illegible] করিতেন। রাজমহিষীও পরম বৈষ্ণবী ছিলে[illegible] কিন্তু বাহিরে রাজার ভক্তির কোন পরিচয় [illegible] পাইয়া তিনি রাজাকে হরি-ভক্তি-হীন ম[illegible] করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এ[illegible] শীঘ্রই দূরীভূত হইল। এক দিন নিশাকা[illegible] নিদ্রা যাইতে যাইতে সহসা রাজা "কৃষ্ণ, কৃ[illegible] বলিয়া উঠিলেন। রাজা যে নিদ্রাকালে ব্র[illegible] শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান তাঁহ[illegible] ছিল না, রাণী কিন্তু তাহা শুনিতে পাই[illegible]

লেন, আজ নিদ্রাবস্থায় তাঁহার মুখে অমৃতময় কৃষ্ণ নাম শুনিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। রাত্রি প্রভাত হইলে, রাণী এক মহোৎসবের আয়োজন করিলেন, বাদ্য ধ্বনিতে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। রাজা এ উৎসবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাণী বলিলেন—গত কল্য রাত্রিকালে আপনার মুখে মধুর কৃষ্ণ নাম শুনিয়াছি, তাহারই স্মরণ জন্য প্রীতি-উৎসব। 'রাজা কহিলেন'—সে কি, কখন ওই প্রাণ-জুড়ান নাম আমার মুখ হইতে বাহির হইল? রাণী তদুত্তরে বলিলেন "ঘুমের ঘোরে আপনি কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, ইহাই পরম সৌভাগ্যের কথা।"

অনন্তর—ভক্ত রাজা হৃদয়-কন্দরের অতি নিভৃত প্রদেশে বহু যত্ন সহকারে, মন-প্রাণ-রসায়ন যে মধুর কৃষ্ণ নাম রক্ষা করিতেছিলেন, আহা, হৃদয়-নিহিত সেই অমূল্য রতন অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়াছে। এই নিদারুণ বাক্য মহিষীর মুখে শুনিয়া হাহাকার করিয়া তিনি ভূমিতলে পতিত হইলেন। তাঁহার সংজ্ঞা যেন একবারে লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল, রাণী মনে করিলেন—তবে কি তাঁহার কৃষ্ণ-ভক্ত স্বামী প্রাণত্যাগ করিলেন?

> হৃদয়-পুটকা মধ্যে ছিল কৃষ্ণ নাম।"
> এত দিন ইহা মুঞি নাহি জানিলাম॥"

ভক্তমাল।

বলিতে বলিতে তিনি শিরে করাঘাত করিয়া অতি করুণ আর্ত্তনাদে মহানুভব স্বামীর জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহার পত্নী একজন প্রকৃত হরিপরায়ণ এবং যিনি স্বয়ং একজন কৃষ্ণ-গত-প্রাণ, নিষ্ঠাবন্ ভক্ত, তাঁহার জীবন কি এরূপ শোচনীয় ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে? ভগবানের কৃপাগুণে রাজার মূর্চ্ছাপনীত হইল; তিনি উঠিয়া বসিলেন। তৎপরে ভক্তের ভগবান ভক্ত-দম্পতির দৃঢ় অনুরাগে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন—

> "সম্মুখে দেখয়ে দোঁহে [illegible]ব ঘন শ্যাম।
> বাঞ্ছিত রতন নিধি মিল অভিরাম॥"

ভক্তমাল।

অবশেষে তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম ধনকে—

> "প্রেমানন্দে যত্ন করি রত্ন সিংহাসনে।
> বসাইয়া সেবা কৈল নিছিয়া পরাণে॥"

অতএব এস ভাই, এই ভক্ত রাজা ও ভক্তিমতী রাণীর শ্রীচরণ যুগলে কোটী কোটীবার প্রণিপাত করিয়া আমরাও, সংসারের পাপে তাপে মলিন—আমরাও ক্ষণকালের জন্য পবিত্র হইয়া অনাবিল আনন্দ ভোগ করি।

দীন—শ্রীরসিক লাল দে।

গর্ভবাস।

সন্ধ্যা হইয়াছে। চারিদিকে শাঁখ বাজিতেছে। শঙ্খের সুগোল গম্ভীর শব্দ বায়ুমণ্ডল কাঁপাইয়া আমার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে পাড়াতে সত্যনারায়ণের পূজা ও সিন্নির ধুম। তাই কাঁসর ঘণ্টাও ঢং ঢং করিয়া বাজিতেছে। এমন সময় আমাদের পাড়ায় সান্-বাঁধানো একটি বেদীর উপর

কয়েকটি লোক খোল করতাল লইয়া হরিনাম করিতে বসিল। আমিও সেই বেদীর একধারে মাদুরের উপর বসিয়া হরিনাম শুনিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ সন্ধ্যাদেবী গা-আড়াল দিলেন। পাড়াগাঁয়ের গোলমাল কমিয়া আসিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় দশটা হইল। পাড়ার সকলে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে সর্ব্বশান্তি-দায়িনী নিদ্রার কোলে শুইয়া পড়িয়াছে। হরিণাম সঙ্কীর্ত্তনের শব্দ ছাড়া পাড়ায় কোন টু শব্দটি আর নাই। একজন গান ধরিল—

বিহর হরিপদে মন ছাড়রে কাঞ্চন,
কামিনী ভুজঙ্গ সঙ্গ,
ছাড় মন ছাড় রঙ্গ,
কাল করিছে ব্যঙ্গ বিকাশি দশন।

এইটুকু শুনিতে শুনিতেই আমার ঘুম ধরিতে লাগিল। বসিয়া বসিয়া ক্রমশঃ সেই মাদুরেরই একটি ধারে কাৎ হইলাম। ঘুম আর থাকে কোথা! যত রাজ্যের ঘুম জড়িয়ে ধরল। কাণে যে হরিণাম ও খোল করতালের ঝন্‌ঝন্ শব্দ প্রবেশ করিতেছিল, তাহা ক্রমশঃ পতি-বিয়োগ বিধুরা রমণীর ন্যায়, প্রভাতকালীন শশধরের ন্যায় ক্ষীণ হইতে লাগিল। আমার বাহ্যজগতের সম্পর্ক একবারে লোপ হইল। ঠিক এমনি সময় দেখিলাম—সম্মুখে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি! মস্তকে দীর্ঘ জটাভার, তুষারশুভ্র কান্তি, শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রু। দেখিয়া আমার মনে হইল ইনিই বোধ হয় অনাদিপুরুষ মহাদেব। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি সংহারকর্ত্তা মহাদেব?"

তাঁহার তিনটি চোকেই মধুর হাসি দেখা দিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন "না বৎস, আমি মহাপ্রাণ মহাদেব।"

"আপনি সৃষ্টিতে কি করেন?"

"আমি লোকের মনে অব্যক্ত আনন্দ দিবার জন্য ব্যস্ত।"

"আমাকে কি আনন্দ দিতে আসিয়াছেন?"

"হাঁ, তুমি আমার সঙ্গে শ্মশানে এস।"

আমি শ্মশানে চলিলাম। শ্মশানে যাই-তেই তিনি ঘোর ঘন রবে মহাকালের শিঙা ভোঁ ভোঁ রবে বাজাইতে লাগিলেন। আমার শরীর অবসন্ন হইয়া মাটিতে পড়িল। দেখিলাম আমার শরীর মাটিতে পড়িয়া আছে, আর আমি পৃথক্‌ভাবে নিকটে দাঁড়াইয়া।

ক্ষণকাল পরে দেখি যে কি একভাবে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া আমি একটী কক্ষে প্রবেশ করিলাম। এখানে তৎক্ষণাৎ আমার একটী ক্ষুদ্রাকার স্থূল শরীর হইল। অন্ধকার ঘুটঘুট করিতেছে! কিন্তু কি আনন্দপূর্ণ স্থান! বাহিরের গোলমাল এখানে একটুও পৌঁছায় না। একবারে নিস্তব্ধ। এখনে ভালবাসা নাই, বিচ্ছেদ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই। কি ছিলাম, কি অবস্থায় আছি, কি হইব, এ সব যেন ভুলিয়া গেলাম। আমাকে আহার অন্বেষণ করিতে হইল না, জাগ্রৎ কি নিদ্রিত রহিলাম, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। কেবল চোখ বুজিয়া, বুকের উপর হাত দুখানি দিয়া, পা দুটি গুটাইয়া বসিয়া, কোন এক অচিন্ত্য অব্যক্ত আনন্দে বিভোর হইয়া রহিলাম। এইরূপে প্রায় দশ মাস কাটিয়া গেল। আমি ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া

নির্জ্জনে সেই মহাত্মাণের আনন্দময় মূর্ত্তি ভাবিতে লাগিলাম, আর প্রতিপলে আমার হৃদয়-কন্দর হইতে আনন্দের উৎস যেন অবিশ্রান্ত ধারায় ছুটিতে লাগিল। আহা সে আনন্দের বিশ্রাম নাই, সীমা নাই, আদি নাই, অন্ত নাই।

সে আনন্দে দুঃখের ছায়া নাই, স্বার্থের কলঙ্ক নাই, মোহের জড়তা নাই, কু-আশার তমঃ নাই, কালের অধিকার নাই। এ হেন সুখের সময়ে আমার কাণে ভোঁ ভোঁ রব পুনরায় গর্জ্জিয়া উঠিল। যাহার কাণে দশ মাস কোন শব্দ প্রবেশ করে নাই, আজ তার কাণে শব্দ প্রবেশ করিল। ভাবিলাম এ শব্দ অনন্ত শক্তিসম্পন্ন শঙ্করের শিঙারব ভিন্ন আর কিছুই নয়। নতুবা এরূপ রুদ্ধ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অন্য কোথাওকার শব্দ প্রবেশ করিতে পারে না। যাহা হউক, সেই শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সেই শব্দের—সেই পূর্ব্ব-পরিচিত গভীর নিনাদের মধ্য হইতে কয়েকটী কথা যেন অস্ফুটমধুরস্বরে কাণে বাজিয়া উঠিল। শুনিতে পাইলাম—

যে ভাবে ডুবিয়া তুমি,
মহানন্দে দিবাযামি,
বিভোর আছিলে—তাহা কভু যেন ভুলো না,
এস অন্ধগৃহ ত্যজি,
অনন্ত সৃষ্টিতে আজি,
নিচুপানে মাথা কর, মাথা যেন তুলো না।
এ ভাব বিস্মর যদি,
দুঃখ পাবে নিরবধি,
তোমায় দুঃখেতে হবে শঙ্করের যাতনা,
আনন্দ জাগাতে প্রাণে,
পুনরায় এইখানে
আনিব তোমারে তবে, শাস্তি পাবে নূতনা।

শুনিতে শুনিতে মাথাটা ভোঁ করে নিচের দিকে ঘুরিয়া পড়িল। অমনি তাড়াতাড়ি আমাকে কে যেন বাহিরে আনিল। বাহিরে আসিয়া পিট্‌পিট্ করিয়া চক্ষুদুটি খুলিলাম। অনন্ত সৃষ্টি দেখিয়া সব ভুলিয়া গেলাম। আবার ক্ষুধা তৃষ্ণা সব আক্রমণ করিল। ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিতেছি, এমন সময় দেখি বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে, আর আমি সেই মাদুরটির উপর বা হাতটিতে মাথা দিয়া শুইয়া আছি। তখনও হরিণাম চলিতেছে।

শ্রীমুনীন্দ্র নাথ দে।

মানব-প্রকৃতি।

ঈশ্বর সর্ব্বত্র মঙ্গলময়। আমরা প্রতি কার্য্যে, প্রতি পাদ-বিক্ষেপে, সেই পরম কারুণিক জগৎ-পিতা জগদীশ্বরের অনন্ত দয়ার অত্যুজ্জ্বল পরিচয় পাইয়া থাকি। কিন্তু মূঢ় আমরা, তাঁহার সেই অনির্ব্বচনীয় কার্য্য নিচয়ের মঙ্গলময় অতি নিগূঢ় অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া, আপাত সুখে হর্ষোৎফুল্ল ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হই। আবার কখনও বা স্বীয় অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ও দুর্ব্বিসহ, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের যাতনায় জর্জ্জরীভূত হইয়া মতিভ্রান্তি বশতঃ স্বীয় দুরদৃষ্টকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অখিল কৃপার নিদান পরম মঙ্গলময় পরম পিতা পরমেশ্বরকে শত শত দোষারোপ

করতঃ স্বীয় নিকৃষ্টতম পাশব-বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকি। আমরা মনে করি তিনিই আমাদের সকল দুঃখের নিদান। তিনি অনিরপেক্ষপাতিত্ব-দোষে কলুষিত বলিয়াই একজনকে নির্ম্মল, স্বর্গীয় সুখের অধিকারী ও পক্ষান্তরে অপরকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভারে জর্জ্জরীভূত ও ক্লিষ্ট করিতেছেন। আমাদের এমন বিবেচনা অতীব ভ্রান্তি মূলক। বস্তুতঃ, পরম কারুণিক নিরময় ঈশ্বর, কখন ও মানবের ন্যায় এবম্বিধ নিকৃষ্ট কলুষ ভাবাপন্ন হইতে পারেন না। সেই নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, অতুচ্চ, অব্যয় জগদীশ্বরের প্রতি কর্ম্মই, নিয়ত আমাদের মঙ্গল উদ্দেশ্যে সংসাধিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার সম্বন্ধে ভিন্নরূপ কল্পনা করাও মহা পাপ এবং অবশ্যম্ভাবী অনন্ত নিরয়-যাতনা প্রদ। মানব মাত্রেরই তাঁহার অলৌকিক অনন্ত দয়ার বিষয় স্মরণ করতঃ ভক্তিরসে অভিষিক্ত হওয়া উচিত।

এ নশ্বর জগতে অবিমিশ্র সুখ-দুঃখ কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। সুখের সহিত দুঃখ এবং দুঃখের সহিত সুখ ওতপ্রোতভাবে নিরন্তর মিশিয়া রহিয়াছে। ধনীর সুধাধবলিত সুরম্য হর্ম্ম্য এবং দীনের গলিত পর্ণকুটীর অনুসন্ধান করিলে এ উভয় চিত্রই পরিলক্ষিত হইবে। তবে স্থল বিশেষে ইহার আনুপাতিক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইবে মাত্র। অনেকের বিশ্বাস, দারিদ্র্য দুঃখের ন্যায় এমন ভীষণতর ক্লেশকর বিষয় বুঝি আর নাই। কিন্তু এটি তাঁহাদের বড় ভ্রম। যে হেতু দয়া-দাক্ষিণ্য-পরদুঃখ-কাতরতা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি যে সকল শ্রেষ্ঠতম স্বর্গীয় শক্তিবলে মানব-হৃদয় দেবভাবাপন্ন হয়, তাহা ধনীর সুশোভিত রমণীয় অট্টালিকা অপেক্ষা, দীনের পর্ণ কুটীরেই সমধিক বিরাজমান পরিদৃষ্ট হয়। যে কখনও দুঃখের বৃশ্চিকবৎ দংশনে জর্জ্জরিত হয় নাই, পর দুঃখ দেখিয়া, তাহার অশ্রুবিন্দু পতিত হইবে কেন? যে জন আজীবন দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শায়িত হইয়া আসিতেছে, ঐ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড দেবের খরকরে ম্রিয়মাণ, কঙ্কর পূর্ণ ধূলি-ধূসরিত, পথে শায়িত ভিখারীর দুঃখ তাহার উপলব্ধি হইবার বিষয় নহে। ইঙ্গিত মাত্র যাহার চর্ব্ব্য-চোষ্যাদি অমৃত তুল্য সুস্বাদু ভক্ষ্য দ্রব্য সমূহ করতলস্থ হয়, সে ঐ ক্ষুৎপিপাসাতুর নিরন্ন ব্যক্তির দুর্ব্বিসহ জঠর-যাতনা বুঝিবে কেন? কোনও বিষয় চিন্তা করিবামাত্র যাহার মনোরথ পূর্ণ হয়, সহিষ্ণুতাগুণ তাহার অসম্ভব। যে ব্যক্তি কখনও পরকৃত দয়ার সুস্নিগ্ধ শীতল সলিলে অবগাহন করে নাই, সে অপরকে দয়া করিবে কিরূপে? তাই বড় দুঃখে কবি বলিয়াছেন,—

"কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?"

বস্তুতঃ জীবনে কখনও অভাবে না পড়িলে, সে কখনও অপরের অভাবে দয়ার্দ্র হইয়া, সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। বলিতেছিলাম—ঈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি চরিত্রোৎকর্ষ-সম্পাদন-শিক্ষার নিমিত্তই, মানবকে সময় সময় সুগভীর দুঃখার্ণবে আপাদ-শীর্ষ নিমগ্ন করিয়া থাকেন। আমরা স্বীয় স্বীয় দুঃখ দূরীকরণার্থ যে রূপ যত্ন করিয়া থাকি, অপরের

দুঃখটি সেই রূপ হৃদয়ের সহিত উপলব্ধি করিয়া তন্মোচনার্থ যত্নবান হইলে, এই পাপ-তাপ ময় ধরিত্রীই স্বর্গ হইতে পারে এবং করুণাময় জগৎ পাতা জগদীশ্বরেরও একটি মহদুদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে।

কিন্তু স্বার্থপর মানব কেবল নিজ সুখানুসন্ধানে তৎপর। নিজ সুখের নিমিত্ত অন্যের শত অনিষ্ট পাত হউক, তৎপ্রতি ভ্রমেও এক বার ফিরিয়া চাহিবে না! হায়! আমরাই না আবার ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্ট প্রাণী মানব বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকি! ধিক্ আমাদিগকে! ততোধিক শত সহস্র ধিক, আমাদের মানব নামে অযথা গর্ব্ব করিবার জঘন্য স্পৃহাকে। মানুষ হইতে হইলে পরের প্রতি নজর রাখাই কর্ত্তব্য। এবং এরূপ শিক্ষাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

জীবনের উদ্দেশ্য।

জীব জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া অবিরাম কালস্রোতে ঘুরিয়া মরিতেছে। কেন ঘুরিতেছে এবং কিসের জন্যইবা তাহার এ অবস্থা—ইহা নির্ণয় করিয়া উঠা বড় একটা কঠিন ব্যাপার, যতক্ষণ আমরা নড়িতেছি, উঠিয়া বেড়াইতেছি, নানারূপ কাজ করিতেছি—ততক্ষণই আমাদের অস্তিত্ব বর্ত্তমান, নচেৎ আমরা কিছুই নহে—জড়পিণ্ড মাত্র। এই বিশাল জগতক্ষেত্রে কাহাকে কি করিতে হইবে এবং কাহার বা কি উদ্দেশ্য, তাহা যদি বুঝিয়া আমরা সকলেই সেই দিকে শত বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের আর দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা লক্ষহীন হইয়া সমুদ্রস্থিত অর্ণবপোতের ন্যায় চারিদিকে যেন ভীষণ বায়ু-তাড়িত হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছি। একান্ত চিত্তে যদি ভাবিয়া দেখা যায়,যে আমরা কোন পথের পথিক,তাহা হইলে প্রাণে কতককটা শান্তি আসিয়া মস্তকের দুর্ব্বহ বোঝা নামাইয়া কিছুকালের জন্য আমরা একবার স্থির হইতে পারি। এমন করিয়া দিশাহারা হইয়া মরিতে হয় না, ঘোর অবসাদে কর্ত্তব্য-কার্য্যে বিরত হইয়া পড়ি না। আমরা দুর্ব্বহ-ভারে প্রপীড়িত। আমরা ঘুমাইয়া কত সুখ-সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন দেখি। এ নিদ্রা আমাদের ছাড়িতেছে না, ছাড়াইবার চেষ্টাও করিতেছি না, একবার যদি ভাবিয়া দেখি—আমরা কোথা হইতে কি করিতে আসিয়াছি, তাহা হইলে আর স্থির থাকিতে পারিব না, তখনই উঠিয়া পড়িয়া কর্ত্তব্য-স্রোতে জীবনকে গা ঢালিয়া দিতে ছাড়িয়া দিব, একজন ইংরাজ কবি বলিয়াছেনঃ—

I slept and dreamt that life was beauty
I woke and found that life was duty.

সুতরাং আমরা কর্ত্তব্যে বাঁধা, অতএব আমাদের ঘুমাইলে চলিবে না—কাজ করিতে হইবে। কাজ করিতে হইলে জ্ঞানলাভ চাই, বিনা জ্ঞানলাভে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হইবে না। এক একটী জীবনে একপদ একপদ করিয়া জ্ঞানের পথে অগ্রসর না হইলে আমরা এই ভাবেই থাকিব, আর উঠিতে পারিব না, শাস্ত্রে আমরা

দেখিতে পাই যে জন্মিলে আমাদিগকে দুঃখের ভাগী হইতে হইবে। অতএব দুঃখের নাশই আমাদের প্রয়োজন। দুঃখকে নাশ করিতে হইলে জ্ঞানটী অগ্রে চাই, সেই জ্ঞান লাভই আমাদের চরম, আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

এখন জ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে আর একটী বস্তুকে ধরিতে হয়, তাহা প্রেম, সেই প্রেম আসিলে আমাদের উদ্দেশ্যের পথ সরল হইবে। কিন্তু প্রেম লাভ করিতে হইলে অনেকগুলি গুণ চাই, যখন সেগুলি লাভে সমর্থ হইয়া দাঁড়াইব, তখন আমাদের জীবনের পূর্ণত্ব লাভ হইবে।

জগতে যত জীবের সৃষ্টি হইয়াছে তন্মধ্যে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মানবকে ভগবান নানারূপ বৃত্তি প্রদান করিয়া জগতক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন। স্বইচ্ছায় যাহা করিবে—তাহার ফল নিজেই পাইবে। এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে কর্ম্ম দ্বিবিধ, সু এবং কু। ইহাদের ফলও এইরূপ। কোনটী করিব এবং কোনটী ত্যাগ করিব, তাহা মন পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া লয়। কিন্তু মনটী আমাদের সহজে বশীভূত হইতে চায় না। কোন কর্ম্ম করিতে যাইলে মন তাহা ভাল কি মন্দ বিচার করে না, বিবেক বুদ্ধি দ্বারাই আমরা এ বিচার করিয়া থাকি, এখন এই বিবেকই আমাদের প্রধান। যতক্ষণ এই বিবেক লইয়া কার্য্য করিব, ততক্ষণই আমাদের মঙ্গল, নচেৎ আমাদের সর্ব্বনাশ আমরা নিজেরাই ডাকিয়া আনিব।

মানুষ যখন তখন বলিয়া থাকে যে "আমার মন যাহা বলিবে তাহাই করিব"। কিন্তু মন কিছু বলে না, সে অশান্ত বালকের মত সর্ব্বদা চঞ্চল—যে দিকে পায় সেই দিকেই ছুটিয়া যায়। তাহাকে স্থির রাখিয়া কাজ করা বড়ই কঠিন। আমার মনে একটা কাজ করিবার ইচ্ছা হইল বলিয়াই যে তাহা করিব—তাহা ঠিক নহে। যখন আমার মনে বিবেক আসিয়া বিচার করিতে থাকিবে, তখন তাহা করিব কি না করিব তাহার একটা নিষ্পত্তি হইবে। অতএব মনের অনুযায়ী কাজ করা কোন মতে উচিৎ নহে। মনকে শাসনে রাখিতে হইবে। বিবেক শক্তি মানবের স্বভাবত। ইহা অভ্যাস কিম্বা অপর কোন কার্য্যের দ্বারা হয় না। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রকৃতির কোলে থাকিয়াই মানব ইহা পাইয়া থাকে। ইহাকে পণ্ডিতেরা আত্মা এবং ভক্তেরা ভগবান বলিয়া থাকেন। অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন।ঃ—

জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তি"।
জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তি ॥
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

প্রকৃতির কোলে থাকিয়া মানুষ ক্রমে সব জানিতে পারে কিন্তু চঞ্চল মনের গতি তাহাকে পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। আত্মভোলা হইয়া সে তখন ভগবানের উপর নির্ভর করে। ভগবান কি আমাদের মনের ভিতর আসিয়া কার্য্য করিয়া দেন? তাহা নহে, অর্জ্জুন ভক্ত ছিলেন বলিয়া বলিয়াছিলেন—যে নারায়ণ তুমিই আমার সব। আমায় যেমন চালাইবে আমি সেইরূপ চলিব। অর্থাৎ তুমিই আমার অন্তরস্থ বিবেক-শক্তি।

সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া মানব মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নি, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির দ্বারা আবরিত হইয়া পড়ে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা মমতা, মায়া এই সকলের কার্য্য আছে এবং মানুষ তাহা করিবে বলিয়া তাহার অন্তরে আপনি সেই সকল বীজ অঙ্কুরিত হয়। শিশু জন্মিয়া মা বলিতে থাকে, ক্রমে মায়ের অভাব বুঝে, অভাবে কষ্ট আসিলেই ভালবাসা আসে, তাহার জন্য কেহ তাহাকে শিখায় না, শিখাতে পারে না, সে আপনি শিখে। স্বভাবে যাহা হয় তাহার কর্ত্তা মানুষ নয়। তাহাতে বাধা দেওয়া কাহারও সাধ্য নহে। আমাদের স্বভাবে যাহা হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদ আমরা করিতে পরি না এবং পরিবও না। জন্মিয়া মাতা পিতার ক্রোড়ে হাসিয়া কাঁদিয়া কাটাইতে হইবে। শরীরের কষ্ট হইলেই কাঁদিব, সুখ হইলেই হাসিব, ক্রমে বৃত্তি পরিস্ফুট হইবে, জ্ঞানের সঞ্চার হইবে, নিজের কর্ত্তব্য নিজে নিজেই বুঝিয়া লইব, যতকাল মনের কোমলত্ব থাকিবে ততকাল স্থির হইতে পারিব না, মন সর্ব্বদাই কুপথে ছুটিতে থাকিবে, সেই সময় মনকে স্থির করিবার জন্য,ভবিষ্যতে সুখী হইবার জন্য আমাদের জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। মঙ্গলময় পিতা মাতার অযাচিত করুণায় আমাদের সেই জ্ঞান লাভের জন্য একজন জ্ঞানদাতার আবির্ভাব হয়, যাহার শিক্ষার গুণে আমরা আমাদের পথ সরল করিয়া তুলি। তখন তাঁহার মুখে তাঁহার আজ্ঞায় মহাত্মাদের বাক্যে, যে বাক্য আমাদের শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে—তাহার শিক্ষায় আমাদিগের চরিত্র গঠন করিয়া তুলি। ক্রমে ব্রহ্মচর্য্য,জীবনের প্রথমেই কঠোরতা,ভীষণ-সংযম। মানব জীবনে সংযম না থাকিলে, ভিত্তি পাকা না হইলে কিছুই হইবে না, যাহা করিতে যাইবে তাহাতেই অকৃতকার্য্য হইবে।

সচরাচর সংযম নাম শুনিলেই আমরা আকুল হইয়া পড়ি। মনের ভিতর বৈরাগ্যের ছায়া আসিয়া পড়ে, তখন আমরা ভাবি—বুঝি যোগী না হইলে সংযমী হওয়া যায় না। সংসার ত্যাগ করিয়া মায়া কাটাইয়া বনে গমন করিতে না পারিলে বুঝি সংযম শিক্ষা হইবে না। হায়! আমাদের এরূপ ভ্রান্তি কবে যাইবে, কবে আমরা এই সুন্দর সংসার-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া স্নেহ প্রেম ভালবাসাকে আলিঙ্গন করিয়া বীনা বাধায় সংযম শিক্ষা করতঃ আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিব। এই অসীম বিশ্ব-রাজ্যের অনুপম শোভা এবং এই বিশ্বরাজ্য আমার, আমি ছাড়িতে পারিব না, আমাকেও উহারা ছাড়িবে না। জগতে যাহা কিছু সুন্দর আছে—তাহা আমার। বাসন্তী পূর্ণিমায় নিলীম আকাশে পুর্ণ শশধরের বিমল শুভ্র জ্যোৎস্না, অমাবস্যার গাঢ় তিমির যামিনী, উষা-ললাটের সিন্দুর বিন্দু সকলই সুন্দর, এরা আমার। মৃদুল মলয় মারুত, দোদুলামান বল্লরী, প্রস্ফুটিত সুগন্ধ বিশিষ্ট কুসুম, নির্ম্মল সলিলা তটিনীর কুলু কুলু ধ্বনি, প্রাবৃটের বিদ্যুদ্দাম চকিত আকাশ সকলই সুন্দর—এরা আমার। শিশুর কোমল হাসি, পিতামাতার স্নেহ, ভ্রাতার সৌহৃদ্য,পত্নীর প্রেম, পুত্রের ভক্তি, সকলই সুন্দর অতি—সুন্দর, যখন সংসারের পবিত্র প্রেমরাশি হৃদয়ে উছলিয়া উঠে,

যখন প্রেমের জন্য আত্মহারা হই, যখন জননী অকাতরে পুত্রের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেন, সাধ্বী সতী পতীর জন্য যখন সকল সহ্য করিতে পারেন। যখন ভ্রাতা অকাতরে শতদুঃখ হৃদয়ে ধারণ করে, তখন ভাবি—এখানে আমার ছাড়িবার কিছুই নাই। সবই আমার, এত সৌন্দর্য্যরাশি ত্যাগ করিব কি করিয়া। আমি যে ভোগী, ভোগ আমার আছে। মানুষকে ভুগিতে হইবে। ভোগ তো ছাড়িবার নহে।

বহুকাল হইতে আমরা শুনিতেছি এবং দেখিতেছি যে সংসার কিছুই নহে—সকলই অনিত্য।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্র।
সংসারোয়ং অতীব বিচিত্র॥

কেহ থাকিবে না এবং কিছুই কিছু নহে, তাহা সকলেই জানে। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া তবে কেন ইহাতে মজিয়া থাকি? কেবল মাত্র জ্ঞানহীন বলিয়াই আমাদের এত দুর্গতি। আমাদের সংযম নাই বলিয়া অল্পেতেই আমরা মাতিয়া উঠি, স্বার্থের জন্য দিগবিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ি। ভোগের লালসা আমাদের অত্যন্ত প্রবল, বৃক্ষে ফুল ফুটিয়া রূপ-রাশিতে চারিদিক ভরাইয়া ফেলে, যতক্ষণ তাহার ভোগ না হয়, যতক্ষণ আমরা সংযমী হইয়া থাকি, ততক্ষণই তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু যখনই ডাল ভাঙ্গিয়া ফুল ছিঁড়িয়া ফেলি—তখনই তাহার সৌন্দর্য্য কোথায় ভাসিয়া যায়। শৈশবাবস্থা হইতে সংযমী হইতে শিখিলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত বৃত্তিগুলি আমরা আমাদের অধীনে আনিতে পারি। যদি বসন, ভূষণ, আহার, বিহার, আমোদ, সকল বিষয়ে সংযমী হই তাহা হইলে, সকল বিষয়েই আমরা সুখী হইতে পারি। আজ সংসারে সাক্ষাৎ দেবতা পিতার মৃত্যু হইল, কাঁদিয়া আকুল হইলাম। স্নেহের ধন পুত্র-রত্ন চলিয়া গেলে সমুদয় ছাড়িয়া প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইলাম, ইহা কি আমাদের অসংযমী হইবার ফল নহে? ইহাতে কি আমরা কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হই না। জানি সংসারে মৃত্যু অনিবার্য্য—কাতর হওয়া উচিত নয়, তথাপি আমারা ঐরূপ করি কেন? আমাদের সংযম নাই বলিয়া। যখন সংযম আসিবে, যখন ভিত্তি পাকা হইবে, তখন আর আমাদিগকে পার্থিব শোক-দুঃখে এত কাতর হইতে হইবে না, অতএব সংযম-শিক্ষাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

জীবনের প্রথম অবস্থা হইতে সংযমী হইয়া যখন সংসারে প্রবিষ্ট হইব, তখন আমাদের সুখ দুঃখ সমভাব হইয়া দাঁড়াইবে। কেবল জীবনে কর্ত্তব্যের নিশান তুলিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইতে থাকিব। কত বাধা, কত বিপত্তি, কত পদস্খলন, কত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধে জয় লাভ করিতে হইবে, তাহার ভাবনা একবার ভাবিলে, হে মানব! একবার মুদিত-নেত্রে মনস্থির করিয়া ভাবিলে, আর কি বসিয়া থাকিতে পারিবে?

তখন ভাবিবে আমি কে? আমার এত বাসনা কিসের জন্য, এ দুর্জ্জয় কাম, ক্রোধ, রিপু কেন আসিয়াছে? কাহার জন্যই বা অর্থে মন ধাবিত হইতেছে? যখন বুঝিবে তখন দেখিবে—সম্মুখে সংসার, অনন্ত কর্ম্ম-স্রোত, তখন বুঝিবে—ওই স্থানেই তোমার ভোগ-

বাসনা, ওই স্থানেই তোমার সংযম, ওই স্থানেই তোমার বিবেক-শক্তির প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান।

সংযমী হইয়া সংসারের সুখ দুঃখ মস্তকে বহন করিয়া চলিতে থাকা, মানুষের যে একটা কর্ত্তব্য—ইহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। বৃত্তির প্রধান প্রেমকে স্বর্গীয় প্রেমে পরিণত করিতে হইলে, আমাদিগকে কতদূর সংযমী হইতে হইবে—তাহা অগ্রে বুঝা প্রয়োজন। আজ সমস্ত পরিবারের জন্য নিজ জীবনকে তুচ্ছ করিয়া অর্থান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত চাকুরী করিতে করিতে জীবন ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, আর পারি না—বড় কষ্ট। এত কষ্ট সহ্য করিয়াও কাহাকে সুখী করিতে পারিলাম না। হায়, কি অভাগা আমি! এইরূপে নানা চিন্তা যতক্ষণ হৃদয়ে থাকিয়া আমাদের মনকে সঙ্কীর্ণ করিতে থাকিবে; ততক্ষণ আমরা অজ্ঞান। কিন্তু যখনই নিজের স্বার্থ ছাড়িয়া ঐ সকল পরের জন্য নিয়োজিত করিতে শিখিব। যখন সংসারের কর্ম্ম সমস্ত ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভে সমর্থ হইব। তখন বুঝিব, মানব জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। কিন্তু আমরা যুগে যুগে কতবার আসিতেছি—যাইতেছি। আমরা কি করিতেছি এবং আমাদের কি করিতে হইবে, তাহা আমরা জানি না। এইরূপ উদ্দেশ্য হীন্ জীবন কি অনন্তকালই বহন করিতে হইবে?

মানব জীবনের প্রকৃতি উদ্দেশ্য—ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইয়াও আমরা সুধালাভের পরিবর্ত্তে তীব্র গরল গলাধঃকরণ করিয়া প্রাণে মরিতেছি, এবং আমাদের গতায়াতও বন্ধ করিতে সমর্থ হইতেছি না। ইহার তুল্য আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্ধ্যা।

(১)

ধূসর বরণ, পরিয়া বসন
কপালে পরিয়া তারার টিপ
আসিয়াছে সন্ধ্যা। ঘরে ঘরে তাই
পল্লী বাসিনী জ্বালিছে দীপ।
তখনও কিন্তু আকাশের কোলে
দেখা যায় দূরে গাঁয়ের রেখা;
প্রান্তর ঘেরি, মসীর বরণে
তুলিকায় যেন রয়েছে আঁকা।
সারাটি দিবস ছুটিয়া ক্লান্ত
মাঠের প্রান্তে চলেছে রবি।
এঁকেছে সন্ধ্যা, গগণের' পরে
নয়নাভিরাম মোহন ছবি।
পূরব আকাশে, ঘন কালো মেঘ
পশ্চিমে শুধু সিঁদুর রাশি;
কে যেন খুলিয়া, স্বরগের দ্বার
দেখায় জগতে বিভুর হাসি।
মাথার উপরে, ধূসর আকাশে
বিহগের দল কুলায়ে ফেরে।
পাটল ধবল, নানাবিধ গাভী
গোপালের সনে ফিরিছে ঘরে

ঝির্ ঝির্ করি, বহিছে বাতাস
ঝিঝিকা মধুর ধরেছে তান।
কুল কুল করি, গাহিছে তটিনী
অমৃত বরষী অস্ফুট গান।

(২)

ধূসর বরণ, পরিয়া বসন
আঁচলে ভরিয়া বিবিধ ফুল
আসিছে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ধীরে
মুক্ত করি ঘন আঁধার চুল।
দিবা-শ্রম-খিন্ন, যতেক পরাণী
অলস অবশ শিথিল কায়,
স্নিগ্ধ সুশীতল, প্রকৃতির কোলে
বিথারি শরীর জুড়াতে চায়।
দিবসের হাঁক, দিবসের ডাক,
করম কল্লোল গিয়াছে এবে ;
কি জানি কি এক গভীর মহান্
স্বপনের ভাবে ঢেকেছে সবে।
জন কোলাহলে, মুখরিত মহী
যেন আচম্বিতে হইয়া স্থির,
মহাশূন্য মাঝে বসেছে ধেয়ানে
শিব শম্ভু সম নীরব ধীর॥

শ্রীরণধীর চট্টোপাধ্যায় বি, এ

ক্ষুদ্রের কথা।

ও কি! আমি কেবল মুখ দিয়া দুইটি মাত্র কথা বাহির করিয়াছি—অমনি যে একটা ঘৃণা-ব্যঞ্জক, তাচ্ছিল্যদ্যোতক ভ্রুকুটি আপনাদিগের সরলদৃষ্টিকে কুটীল করিয়া তুলিল! ক্ষুদ্রের কথা! সেটা কি আবার শুনিবার যোগ্য! তাহা শুনিয়া কি সময়ের অপব্যবহার করিতে আছে! আমাদের সময় অনেক বেশী মূল্যবান! আজ্ঞা হ্যাঁ,—সে কথা অবশ্যই সত্য আপনাদের সময়ের মূল্য অনেক বেশী, তাহা সহস্রবার স্বীকার্য্য কিন্তু তাই বলিয়া আমি ক্ষুদ্র, আমার যে কিছু বলিবার থাকিতে পারে না---ইহার কি একটা অর্থ আছে? এসংসারে কথা কি কেবল মহতের জন্যই হইয়াছে? লোকযাত্রাতে এই-রূপই দেখা যায় বটে—এ ভুবনে সকলেই কেবল মহৎ লইয়া ব্যস্ত! মহতের কথা থাকুক বা না থাকুক—তাঁহার কথা শুনিবার জন্য শতসহস্র লোক উদ্গ্রীব রহিয়াছে! লক্ষ লক্ষ লোক উৎকর্ণ রহিয়াছে! কোটি কোটি লোক উৎসুক হইয়া আছে! কিন্তু আমি ক্ষুদ্র—আমার কথা যদি আমি গগনভেদী দুন্দুভি নিনাদের দ্বারা অনন্ত জগতের অনন্ত বায়ুতে অনন্তকাল প্রতিধ্বনিত করি, তথাপি সে তরঙ্গ সংসারের কর্ণকুহর স্পর্শ করিবে না! সংসার আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না। আর মহৎ যদি কোন কথা নাও বলিতেছেন, তথাপি বলিতে পারেন বলিয়া ঐ দেখ সহস্র চক্ষু তাঁহার ওষ্ঠপুটের প্রতি অনিমিষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছে!

এ সংসারে যাঁহারা বড়লোক বলিয়া খ্যাত আছেন, একজন বলিতে দশজন তাঁহাদের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সশব্দে সোল্লাসে প্রতিধ্বনিত করিতেছে। তাঁহার অসুখ বিসুখ আছে কিনা, রাত্রিতে সুনিদ্রা হইয়াছে কিনা, তাঁহার দুধের সর অতিরিক্ত পুরু বা অতিরিক্ত

পাতলা হইয়াছে কি না, তাহার তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য ঐ দেখ দ্বারদেশে অসংখ্য শুশ্রুষু অপেক্ষা করিতেছে ; কিন্তু আমি ক্ষুদ্র পাখা-ওয়ালা, আমি যে সারা রাত্রি জাগিয়া পাখা টানিতে টানিতে একটু তন্দ্রাবিষ্ট হওয়াতে কশাঘাত লাভ করিয়া এক হস্তে ব্যথিত স্থল অবমর্ষণ করিতে করিতে অন্য হস্তে পাখা টানিতেছি, রুধির স্রোতে আমার পরিধেয় বস্ত্র রঞ্জিত হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার, তাহা দেখিয়া আহা বলিবার কি একজনও ইহাদের মধ্যে আছে ?

সুতরাং তোমরা যে ক্ষুদ্রের আবার একটা কথা থাকিতে পারে—ইহা ধারণাই করিতে পার না—ক্ষুদ্রেরও যে একটা বেদনা,একটা সুখ-দুঃখানুভূতি, একটা হর্ষ, একটা বিষাদ আছে, হউক তা সব ক্ষুদ্র—হউক যত তুচ্ছ কিন্তু তবু যত ক্ষুদ্রই হউক, যত তুচ্ছই হউক একটা কিছু আছে, সেটা তোমরা কল্পনাতে আনিতে পার না। ক্ষুদ্রের অস্তিত্বের একটা কিছু মূল্য আছে বলিয়াই তোমরা বুঝিতে পার না বা বুঝিতে চাও না। কিন্তু ভাই ! তোমাদিগকে আমি সামান্য দুই চরিটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমার কথা বেশী নহে সুতরাং একটু অনুগ্রহ করিয়া কথা কটা শুনও, একটু বুঝিবার চেষ্টা করিও।

আমি ক্ষুদ্র—চিরকাল ক্ষুদ্র আছি—চির-কাল ক্ষুদ্র থাকিব। কিন্তু আমি যে তোমাদের এত ঘৃণার, এত অবহেলার পাত্র হইব, আমার অপরাধটা কি ? তুমি বলিবে ক্ষুদ্রত্বটাই তোমার অপরাধ। তুমি যদি নৈয়ায়িক হও—তবেতো আবার তাহার মধ্যে ক্ষুদ্রত্বাবচ্ছিন্ন ভাবাদির সমাবেশ করিয়া আরও মাদৃশ ক্ষুদ্রের অবোধ্য করিয়া তুলিবে। ভাল, ক্ষুদ্রত্বটাই যদি আমার অপরাধ হইল, তবে মহত্বটাই বা তোমার অপরাধ না হইবে কেন! আমার ক্ষুদ্রত্বও যেখান হইতে, তোমার মহত্বও সেইখান হইতে। সুতরাং আমি যদি ক্ষুদ্রত্বাবচ্ছিন্ন ভাবের জন্য অপরাধী হই, তবে তুমিই বা মহত্বাবচ্ছিন্ন ভাবা-বিষ্ট হইয়াও নিষ্কৃতি পাইবে কেন ? যে দেশে সবাই এক অঙ্গুলি পরিমিত মানুষ, সেখানে সাড়ে তিন হাত মানুষ গিয়া উপস্থিত হইলে তাহারা তাহার সেই গুরুবপুত্বটাকে নিশ্চয় একটা মহান্ অপরাধের মধ্যেই গণ্য করিবে। মূর্খের দেশে পণ্ডিতও সুসংস্কৃত-বাক্য-কথন জনিত গুরুপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হন! অতএব তুমি যেমন এক হিসাবে আমাকে অপরাধী বলিতে পার, আমিও তেমনি সেই হিসাবে তোমাকে অপরাধী বলিতে পারি।

যাক্, তাও না হয় ছাড়িয়া দিলাম। আরও অনেক বিষয় আছে।

তোমরা যে ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা কর, যাহার অস্তিত্বের মূল্যই আদৌ বুঝিতে পার না, সেই ক্ষুদ্রই যে তোমাদের মহত্বের মূল, সে কথাটা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ ? আমরা ক্ষুদ্রেরা আছি বলিয়াই যে তোমরা বৃহতেরা বৃহৎ হইয়াছ, মহতেরা মহান্ হইতেছে—সেটা একবার প্রনিধান করিও। এ জগতে যদি আমরা, এই ক্ষুদ্রেরা না থাকিতাম,—তবে তোমাদের এ মহত্বের বিকাশ হইত কেমন করিয়া ? এ সংসারারণ্যে আমরা সব ক্ষুদ্র লতা

গুল্ম আছি বলিয়াই 'তোমরা সহকার-শাল, তমাল সহ যথেচ্ছ শাখা প্রশাখা বিস্তীর্ণ করিয়া অভ্রংলিহ হইয়া উঠিতে পারিয়াছ। যদি সকলেই একই ভাবে বৃদ্ধি পাইতাম, যদি এ জগতে ক্ষুদ্র না থাকিত—তবে বৃহতের বৃহত্ব, ও মহতের মহত্ব, কোথায় থাকিত, সে সম্মান, সে প্রতিপত্তি কোথা হইতে আসিত? আমরা ক্ষুদ্র আছি বলিয়াই তোমরা বৃহৎ—আমরা ক্ষুদ্র না থাকিলে তোমরা বৃহৎও থাকিতে না। অতএব বলিতে হয়, যে আমরাই তোমাদিগকে রাখিয়াছি—তোমাদের অস্তিত্বের মূল আমরা। জগাই মাধাই ছিল বলিয়াই শ্রীচৈতন্যদেবের গৌরব ফুটিয়াছিল—আস্‌সেওড়া, কাঁটা নটে আছে বলিয়াই রসাল, কণ্টকার মান! যে দেশের মধ্যে একটা গ্রামে একটী উপাধিধারী আছেন—সেখানেই তিনি একটা কিছু, কিন্তু যে গ্রামে ঘরে ঘরেই বি, এ, এম, এ, সেখানে কি আর তাঁদের খাতির আছে?

অতএব বুঝিয়া দেখ হে মহৎ, হে বৃহৎ, যে তোমরা, যে আমাদিগকে এত ঘৃণা এত অবহেলা কর, যে আমাদিগকে স্পর্শেরও অযোগ্য বলিয়া মনে কর, সেই আমরাই তোমার ভূমিত্বের মূল। প্রজা আছে—বলিয়াই রাজা, নতুবা রাজা প্রজা সবই এক! ক্ষুদ্র আমরা, তোমাদিগকে ফুটাইয়া রাখিবার জন্য, তোমাদিগকে বিকশিত করিবার জন্য, আমিত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছি বলিয়াই তোমরা এখনও জীবিত আছ, এখনও স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইতেছ! অতএব বল দেখি হে মহৎ, হে বৃহৎ, কার নীতি প্রশংসনীয়? যে নীচকে সর্ব্বদা প্রকট করিবার জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে তা'র অথবা যে অন্যের সুখের জন্য, সম্মানের জন্য অবিরত নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিতেছে অবিশ্রান্ত নিজ স্বার্থ বলি দিতেছে তাহার? কাহার স্বার্থ ত্যাগ অধিক? কাহার পরহিতাকাঙ্ক্ষা প্রকৃষ্টতর? তুমি মহৎ, তুমিই এ প্রশ্নের সমাধান কর!

অতএব তোমরা যদি নিজ স্থায়িত্বের কামনা কর, নিজ যশোঢক্কার দুন্দুভি নিনাদ শ্রবণে যদি আত্মার তৃপ্তি-সাধনের ইচ্ছা তোমাদের থাকে, তবে তোমাদের স্বীয় সামর্থসিদ্ধির উদ্দেশেই আমাদিগকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন তোমাদের আছে বলিয়া আমি মনে করি। কিন্তু তোমরা যদি অবিরাম আমাদের প্রতি এইরূপ ঘৃণা, এইরূপ অবহেলা, এইরূপ নিষ্পীড়ন ও নিষ্পেষণ চালাইয়া শেষে আমাদিগকে আমাদের অটল—ধৈর্য্যহিমাচলকে টলাইয়া দাও, এবং আমরা যদি তৎফলে আমাদের ক্ষুদ্রত্ব এ পৃথিবী বক্ষ হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিবার সংকল্প করি—সংকল্প করি কেন, যদি তাহা কার্য্যে পরিণতই করি, তাহা হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গেই যে তোমাদের মহত্বও মুছিয়া যাইবে? তাই বলি হে মহৎ, তোমরা মহৎ আছ, তাহাতে আমাদের আপত্তি ও নাই—তোমরা মহৎই থাক, কারণ তোমরা না থাকিলে আমরা নিজ ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না—আমরা তোমাদের বিনাশ কামনা করি না কিন্তু আমাদের প্রার্থনা এই যে আমাদিগের কথা, আমাদের বেদনা শুনিলেই সেটাকে একেবারে অবহেলা করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিও না;—

আমরাও একটী জীব, ভগবানেরই সৃষ্ট এবং তাঁহারই প্রতিপালিত, এ কথাটা মনে রাখিলে কোন অপমান নাই।

তোমরা মহত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া অনেক সময়েই আমাদের কথা, এই ক্ষুদ্রদের কথা একেবারেই ভুলিয়া যাও—সেটা আমাদের বড়ই দুঃখ! যেমন অনেক গরীব পিতামাতার গরীব সন্তান তাঁহাদের শোণিত-দ্রবকারিণী চেষ্টা এবং ভিক্ষালব্ধ অর্থের সাহায্যে শিক্ষিত হইয়া মুন্সেফ, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্লাঘনীয় পদ প্রাপ্তি পূর্ব্বক স্বীয় পিতা-মাতাকে ভুলিয়া যায়, তাঁহাদের পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করে, তেমনি আমাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ফল স্বরূপে তোমরাও আমাদেরই দ্বারা মহৎ হইয়া আমাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছ—এ পরিতাপ রাখিবার স্থল আমাদের নাই।

তোমরা কংগ্রেস কর, কনফারেন্স কর, বক্তৃতা কর, সভা কর, কতই কি কর—অথচ সে সবই ভাল কথা, কিন্তু তাহার মধ্যে আমরা ক্ষুদ্রেরা কতখানি আছি? আমরা উচ্চপদ চাহিনা, উচ্চ অধিকার চাহিনা,—সে সব তোমাদেরই জন্য। আমরা চাহি মাত্র দুটো পেটের ভাত, আর একটু পরিবার কাপড়। এই আমাদের জোটেনা, তারই কোন উপায় আমরা করিয়া উঠিতে পারি না, মনে ভাবি তোমাদের দ্বারা আমাদের একটা কিছু সুবিধা হইবে কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই আমাদের সে আশা আকাশকুসুমবৎ প্রতিয়মান হইতেছে। এখন আমরা বুঝিতেছি যে, তোমরা মহৎ মহতের কথা লইয়াই আলোচনা করিবে। ক্ষুদ্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার অবসর তোমাদের নাই। ইচ্ছা আছে কিনা সেও সন্দেহ।

দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইবার প্রয়োজন আছে কি? তোমারা শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সভা সমিতি করিয়া দলে দলে ছেলেপিলে-দিগকে বিলাত পাঠাইতেছ, তাদের বৃত্তি দিতেছ বেশ ভাল, উদ্দেশ্য মহৎ, তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু আমি দেখিতেছি—আমাদের ক্ষুদ্র-দের তাহার দ্বারা বেশী কোন সুবিধার আশা নাই। আমি একজন ক্ষুদ্র, একটা ফন্দী কৌশল করিয়া একটা নূতন কিছু কল্পনা করিলাম কিন্তু তাহা খাড়া করিবার অর্থ সামর্থ্য আমার নাই—তোমরা কি আমাকে সাহায্য করিবে? কর তাতো বোধ হয় না। তোমরা জাপানী তাঁত, আমেরিকান্ তাঁত ইত্যাদি আনিবার বন্দোবস্ত করিতেছ, কিন্তু আমি একজন ক্ষুদ্র যদি ঐ রূপেই একটা তাঁত করি, তবে সেটার ব্যবসা খুলিবার সুবিধা তোমরা করিয়া দিতে পার না কি? তোমরা মহতেরা যখন মেলা কর, তখন আমরা ক্ষুদ্রেরা বড় আশায় বুক বাঁধিয়া, পরিবারের হাতের শাঁখা জোড়া বাঁধা রাখিয়াও টাকা জোগাড় করিয়া, যদি একটা কিছু নূতন-মত কাজ দেখাইলাম, তোমরা তাহার পুরস্কার স্বরূপ মুখের বাহোবা অথবা বড় জোর সুবর্ণের কি রৌপ্যের মেডেল দিয়া আপ্যায়িত করিলে? কিন্তু মেডেলে কি পেট ভরে—না বাহোবায় ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়? আমার সেই পুরস্কৃত জিনিস-টীর কাটতির কোন একটা পথ যদি তোমা-

দের ন্যায় মহতের দ্বারা না হইল, তবে আর আমাদের আশা কি ?

তাই বলিতেছিলাম যে তোমরা মহতের। মহৎ হইলে আর ক্ষুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পাও না—ক্ষুদ্র সে তো ক্ষুদ্র—চিরকালই ক্ষুদ্র—তার প্রতি দৃষ্টিপাত করাটা ক্ষুদ্রত্ব বলিয়াই বোধ হয় তোমরা উপেক্ষা কর ;—কিন্তু ভাই ক্ষুদ্র বলিয়া একেবারেই উপেক্ষা করিও না। এ জগৎটাই ক্ষুদ্রের সমষ্টি, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণু পরমাণু সমবায়েই ইহার উৎপত্তি আবার অণু পরমাণুতেই ইহার লয়। স্বয়ং ভগবান্ 'অণোরণীয়ান্' অথচ 'মহতো মহীয়ান্।' অতএব অত নাসিকা কুঞ্চিত না করিলেও পার। দেখ যাহাকে তুমি ক্ষুদ্র বল, সেও মহৎ হইতে পারে, যে মহৎ সেও আবার ক্ষুদ্র পর্য্যায়ে আনত হইতে পারে। দশাচক্র-নেমীর আবর্ত্তনের পদ্ধতিই এইরূপ বিধিবদ্ধ আছে।

তাই বলি ভাই মহৎ, ভাই বৃহৎ, ক্ষুদ্রের প্রতি অবহেলা করিও না, ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিও না, ক্ষুদ্রেরও এ সংসারে স্থান আছে, প্রাণ আছে, কাজ আছে, কর্ত্তব্য আছে—প্রয়োজন আছে। ভগবানের রাজ্যে কিছুই নিষ্প্রয়োজনীয় নহে, কিছুই বিনা কাজে আসে নাই। ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিলে তাহার ফল ভাল হয় না। ক্ষুদ্র দোষ উপেক্ষিত হইলে তাহা শেষে জীবনের শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ক্ষুদ্রগুণ অবজ্ঞাত হইলে তাহাও অঙ্কুরে বিনষ্ট হইতে পারে। সে প্রত্যবায় ভাগীও তোমাকেই হইতে হইবে।

আজ তুমি দৈববলে মহৎ হইয়াছ—আজ তুমি পূর্ব্ব সুকৃতি বলে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছ কিন্তু তাই বলিয়া ক্ষুদ্রকে পদদলিত করিও না, ক্ষুদ্রর কাতর প্রাণের বেদনাকে উপেক্ষা করিও না—ক্ষুদ্রের কাতর ক্রন্দনে বধির হইও না! যদিও এখন তোমারই সেবার জন্য, তোমারই সুখের জন্য লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে কিন্তু তথাপি তাহার ক্ষুদ্রত্বের দোহাই দিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ পেষণের উপর পেষণ করিও না, তাহার ক্ষত স্থানে মলমের পরিবর্ত্তে, তপ্ত লৌহ প্রয়োগ করিও না, সকলেরই একটা সীমা আছে, মহত্ত্বেরও সীমা আছে, ক্ষুদ্রত্বেরও সীমা আছে, ধৈর্য্যেরও সীমা আছে। পাছে তোমার এই মহত্ত্বের পীড়নে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার মহত্ত্বের অন্তিমদশা উপস্থিত হয়, তাই একটু ইঙ্গিত করিলাম। সময়ান্তরে আরও কিছু হিতকথা তোমাকে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ।

প্রেমের পুরস্কার।

(ক্ষুদ্র গল্প।)

সে আজ অনেক দিনের কথা। সে দিন আমি আমার বন্ধু মহম্মদের সঙ্গে বেড়াইতেছিলাম। তখন আকাশে মেঘ ছিল এবং মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ দেখা দিতেছিল। বৃষ্টি নামে নাই,—কেবল পদ্মাশীকরসম্পৃক্ত মন্দানিল আমাদের শরীর শীতল করিয়া দিতেছিল।

আমরা বেড়াইতেছি,—দুই জনেই নীরব। পশ্চাতে বিশাল নিস্তব্ধ প্রান্তর—সম্মুখে কল-নাদিনী ভৈরবী পদ্মা। প্রাণের মধ্যে নানা-প্রকার ভাবনা তোলাপাড়া করিতেছিল। মনে হইতেছিল যে, আর একদিন এমনি অস্পষ্ট প্রদোষালোকে—এমনি নিস্তব্ধ আকাশতলে—এই পদ্মাসৈকতে মুন্নার সহিত আমার কথোপকথন হইয়াছিল। হায়, সে কি ভয়ানক দিন! এত যত্ন, এত চেষ্টাতেও মুন্না আমার হইল না। জানিনা মুন্না, মহম্মদ তোমাকে কি গুণে বশীভূত করিয়াছেন!

কিয়ৎকাল নীরবে পাদচারণা করিবার পর মহম্মদ আমায় বলিল—"দেখ, ওয়াহেদ আজ তোমায় একটি কথা বলিব।"

আমি বলিলাম—"কি বলিবে বলনা ভাই।"

মহম্মদ—"তবে সত্য করিয়া বল, মুন্নাকে তুমি ভালবাস কিনা?

আমি বলিলাম—"জানি না ভাই, সে আমায় ভালবাসে কিনা, কিন্তু আমি তাহাকে ভালবাসি—সে যে বড় সুন্দর!"

মহম্মদ একটিও কথা বলিল না, সে আমার দিকে একবার চাহিয়া আবার অবনত মস্তকে পাদচারণা করিতে লাগিল। তাহার সুন্দর সুপ্রশস্ত বদনের দিকে চাহিয়া দেখি যে তাহা অবিচল ধীর ও মনোহর। মহম্মদের স্থির প্রকৃতি আমার ভাল লাগিল না। প্রাণে যেন কেবল বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। ভাবিলাম মহম্মদের দৃঢ় ধারণা যে মুন্না তাহাকে ভালবাসে। আর সহ্য হইল না, আমি একটা অছিলা করিয়া মহম্মদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

কিছুদূরে একটা গাছ ছিল। আমি সেই গাছের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম যে মুন্না দাঁড়াইয়া আছে। আমি ভাবিলাম—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী মুন্না এখানে কেন? ভাবিলাম, আর কিছুই নয়— মহম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

আজ অনেক দিন পরে মুন্নাকে দেখিয়া আমার নানা কথা মনে পড়িতে লাগিল। কতবার কতদিন আমি ব্যাকুল অন্তরে তাহাকে মনের কথা জানাইয়াছি, কিন্তু কতবার সে আমাকে নিরাশ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। স্বতঃপ্রণোদিত ভালবাসা লইয়া তাহার নিকট কতবার অনাদৃত হইয়াছি। আমার অন্ধকার-ময় জীবনের ধ্রুবতারা মুন্না আমার হইল না। সে মহম্মদের;—মহম্মদের;—মহম্মদই আমার মিত্ররূপী শত্রু। সে থাকিতে মুন্না আমার হইবে না।

আমি ভাবিলাম একবার বৃক্ষতলে মুন্নার নিকট যাই এবং প্রাণ খুলিয়া আর একবার তাহাকে সমস্ত কথা বলি। হায় আশা! তুমি মানুষকে পাগল করিতে পার। আমি ধীরে ধীরে মুন্নার নিকটে গেলাম। মুন্না কোনও কথা কহিল না। আমি ডাকিলাম—মুন্না।

মুন্না বলিল—"এই অন্ধকারে আমায় কি করিয়া চিনলে ওয়াহেদ্?"

আমি—"মুন্না দিবারাত্র যে আমার অন্তরে বিরাজ করিতেছে, তাহাকে অন্ধকারেও চিনিতে পারা যায়।

বাটীতে গেলাম। পরে বলা বাহুল্য যে মুন্নার সহিত আমার বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়া গেল।

৺নফর চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

দুইটী প্রাণ।

(১)

বালক বালিকা দুটি
ছোট ছোট ফুল ;—
ছোট ছোট দুটি প্রাণ
মিলন অতুল,—
ওগো মিলন অতুল।

(২)

খেলে দুজনাতে মিলি'
কাছাকাছি ব'সে ;
একটীর হাসি পেলে
দুজনাতে হাসে,—
ওগো দুজনাতে হাসে

(৩)

একটী ব্যথিত হলে
দুজনেই কাঁদে ;
এ ওর চোখের জলে
মুছে দেয় হাতে
ওগো মুছে দেয় হাতে।

(৪)

দুজনে বেড়ায় ক'রে
হাত ধরাধরি ;
এ ওর পানেতে চায়
কতছলা করি
ওগো কত ছলাকরি।

(৫)

দুজনেই চা'য়া চা'য়ি,
দুজনেই হাসে ;
প্রাণে প্রাণ ঢেলে দিয়ে
আমোদেতে ভাসে
ওগো আমোদেতে ভাসে।

(৬)

সাগরের তীরে যেয়ে
দেখে কত কি ;
এ-ওরে সুধায় হেসে,
বল ওটা কি
ভাই বল্‌না ওটা কি ?

(৭)

একের কোমল কোলে
অপরে আদরে—
ছোট তার মাথাখানি
রাখে ধীরে ধীরে
ওগো রাখে ধীরে ধীরে।

(৮)

উভয়ে উভয় পানে
মৃদু হেসে চায়,
উভয়েই ল্যাজে পুনঃ
বদন লুকায়
ওগো বদন লুকায়।

(৯)

খেলে বনে ছুটে ছুটে
লুকোচুরি খেলা ;
হেসে টুক্‌ দেয় যেন
কোকিলের গলা
যেন কোকিলের গলা।

জীবন প্রভাতে দোঁহে করে হেন খেলা।

ওগো করে হেন খেলা।

শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—০—

হিমু।

"How oft the sight of means to do ill deeds, Make deeds ill done"—Shakespeare.

প্রথম দৃশ্য—রাজান্তঃপুর।

ফতিমা।

ফতিমা। এত ভেবেও ত কিছু ঠিক করতে পারিলেম না! কি করে ফিরোজকে বাঁচাই! কোথা যাই! কোথা গেলে আমার ফিরোজকে বাঁচাতে পারব? কে আমার ফিরোজকে আশ্রয় দেবে। ইহ-লোকে আমার ত আমার বল্‌বার কেউ নাই। স্ত্রীলোকের আপনার বল্‌বার মধ্যে স্বামী, বাপ ও ভাই। স্বামীত ত্যাগ করেছেন; তিনি ত এ অধিনীকে ফাঁকি দিয়ে জন্মের মত চলে গিয়াছেন? ভাই ত আমার শত্রু; সুতরাং কোথায় যাব? তখন তাঁকে বল্লেম প্রাণনাথ! আদিনের শত্রুতাচরণ কর না। হায়! ফিরোজ আমার কোথা গেল! বাবাকে না দেখতে পেলে আমার মন বড়ই অস্থির হয়। বাবা যখন আমায় 'মা' বলে ডাকে, তখন আমার সকল যাতনা দূর হয়, সকল কষ্ট ভুলে যাই।

(রক্তাক্ত কলেবরে ফিরোজের প্রবেশ)

ফিরো! মা! মা! মলাম; চাচা আমাকে হত্যা করতে আসছে মা! আমায় বাঁচাও মা!

ফতি! বাবা! বাবা! আমার অঞ্চলের নিধি, এস বাবা! (ফিরোজকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া) তোমায় এরূপ ভাবে আহত কে করলে বাবা?

ফি। চাচা মা! মা! পালাও! চাচা এখনি আসবে। আমায় কেটে ফেল্‌বে মা, শীঘ্র পালাও।

বেগে আদিনের প্রবেশ।

আদি। আর পালাতে হবে না, একেবারে যমের বাড়ী পালাও।

ফতিমা। কে? আদিন! ভাই? ভাই, তোমার এই কাজ? তুমি আমার ফিরোজকে হত্যা করবে? তুমি! তুমি! জান, তুমি আমার কে? জান, আমি তোমার কে? সব কি ভুলে গেলে ভাই? ফিরোজকে ক্ষমা কর! ইহসংসারে আর আমার কেউ নাই, একমাত্র ফিরোজকে নিয়ে আছি; আমি রাজ্য চাইনা, সম্পদ চাই না, রাজ প্রাসাদে থাকতে চাই নে, বনবাসিনী হতে চাই! আমার ফিরোজকে হত্যা কর না। আমার অঞ্চলের নিধি বুক চেরা ধন ফিরোজকে মেরো না ভাই! তোমার পায়ে ধরি, ভাই অভাগিনীর অঞ্চলের নিধিকে কেড়ে নিও না।

ফিরো। চাচা! আমায় মেরো না। তোমার পায়ে ধরি চাচা, আমায় মেরো না; আমায় বড় লাগে! আমি যে কখন মার খাই নি! আমায় মার যেন বড় লাগে!

আদি। ফতিমা! তোমার স্বামীর ব্যবহার কি মনে নাই? না, সব ভুলে গেলে? তার প্রতিশোধ নিতে এসেছি!

ফতিমা। ভাই! প্রতিশোধ কি এই দশ বছরের সোনারচাঁদকে হত্যা করে নেবে,—এই কি তোমার ধর্ম্ম?

আদি। আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম আমার নিকটে, তোর উপদেশ দিতে হবে না। ছেড়েদে বল্‌ছি, পা' ছেড়েদে (পদনিক্ষ্ক্রামণ)

ফতিমা। (গণ্ডস্থল দিয়া রক্তপাত) আঃ—

ফিরো। চাচা! করলে কি? মাকে মারলে? না, তুমি আমাকে কাট! মাকে মেরো।না; মাকে মারলে যে আমার বড় দুঃখ হ'য়! আমায় কাট, মার কান্না দেখলে আমার বুক ফেটে যায়! মাগো, তুমি কেঁদ না।

ফাতিমা। বাবা! আয় আমার কোলে আয়! বাবা!

আদি। ফতিমা! এখনও বলছি পা ছেড়ে দে, নতুবা তোকেও হত্যা করবো।

ফতিমা। আগে আমায় হত্যা কর, ভাই! জীবন থাকতে পুত্রের মৃত্যু দেখতে পারব না।

আদি। বটে (ফিরোজকে আঘাত)

ফিরোজ। মাগো! গেলাম! মা! বড় জলছে! ওমা, গেলাম গেলাম ওমা! মা!

ফতিমা। নরাধম! পামর! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা আমার সম্মুখে আমার সন্তানকে হত্যা করবি? দুরাচার! নরকের কীট! (সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন)

আদি। আজ আমার হাতে ফিরোজের মৃত্যু। ফিরোজের মরণ অনিবার্য্য! (সজোরে ফতিমাকে দূরে ফেলিয়া দিয়া ফিরোজকে আহত করণ)

ফি। মা! মা! ম-লে-ম।

(ফতিমা রক্তাক্তকলেবরে বাবা বাবা)

ফিরো। মা পালাও! তুমি বাঁচ!! তুমি মর না, আমার আর কেউ নেই মা! আমি মরি মা। তুমি পালাও। (আদিন কর্তৃক পুনর্ব্বার আঘাত প্রাপ্ত) মা, মা,। (মৃত্যু)

ফতিমা। নরাধম! পিশাচ! (আদিনকে পদাঘাত)

(আদিনের নিষ্ক্রান্ত)

বাবা! বাবা! চলে গেলি? বাবা চলে গেলি বাবা! ফাঁকি দিলি! বাবা পালালি! বাবা মেরে গেলি। মূর্চ্ছা ও মৃত্যু।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বি-এ।

—•—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

স্বাস্থ্য-সমাচার।—একখানি মাসিক পত্র, প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র বসু এম. বি সম্পাদিত। আমাদের দেশে এইরূপ একখানি মাসিক পত্রের অভাব ছিল, কার্ত্তিক বাবুর দ্বারা এতদিন পরে সে আভাব মোচন হইল। স্বাস্থ্য সমাচারের ভার উপযুক্ত হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। সকল প্রবন্ধ সারগর্ভ এবং সাধারণের বিশেষ উপযোগী অনেক কৃত বিদ্য ডাক্তারগণ হইতে লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন বিগত বৈশাখ মাস হইতে ইহা নিয়মিত রূপে প্রকাশ হইতেছে। সকলে ইহার গ্রাহক হইতে পারবেন বলিয়া বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা ধার্য্য হইয়াছে। আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি।

বিজ্ঞান।—একখানি নব প্রকাশিত মাসিক পত্র, আমরা ইহার প্রথম বর্ষের কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা ইহা পাঠে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অনেক বিদ্য লেখকগণ হইতে লিখিয়া থাকেন, ইহার অনেক প্রবন্ধ সারগর্ভ এবং ইহাতে অনেক আবশ্যকীয় বিষের অবতারণা করা হইয়াছে। এরূপ পত্রিকার আদর একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ব্রহ্মবাদী। একখানি মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম এ, বি, এল এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম এ বি, এল মহোদয় সম্পাদিত। আমরা ইহার দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যা মাত্র পাইয়াছি; ইহার অনেক প্রবন্ধই প্রথম সংখ্যায় আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ চলিতেছে। অতএব সেই সকল প্রবন্ধের সমালোচনা করা দুঃসাধ্য। তবে দ্বিতীয় সংখ্যায় যে কয়েকটী প্রবন্ধ আরব্ধ হইয়াছে, তাহা অতি উপাদেয়, শ্রীযুক্ত

লখটী অতি পরিপাটী হইয়াছে। সুযোগ্য মহোদয় দ্বয় ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আশা করা যায়, ইহা চরস্থায়ী হইয়া বাঙ্গলা ভাষায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি উপাদেয় মাসিক পত্র হইবে।

অর্থনীতি। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার বি এ, এফ, আর এ, এস প্রণীত বাঙ্গালায় ভাষায় একখানি অভিনব গ্রন্থ। যোগীন্দ্রবাবু সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত, আজ কয়েক বৎসর তিনি মাতৃভাষার সেবায় ব্রতী হইয়াছেন। যাবতীয় সাময়িক পত্রে নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল প্রবন্ধ পাঠে তাঁহার গভীর গবেষণা ও ভাষাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য ঐকান্তিক অনুরাগের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই অর্থনীতি তাহার দৃঢ় অধ্যবসায়ের ফল। ইহার কিয়দংশ কয়েক খানি মাসিক পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণেপুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় অর্থনীতি সম্বন্ধে তাদৃশ ভাল গ্রন্থ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যোগীন্দ্র বাবু সেই অভাব দূর করিয়া নিশ্চই বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ইহাতে অর্থের উৎপত্তি ও বণ্টন বিষয় বেশ সরল ও সহজ ভাষায় বিবৃত করা হইয়াছে। এরূপ অবশ্যকীয় পুস্তকের আদর একান্ত বাঞ্ছনীয়। মূল্য ১০ আনা, হাওড়া পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয়—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর নিকট পাওয়া যায়।

নিবেদন

আলোচনা মাসিক পত্রের ষোড়শ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। ইহার ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী মাসিক পত্রিকা বাঙ্গালাদেশে খুব কমই আছে সাহিত্যানুরাগী সাধু চরিত্র গ্রাহকগণের কৃপার উপরই পত্রিকার স্থায়ীত্ব নির্ভর করিতেছে এবারকার উপহার সুবৃহৎ কীর্ত্তিবাসী বিশুদ্ধ সংস্করণ রামায়ণ, সচিত্র সুন্দর বাধাই। বার্ষিক মূল্য ১।৹ টাকা, উপহার পাঠাইবার মাশুল ॥৹ আনা। যাহারা উপহার লইবেন না, তাহাদের পক্ষে ১।৹ টাকা। এক্ষণে আমাদের গ্রাহকবর্গের নিকট সানুনয় প্রার্থনা—তাঁহারা যেন সত্বর তাহাদের বার্ষিক সাহার্য্য পাঠাইয়া দিয়া আমাদের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেন। আমরা সকলেরই নিকট নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইতেছি কিন্তু যাহারা উপহার লইবেন বা না লইবেন তাঁহারা আমাদের জানাইলে নিতান্ত বাধিত হইব, কারণ ভিঃ পিঃ দ্বারা সেই সুবৃহৎ পুস্তক পাঠাতে খরচ বেশী হয় এবং ফেরৎ হইলে সেই সুন্দর পুস্তক খানি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, আমরা, তাহাতে বড়ই ক্ষতিগ্রস্থ হই। এক্ষণে গ্রাহকগণের নিকট করপুটে নিবেদন, তাহারা যেন সত্বর আমাদিগকে পত্রিকা লইবার সম্বন্ধে জ্ঞাত করেন। নতুবা আমরা ক্রমশঃ নূতন পুরাতন সকল গ্রাহকের নিকটই কেবল মাত্র পত্রিকার মূল্য ১।৹ টাকা ও ভিঃ পিঃ কমিশন এক আনা, মোট ১।৵৹ চার্জ্জ করিয়া পাঠাইব। যাঁহাদিগকে আমরা নমুনা দিয়াছি, তাঁহাদের নিকট হইতে পত্র না পাইলেও ভিঃ পিতে ১।৵৹ চার্জ্জ করিয়া পত্রিকা পাঠাইব। তৎপর উপহার আবশ্যক হইলে ॥৹ আনায় রামায়ণ ভিঃ পিতে প্রেরিত হইবে। আলোচনার আয়ে একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। ইহার গ্রাহক হইলে এবং সাহায্য করিলে ধর্ম্ম লাভ ও অর্থ ব্যয় সার্থক হইবে। এই জন্য স্বধর্ম্মানুরাগী গ্রাহকবর্গের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যেন, তাঁহারা ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া ঐ দুস্থ ব্রাহ্মণ-পরিবারের অন্নসংস্থানে হন্তারক না হয়েন।

ত্রুটী স্বীকার। আলোচনার অকপট বন্ধু, সাহিত্যানুরাগী শ্রীনফর চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে এবার আলোচনা প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইল। গ্রাহকগণ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। ম্যানেজার।

মুন্না বলিল—"তুমি এখানে কেন ?"

আমি—"আগে বল, তুমি এখানে কেন ?"

মুন্না—"আমি মহম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছি।"

আমি—"আমিও তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

মুন্না—"কখনই নয়; আমি যে আজ মহম্মদের সঙ্গে দেখা করিব, তাহা তোমার জানা ছিল না।"

আমি বলিলাম—"হাঁ মুন্না, বাস্তবিক আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসি নাই। আমি মহম্মদের সঙ্গে বেড়াইতেছিলাম, সহসা তাহার মুখে তোমার কথা শুনিয়া আমার—

মুন্না আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"মহম্মদের মুখে আমার সম্বন্ধে কি কথা শুনিলে ওয়াহেদ্ ?"

আমার মস্তকে যেন শত বজ্রাঘাত হইল। ভাবিলাম,—এত ভালবাসা! মহম্মদের মুখে নিজের কথা শুনিবার জন্য এত আগ্রহ! আমি নিরাশ হইলাম। ধন্য মহম্মদ, ধন্য তুমি —আমায় শিখাইয়া দাও, কি গুণে তুমি মুন্নাকে বাঁধিলে! মুন্না আবার বলিল—"বল, বল মহম্মদ কি বলিল ?

আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না—প্রাণে বড়ই বেদনা পাইলাম। বলিলাম—"একটী কথা,—কেবল মাত্র একটি কথা—সত্য বল তুমি আমাকে ভালবাস কিনা"—তাহার সহিত আমার আর কোনও কথা হয় নাই।"

মুন্না—তুমি কি বলিলে ?

আমি—পরিহাস রাখ মুন্না, আমার হৃদয়ের জ্বালা তুমি কি বুঝিতে পার নাই ?

মুন্না একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—"জানি ওয়াহেদ্, তুমি আমায় ভালবাস, কিন্তু কি করিব, তোমায় আমি বিবাহ করিতে পারিব না। তুমি দরিদ্র,—আমি যদিও ঐশ্বর্য্যশালিনী নহি, তবু আমি দরিদ্রকে বিবাহ করিব না—কারণ আমি পিতৃ মাতৃহীন, তোমার মত দরিদ্রকে বিবাহ করিলে লোকে আমায় নিন্দা করিবে। তুমি ঘরে যাও ওয়াহেদ্, ঐ দেখ,—ভয়ানক মেঘ করিয়াছে, এখনি বৃষ্টি নামিবে।"

সহসা স্ফুরৎ বিদ্যুদ্দামচকিত, অবৃষ্টি-সংরম্ভ মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং পদ্মা গর্ভ হইতে সৈকতাভিমুখে তাড়িত একটা প্রবল বায়ু আমার গায়ে লাগিল। হতাশ্বাস, অনাদৃত প্রেমিক আমি অৰ্দ্ধমূৰ্চ্ছিতভাবে বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে চাহিয়া দেখি—মুন্না চলিয়া গিয়াছে। আকাশের দিকে চাহিলাম—দেখিলাম, যে ঘন ঘন ক্ষণ-প্রভা হাসিতেছে, বিজলীর সে হাসি আমায় ভাল লাগিল না, বোধ হইতে লাগিল সেযেন আমায় উপহাস করিতেছে। বালুকাময় প্রান্তরের দিকে চাহিলাম,—দেখিলাম, অভেদ্য অন্ধকার! উত্তাল তরঙ্গভঙ্গালোড়িত পদ্মার দিকে চাহিলাম, যেন আমার হৃদয়ের ছবি তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

কি জানি কি মনে হইল, নিজের দারিদ্র্যকে ধিক্কার দিতে দিতে পদ্মার তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। যতবার পদ্মা-গর্জ্জন ও আকাশ গর্জ্জনের মিশ্রণ হইতে লাগিল, ততবার আমার মনে হইতে লাগিল যে "আর কেন

সকল আশা ভরসা তো আজ ফুরাইল, এই প্রকৃতি বিপ্লবে পদ্মাগর্ভে আমার জীবন নাটকের অভিনয় শেষ করি।"

এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখি যে একখানি নৌকায় একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীমূর্ত্তি উঠিল। এই দুর্যোগে সর্ব্বগ্রাসিনী পদ্মার গর্ভে কাহারা নৌকা ভাসাইতেছে? কি সাহস!

নৌকায় লণ্ঠনের আলোক জ্বলিতেছিল। সেই অস্পষ্টালোকে পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিলাম মহম্মদ ও মুন্না। মুন্নার বাটী পদ্মার ওপারে, বোধ হয় মুন্না মহম্মদকে তাহার বাটিতে লইয়া যাইতেছে। উভয়ে নৌকা খুলিয়া দিল, এদিকেও ভয়ানক ঝড় উঠিল।

আমি তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। নৌকা তখনও অধিকদূর যায় নাই, সহসা একটা ঝটিকা বাতাসে নৌকাখানি জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইল। আমি ভাবিলাম—"খোদা মুন্নাকে রক্ষা কর, আমি সব সহ্য করিতে পারি কিন্তু মুন্না যে ডুবিয়া মরিবে, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না; ইনশাল্লা তালা—আমি পদ্মাগর্ভে ঝাঁপ দিলাম।

মুন্না কিম্বা মহম্মদ আমায় দেখিতে পাইয়াছিল কিনা জানি না, আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সে ভীষণ তরঙ্গে গা ভাসান দিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বহু কষ্টে অনেক আশায় আমি প্রায় নৌকার নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, এমন সময় নৌকা উল্টাইয়া গেল, মুন্নার নিরাশ চীৎকার আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি অন্ধকারে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ পদ্মাগর্ভে কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। কিছুক্ষণপরে আমি একখানি ওড়নার অগ্রভাগ ধরিলাম, ওড়ান আমার হাতে উঠিয়া আসিল। আমি আর একটু অগ্রসর হইতেই মুন্নার সুদীর্ঘ বেণী পাইলাম। সংজ্ঞাহীনা মুন্নাকে লইয়া বহুকষ্টে আমি তীরে উঠিলাম।

মুন্নাকে আমার গৃহে লইয়া গিয়া অনেক শুশ্রূষা করিবার পর তাহার চৈতন্য হইল। দুই দিন পরে মুন্নাকে তাহার বাটীতে রাখিয়া আসিলাম। সে আমায় ভাল বাসুক বা প্রত্যাখ্যান করুক, সে বাঁচিয়া থাকিলেই আমার অনেক শান্তি।

মহম্মদ মরে নাই। কয়েকদিন পরে তাহাকে আবার মুন্নার বাটীতে গতায়াত করিতে দেখিলাম। মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। হায়! কেন আমি দরিদ্র হইলাম, আজ ঐশ্বর্য্য থাকিলে বোধ হয়, মুন্না আমায় প্রত্যাখ্যান করিত না।

একদিন মুন্নার বাটী হইতে ফিরিতেছি, এমন সময় পথিমধ্যে কে আমার মাথায় লাঠির আঘাত করিল, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলাম। মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখি যে আমি এক অপরিচিত স্থানে একটী ভগ্ন অট্টালিকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ। আমি কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ পরে একজন বাবুর্চ্চি আমায় খাবার দিয়া গেল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ময়া কাহা আয়েছ"। বাবুর্চ্চি বলিল—"মাফ্ কিজিয়ে হুজুর! বোলনে কা হুকুম নেহি"।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। এই অন-

শূন্য স্থানে আমি কোনপ্রকারে কালযাপন করিতে লাগিলাম। একে একে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত কাটিল—বসন্ত আসিল। আমার কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। সন্ধ্যার পর যখন বাতায়ন পথে মলয়ানিল আমার গায়ে লাগিত, তখনই অতীত স্মৃতি আমায় আকুল করিয়া ফেলিত। শতবার সুখ কল্পনা করিয়া মুন্নার নিকট গিয়াছি—শতবার সে আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে কিন্তু তবু তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা গেল না।

একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি আমার প্রকোষ্ঠ উন্মুক্ত। বুঝিতে পারিলাম না কে চাবী খুলিয়া দিয়াছে। ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম, দেখিলাম যে মহম্মদ আসিতেছে। আমি মহম্মদকে দেখিয়া বলিলাম, কি ভাই তুমি যে এখানে? মহম্মদ বলিল—"আমি কোনরূপে শুনিলাম যে তুমি এখানে বন্দী, তাই তোমার উদ্ধার করিবার সুযোগ খুঁজিতে এইদিকে আসিতেছিলাম। তুমি মুক্ত হইলে কিরূপে?

আমি—অদ্য আমার গৃহের দ্বার কে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল তাহা জানি না, দ্বারে চাবী ছিল না বলিয়াই আমি বাহিরে আসিতে পারিয়াছি। ভাই, একটা কথা বলিব—অনেক দিন হইল মুন্নার কোনও সংবাদ পাই নাই। যদি তাহার কোনও সংবাদ রাখিয়া থাক তো আমায় বল।

মহম্মদ - সেকি কথা! মুন্না যে আজ ছয়মাস হইল মরিয়া গিয়াছে। আমি বসিয়া পড়িলাম। পৃথিবী যেন ঘুরিতে লাগিল। আমি কিছুক্ষণপরে মহম্মদকে বলিলাম—"ভাই তুমি ঘরে যাও, আর আমি গৃহের দিকে ফিরিব না। একবার আমাদের ক্রীড়াভূমি পদ্মাসৈকতে যাইব, তারপর পদ্মাগর্ভে আমার স্মৃতি চিরকালের মত লোপ পাইবে। গভীর রাত্রি সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ। কেবল পদ্মার তরঙ্গসংঘাতের শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। আমি আজ সেই পদ্মাসৈকতে, যেখানে মুন্না আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। কত কথা আজ স্মৃতিপথে উদয় হইল। সেই অন্ধকারময় আকাশ—পদ্মার ভৈরবী-মূর্ত্তি, পদ্মাগর্ভ হইতে মুন্নার উদ্ধার—আজ সমস্ত কথা মনে পড়িল। প্রাণ উদাস হইয়া গিয়াছে। কলনাদিনী পদ্মা আজ সর্ব্বাঙ্গে কৌমুদী মাখিয়া নাচিতেছে; বিশাল মরুময় প্রান্তর আজ রজতশুভ্র চন্দ্র-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে। হায়! যখন মুন্না বাঁচিয়া ছিল, তখন তো চাঁদ তুমি এত হাস নাই। তখন তোমার এই হাসি লুকান ছিল। আজ আর হাসি ধরে না। জগতে যেদিকে চাহি সেইদিকেই আনন্দ দেখিতে পাই, কেবল আমারই অন্তর মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক এবং ভয়ঙ্কর। মুন্না--মুন্না তুমি স্বর্গে। তোমার আগমনে সে স্থান যেন আরও পুণ্যময়, কিন্তু মুন্না আমি এই মরুভূমির মত পৃথিবীতে কি করিয়া থাকিব!

কিছুদূরে একটী কবর দেখিতে পাইলাম। এই জনশূন্য প্রান্তরে এ কাহার কবর। তবে কি মুন্নাকে এইখানে কবর দেওয়া হইয়াছে? স্মৃতি-স্তম্ভের নিকটে যাইতে প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইল। উন্মত্তের মত স্মৃতি-স্তম্ভের নিকটে যাইলাম। সেখানে যাহা দেখিলাম তাহাতে প্রাণ বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠিল। একি! এখানে আমার কবর কে নির্ম্মাণ করাইল? তখন

জ্যোৎস্নালোকে স্মৃতি-স্তম্ভ-খোদিত অক্ষরাবলীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল, দেখিলাম তাহা এই :— "স্মৃতিস্তম্ভ, সেখ ওয়াহেদ আলির কবর। তাহার বন্ধু শ্রীমহম্মদ আলি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।" আমি আশ্চর্য্য হইলাম। এ কি ব্যাপার! আমি যে জীবিত। সেখানে বসিয়া কত ভাবিতে লাগিলাম, কিছুতেই ঠিক করিতে পারিলাম না। শোকসন্তপ্তচিত্ত ও পরিশ্রান্ত ছিলাম, সেই বালুকাময় প্রান্তরে শুইয়া পড়িলাম! তন্দ্রাবস্থিতভাবে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম — "আমি যেন মরিয়া গিয়াছি—বাস্তবিক আমার বন্ধু মহম্মদ আমার কবর নির্ম্মাণ করাইল। সে দিন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। সমস্ত জগত হাসিতেছে। অর্দ্ধনিদ্রিতভাবে মলয়ানিল—বাহিত নদীর পরপার্শ্বস্থ নৈশ বীণাধ্বনির ন্যায় একটি গান শুনিতে পাইলামঃ—

"বঁধুয়া না মিটিল পিয়াসা হামারি"

ক্রমে সে ধ্বনি আরও কাছে শুনিতে পাইলাম। আবার কিছুক্ষণ পরে বোধ হইল যেন, সে শব্দ কবে কাহার কণ্ঠ হইতে শুনিয়াছি। চিনিতে পারিলাম—স্পষ্টই বোধ হইল যেন মুন্নাই গাহিতে গাহিতে আমার কবরের নিকট আসিল, পরে সে নানা সুরভিপুষ্প দিয়া আমার কবর সাজাইল। তাহার পরে, সে বীণা হস্তে লইয়া আমারই কবরে দাঁড়াইয়া আমার মৃত্যুতে কাতর হইয়া গাহিতে লাগিল "বঁধুয়া না মিটিল পিয়াসা হামারি" একি! আমি কি স্বর্গে! মুন্না কি আমায় ভাল বাসিত! মুন্না—প্রিয়তমে! এতদিন তবে মনের ভাব গোপন রাখিয়াছিলে কেন? সহসা পুষ্প-সৌরভে দিক আমোদিত হইয়া উঠিল; সম্মুখে চাহিয়া দেখি সত্যই আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মুন্না দাঁড়াইয়া গাহিতেছে—"বঁধুয়া না মিটিল পিয়াসা হামারি" আমি প্রবুদ্ধ হইয়া উন্মত্তের মত মুন্নার নিকট গিয়া বলিলাম "মুন্না মুন্না একি ব্যাপার?" সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে কে বলিল "তোমার প্রেমের পুরস্কার" পশ্চাতে চাহিয়া দেখি—মহম্মদ! মহম্মদ বলিল—"ওয়াহেদ, আমিই তোমার শত্রু। আমিই তোমার মাথায় লাঠীর আঘাত করিয়াছিলাম ও বন্দী করিয়াছিলাম। আমিই তোমাকে মুক্ত করিয়া দিই এবং আমিই তোমাকে মুন্নার মৃত্যু সংবাদ দিই। বাস্তবিক মুন্না মরে নাই। সে মনে মনে তোমায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তোমায় পরীক্ষা করিবার জন্য মুন্না আমার প্রতি ভালবাসার ভাণ দেখাইত। আমি মূর্খ না বুঝিয়া মুন্নার কপট প্রেমে মুগ্ধ হইলাম। তোমার উপর হিংসা পরায়ণ হইয়া তোমার অনিষ্টসাধনে কৃতসংকল্প হই। মুন্নাকে তোমার অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত করি। মুন্নাকে তোমার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করাই এবং তোমার মিথ্যা কবর তাহাকে দেখাই; ফলে মুন্না উন্মাদিনী হইল আমার মনে বড় অনুতাপ আসিল—সেইজন্য তোমায় মুক্ত করিয়া মুন্নার সহিত মিলিত করিবার উপায় করি। ক্ষমা কর ভাই, আমায় ক্ষমা কর। নাও তোমার হৃদয়ের বস্তু তুমিই নাও। বল মুন্না, আমায় ক্ষমা করিলে? মুন্না—"ক্ষমা করিলাম।" মহম্মদ আর দাঁড়াইল না। আজ পর্য্যন্ত তাহার কোনও সন্ধান করিতে পারিলাম না। আমি মুন্নার সহিত তাহার

শ্রীবৃন্দাবন ধাম।

আলোচনা, শ্রাবণ ৪র্থ সংখ্যা, ১৬শ বর্ষ, ১৩১৯।

সাবিত্রী চরিত।

সাবিত্রী মদ্রদেশাধিপতি ধর্ম্মাত্মা রাজা অশ্বপতির একমাত্র নন্দিনী এবং শাল্বরাজ মহাত্মা দ্যুমৎসেনের সর্ব্বগুণাধার পুত্র সত্যবানের সহধর্ম্মিণী, অশ্বপতি নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি পুত্র লাভ মানসে বহু দেব দেবীর উপাসনা করিয়া অবশেষে বৈদিক সাবিত্রী দেবীর আরাধনা করিয়া তাঁহার বরে এক মাত্র তেজস্বিনী কন্যারত্ন লাভ করেন। দেবী সাবিত্রীর বর প্রভাবে লব্ধ বলিয়া রাজকন্যার নাম সাবিত্রী রাখা হইল।

সাবিত্রী মহা তেজস্বিনী। তাঁহার রূপ অপরিসীম, জ্ঞান অনন্ত, ধর্ম্মভাব অতুলনীয় এবং প্রতিভা জগজ্জয়ী। তাই প্রদীপ্ত ভাস্কর সদৃশ মহা তেজস্বিনী সাবিত্রীকে কেহই সাহস করিয়া বিবাহ করিতে আসিলেন না। সাবিত্রীর পিতা মাতা বড়ই চিন্তিত হইলেন। একদিন পিতা কন্যাকে ডাকিয়া দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক তাঁহার যোগ্য বর মনোনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

পিতৃ আজ্ঞায় সাবিত্রী বৃদ্ধ সচীববৃন্দ, অসংখ্য রক্ষক অনুচরগণ এবং শত সহচরী সহ দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। তিনি বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে মুনিদিগের পবিত্র তপোবনে রাজ্যভ্রষ্ট রাজা দ্যুমৎসেনের পর্ণকুটীর ভবনে উপনীত হইলেন।

সত্যবান ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন পরে রাজা দ্যুমৎসেন অন্ধ হইয়াছিলেন। রাজা অন্ধ, রাজপুত্র শিশু, শত্রুগণ অনায়াসেই তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল। দৃষ্টিশক্তিহীন বৃদ্ধ নরপতি স্ত্রীপুত্র সহ মুনিদিগের তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাজশ্রী ভ্রষ্ট দ্যুমৎসেন পথের কাঙ্গাল হইলেন। রাজা দ্যুমৎসেনের সেই শিশু

পুত্রের নাম সত্যবান। সত্যবান এখন রূপ-গুণসম্পন্ন মহা তেজস্বী তরুণ যুবক।

সাবিত্রী তপঃপ্রভাব সম্পন্ন প্রদীপ্ত তেজ বিশিষ্ট পরম সুন্দর যুবক সত্যবানকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন! অবশেষে আপনার অমল ধবল সুকোমল আত্মাটীকে—দেবচরণে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলী প্রদানের ন্যায় তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিয়া পিতৃভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। বিজনে নীরবে সাবিত্রীর মানস-বিবাহ হইয়া গেল।

রাজা অশ্বপতি দেবর্ষি নারদের সহিত সদালাপে মগ্ন। এমন সময় সাবিত্রী তথায় উপনীত হইয়া উভয়ের চরণ বন্দনা করিয়া পিতৃ চরণে আপনার ভ্রমণ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সাবিত্রী একজন রাজ-সম্পদ-বিহীন বনবাসী অন্ধরাজার পুত্রকে স্বামী মনোনীত করিয়াছেন শুনিয়া রাজা অশ্বপতি দুঃখিত হইলেন। নারদ বলিলেন—রূপে-গুণে, কুলে-শীলে, বলবীর্য্যে ও ধর্ম্মজ্ঞানে সত্যবান সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় এবং সর্ব্বপ্রকারেই সাবিত্রীর যোগ্য পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সত্যবান অল্পায়ু, এই অল্পায়ুতাই তাহার অশেষ দোষের আকর হইয়াছে। অদ্য হইতে যে দিন বৎসর পূর্ণ হইবে, সেই দিন সত্যবানের মৃত্যু নিশ্চিত।

অশ্বপতি স্বীয় দুহিতার অকাল বৈধব্যভয়ে ভীত হইয়া কন্যাকে অল্পায়ু সত্যবানের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য বর মনোনীত করিবার জন্য আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিলেন।

সাবিত্রী বলিলেন-'পিতঃ! বৃক্ষের ফল একবারেই ভূপতিত হয় এবং সম্প্রদান-বাক্য একবার মাত্রই উচ্চারিত হয়। মানুষ কোনও বিষয় প্রথমতঃ মনে মনে চিন্তা, পরে বাক্য দ্বারা ব্যক্ত ও কর্ম্মে তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। আমি মনে মনে সত্যবানকে স্বামিত্বে বরণ করায় তাঁহার সহিতই আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তিনিই আমার পতি। তিনি অল্পায়ু কি দীর্ঘায়ু, গুণবান কি নির্গুণ, ধনি কি নির্ধন, পণ্ডিত কি মূর্খ, সুশীল কি দুঃশীল, সাধু কি তস্কর সে বিচার করিবার এখন আর আমার অধিকার নাই। ধর্ম্মতঃ সত্যবানই আমার স্বামী। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে কেমন করিয়া বরণ করা যাইতে পারে? কোন সতী-স্ত্রী অল্পায়ু বলিয়া আপনার স্বামী ত্যাগ করিয়া পুরুষান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন? একদিন সকলকেই মৃত্যুর গ্রাসে গড়াইয়া পড়িতে হইবে, বিশেষতঃ মৃত্যুর অবধারিত কাল নাই। অন্য পুরুষকে বরণ করিলে তিনি যে বিবাহ রাত্রেই মরণের কোলে ঢলিয়া না পড়িবেন, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বৈধব্য যন্ত্রণা ভয়ে আমি কখন অন্য পুরুষকে বরণ করিয়া অধর্ম্মের পসরা মাথায় লইতে পারিব না। আপনারা আমাকে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্যে অনুরোধ ও উপদেশ প্রদান না করিয়া এ বিবাহেই অনুমোদন করিয়া সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।"

সাবিত্রীকে যারপর নাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও ধর্ম্মশীলা জানিয়া এবং দেবর্ষি নারদের উপদেশে অগত্যা রাজা অশ্বপতি সত্যবানের করেই কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইলেন।

যথাসময়ে নৃপতি দুহিতাসহ তপোবনে রাজ্য-ভ্রষ্ট দ্যুমৎসেনের পর্ণকুটীর ভবনে উপনীত হইয়া

সত্যবানের করে সাবিত্রীকে অর্পণ করিলেন।

রাজনন্দিনী সাবিত্রী পিতৃদত্ত মণি মাণিক্য খচিত বহুমূল্য রত্নাভরণ পরিত্যাগ করিয়া তপস্বিনীর ন্যায় দীনবেশে তপোবনে স্বামী ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজপ্রাসাদ-লালিতা, রাজভোগ-পালিতা রাজ-দুহিতা এখন কাঙ্গালের বণিতা। রাজ-ঐশ্বর্য্যের, ভোগ-বিলাসের অনন্ত উপকরণ দাস-দাসী কি প্রিয় সখীগণ কিছুই তিনি সঙ্গে রাখিলেন না। তীর্থ স্নানার্থিনী তপস্বিনীর দেব-সেবা মানসে দেবালয়ে অবস্থানের ন্যায় তিনি পরমারাধ্য স্বামী-দেবতার পূজা করিবার জন্য ভক্তিপ্লুত অন্তরে স্বামীর পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। আজীবন ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিতা পালিতা রাজদুহিতা সাবিত্রী রাজ্যভ্রষ্ট, বনবাস-ক্লিষ্ট কুটীরবাসী কাঙ্গালের বণিতা হইয়াও কিছুমাত্র দুঃখিতা হইলেন না। বরং তিনি তপস্বিনীর দীনবেশ ধারণ করিয়াই অন্তরে পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। বল্কল বসনে ও কুসুম ভূষণে ভূষিতা তাপসীর বেশে সজ্জিতা সাবিত্রীকে বনদেবীর ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল।

নব বধুর সেবা পরিচর্য্যা ও প্রাণ প্রীতিকর উদার ব্যবহারে সাবিত্রীর শ্বশুর, শাশুড়ী ও ও স্বামী বনবাস ক্লেশ ভুলিয়া গেলেন। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে রাজলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা হইল।

এক বৎসর পূর্ণ হইতে আর অধিক দিন বিলম্ব নাই। চারিদিন গত হইলেই সত্যবানের জীবলীলা শেষ হইবে—সাবিত্রীর সব ফুরাইবে। সাবিত্রী কঠোর ত্রিরাত্র উপবাস ব্রত গ্রহণ করিলেন। তিন দিন গত হইল। সাবিত্রীর ব্রতকাল পূর্ণ হইল। চতুর্থ দিবে তিনি হোম-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহাতে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন। ব্রত সম্পন্ন হইল। শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজন এবং তপোবনবাসী ঋষি ও ঋষিপত্নীগণ সকলের চরণে প্রণাম করিয়া সাবিত্রী তাঁহাদের শুভ "জন্মায়তী হউক, আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। অভীষ্ট আশীর্ব্বাদ লাভে তাঁহার চিত্ত অধিকতর দৃঢ় হইল।

আরব্ধ ব্রত সম্পন্ন হইল। কিন্তু তথাপি সাবিত্রী আহার করিলেন না। সূর্য্যাস্তের পর আহার করিবেন বলিয়া শ্বশুর শাশুড়ীর বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

দিবা অবসান প্রায়। এমন সময় সত্যবান জনকজননীর যজ্ঞীয় কাষ্ঠ ও ফল মূল আহরণ মানসে কুঠার হস্তে আশ্রমের অদূরবর্ত্তী গহন বনে গমনোদ্যত হইলেন। ভর্ত্তার এ সাময়িক বনগমন সঙ্কল্প দেখিয়া সাবিত্রী প্রমাদ গণিলেন। মহর্ষি নারদের বিষম ভবিষ্যৎবাণী স্মরণ করিয়া স্বামীর ভাবি অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি স্বামী সহ বনগমনে প্রস্তুত হইলেন।

সাবিত্রীর শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামী প্রভৃতি গুরুজনেরা তিন দিন নিরম্বু উপবাস ক্লিষ্ট-শীর্ণ-কায়া স্বর্ণলতিকা সাবিত্রীকে বনে গমন করিতে প্রথমতঃ নিষেধ করিলেন। অতঃপর তিনি বিনয় মধুর বচনে সকলের অনুমতি লইয়া পতি-সহ বন যাত্রা করিলেন। এবং আপনার প্রাণের গভীর যন্ত্রণা প্রাণে চাপিয়া রাখিয়া মুখে মধুর হাসি হাসিয়া সাবিত্রী বনশোভা দর্শন করিতে করিতে স্বামীর অনুগমন করিতে লাগিলেন।

ফল-মূল ও কাষ্ঠ আহরণ করিতে করিতে

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। অনন্তর একটা শুষ্ক বৃক্ষশাখা ছেদন করিতে করিতে সহসা সত্যবান দুঃসহ শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া অবসন্নদেহে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা সাবিত্রীর উরু-উপাধানে মস্তক রাখিয়া অঞ্চল-শয্যায় শায়িত হইলেন। সাবিত্রী আপনার সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত দেখিয়া নিদারুণ যাতনায় অন্তরে যারপর নাই ক্লিষ্ট থাকিয়া ও প্রাণাধিক প্রিয়তম মুমূর্ষু স্বামীর প্রাণে ভীতি বা অস্থিরতার সঞ্চার ভয়ে, সকল দুঃখ নীরবে সহিয়া লইয়া স্বামীর শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় রহিলেন!

ভীষণ পীড়ায় ক্রমশঃ সত্যবানের চরম-কাল উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে সাবিত্রীর শেষ আশাটুকু ফুরাইল। তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব সত্যবান মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন। হায়! বিজন বনে শেল-বিদ্ধ-বিহঙ্গিনীর ন্যায় সাবিত্রী প্রাণের জ্বালায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবর্ষি নারদের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইল।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

সৎ-শাশুড়ী।

(গল্প)

বৈশাখ মাস। রৌদ্র যেন আগুন আজ দুপর বেলা নিশিকান্ত একখানি পাল্কীতে চড়িয়া শ্বশুর-বাড়ী যাইবে। নূতন বি, এল. পাস করিয়াছে। বয়স হইয়াছে তেত্রিশ বৎসর। যেমন রূপ-ভরা যৌবন, গুণও তেমনি। এ হেন সুখের সময় একবার শ্বশুরবাড়ী না গেলে কি প্রাণ বাঁচে!

লতিকা কাপড় কুঁচাইয়া, চাদর কুঁচাইয়া, একটী বাসিকরা সার্ট বাহির করিয়া গুচাইতেছে। এসেন্স দুই এক বিন্দু দিতেছে, এমন সময় নিশিকান্ত স্নান করিয়া আসিল। আসিয়া কাপড় পরিবার জন্য ঘরে ঢুকিতেই দেখিল, বৌদিদি সব ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে। বৌদিদিরও বোধ হয় বড়ই ইচ্ছা যে আজ নিশিকান্ত শ্বশুরবাড়ী যায়। নিশিকান্ত বৌদিদির মনোভাব পরীক্ষা করিবার জন্য বলিল— "বৌদি" আজ যে রকম রোদ্, আজ আর শ্বশুর বাড়ী যেতে ইচ্ছা হয় না।" লতিকা লজ্জাবতী-লতার ন্যায় সঙ্কুচিতভাবে মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "সে কি ঠাকুর-পো! আমি এতক্ষণ সব গুছাইয়া রাখ্‌লাম যাইবে বলিয়া। রোদ আবার কোথা? পাল্কীতে যাবে, যেতে যেতেই রোদ্ প'ড়ে যাবে। চাঁপাকে খবর দেওয়া হ'য়েছে; আজ না গেলে সে মরমে ম'রে যাবে, আমার মাথা খাও ঠাকুর পো, আজই তোমার যেতে হবে।"

বৌদিদির মনোভাবটা নিশিকান্তের রীতিমতই হৃদয়ঙ্গম হইল। নিশিকান্ত আহার করিতে বসিল। বেশ স্ফুর্ত্তিযুক্তমন। যা খাইল তাই ভাল লাগিল। কিন্তু মন প'ড়ে আছে মহেশপুরে, তাই বেশী খাইতে পারিল না। আহার শেষ হইয়াছে, আঁচাইতেছে, এমন সময় নটোর-মা আসিয়া হাজির।

"কি গো নটোর মা, খবর কি?"

—"আমার যাওয়া হ'লোনি বাবু। আমার ছেলে আজ এর মধ্যে চার বার নাবিয়েছে।"

"মহামুস্কিল! চাঁপা খবর পাইল না।' তা আর কি হবে! যা তুই এই জলখাবার নিয়ে যা।' এই বলিয়া নিশিকান্তের বৌদিদি নটোর মাকে বিদায় দিল। নিশিকান্ত সমস্ত শুনিল। মিনিট পনেরো মধ্যে পাল্কী আসিয়া উপস্থিত।

"দণ্ডপাত" বলিয়া উড়ে বেহারারা নিশিকান্ত বাবুকে প্রণাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল। পাল্কীর বিছানা করিয়া দেওয়া হইল। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সমস্ত লইয়া নিশিকান্ত পান চিবাইতে চিবাইতে পাল্কীতে উঠিল। বেয়ারা-রা আমাদের অবোধ্য-ভাষায় নানাপ্রকার বুলীতে ইসারা করিয়া চীৎকার করিতে করিতে পাল্কী ছুটাইল। নিশিকান্ত ঘড়ী দেখিল, বেলা ১টা। চারিদিকে রোদ্ গণগণে আগুনের মত। মধ্যে মধ্যে এক একটা পশ্চিমে হল্‌কা আস্‌ছে—যেন পুড়ে যাচ্চে। পীরপুর হইতে মহেশপুর যাইতে পাল্কীতে ছয় ঘণ্টা লাগে।

বেলা পাঁচটার সময় বড়দীঘীর ধারে বেহারারা পাল্কী নামাইল। অনতিদূরে একখানি ক্ষুদ্র দোকান ছিল। দোকানখানি তাল-পাতায় ছাওয়া। চারিদিকে ফাঁক বহিতেছে। দোকানে একজন স্ত্রীলোক। বেয়ারাগুলো সেই দোকান হইতে কিছু কিছু জলখাবার লইয়া জলযোগ করিল। বেশ একটু বিশ্রাম হইয়া গেল। তারপর বেয়ারা-রা পুনরায় "হুঁপো শব্দে ছুটিল। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় পাল্কী মহেশপুরে আসিয়া নামিল। নিশিকান্ত বেয়ারাদের প্রাপ্য চুকাইয়া দিলে পর, তাহারা একটী আটচালায় সে রাত্রিটা কাটাইবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। নিশিকান্ত মধোর সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ীতে প্রবেশ করিল। মধো কাশীনাথ বাবুর পুরাণ ভৃত্য। কাশীনাথ চাঁপার পিতা।

বাড়ীতে জামাই আসিয়াছে, জামাই আসিয়াছে বলিয়া রমণীকণ্ঠ হইতে একটী অস্ফুট স্বর নিশিকান্তের কর্ণে প্রবেশ করিল। এইখানে কাশীনাথ বাবুর বাটীর খবরটা পাঠকের গোচর করিয়া রাখি। কাশীনাথ দুই বৎসর হইল মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। কাশীনাথের মৃত্যুর ছয় বৎসর পূর্ব্বে চাঁপার মা মরিয়া যায়। চাঁপার মার মরিবার এক বৎসর পরে কাশীনাথ আবার একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কিশোরী মেয়েকে বিবাহ করিলেন। ঘোর সংসারী হইয়া বছর কয়েক কাটাইয়া কাশীনাথ ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আজ নয় বৎসর হইল চাঁপার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পর অবধি এখনও স্বামিমুখ দেখে নাই। বিবাহের পর নিশিকান্তও চাঁপাকে আর দেখে নাই। এই যে পরস্পরের দেখাদেখি ঘটিয়া উঠে নাই, ইহা কোন প্রকার ঝগড়া বা মনোমালিন্য-জনিত নহে। নিশিকান্ত এপর্য্যন্ত শ্বশুরবাড়ীর কোন খবরও পান নাই। কেন এ সব ঘটিয়াছিল, সে সব খবর পাঠককে দিতে গেলে একটী বড় গোচের উপন্যাস লিখিতে হয়। সুতরাং সে সব কথা এখন চাপিয়া রাখা গেল।

যাক্; কাশীনাথ বাবুর দ্বিতীয় বিবাহ হইয়াছে, চাঁপার বিবাহের দুই বৎসর পরেই একটী

কন্যা হয়। কন্যাটির নাম রাখা হইয়াছিল ইন্দুবালা। নিশিকান্ত যখন বাটীতে প্রবেশ করিল, তখন সেই যে "জামাই আসিয়াছে, "জামাই আসিয়াছে" বলিয়া একটা অস্ফুট শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার উৎপত্তি হ'চ্ছে পাড়াবেড়ানীদের কণ্ঠে। ইন্দুর মা একলা থাকে বলিয়া পাড়ার কতকগুলি তরুণী ঝিউড়ী রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত তাহার কাছে গল্প-গুজব করিত, দিনের বেলা সবাই জুটে তাস খেল্‌তো, আবার কখন বা গোলকধাম খেল্‌তে খেল্‌তে 'নরক-কুণ্ডে পতন দেখাইয়া এ-ওর-গায় ঢলিয়া পড়িত। সেদিনও উহারা আসিয়া সন্ধ্যার পর হইতে হাসি তামাসা করিতেছিল এবং রাত্রি আটটার সময় হইতে ক'জনে গোল হইয়া বসিয়া স্ব স্ব স্বামীর দীর্ঘবিরহ-বার্ত্তা জানাইতেছিল। তেমন সময়ে জামাই-বাবুকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মধো একবার ইন্দুর মাকে খবর দিয়া যায় যে, জামাই বাবু আসিয়াছেন। খবর পাইয়া ইন্দুর মা আহারের ব্যবস্থা করিবার জন্য মনে মনে একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তখনও পাড়াবেড়ানীরা উঠিয়া গেল না কেন জানেন? একবার জামাইকে দেখিবার ইচ্ছায়।

নিশিকান্ত মধোর হাতের লণ্ঠন-আলোকে দেখিতে পাইল যে, চারজন নবীনা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত ভাবে জড়াজড়ি করিয়া দ্রুত পদক্ষেপ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। এরই মধ্যে সেই চতুরাগণ নিশিকান্তকে দেখিয়া লইবার সুরসুৎ করিয়া লইতে ছাড়ে নাই।

এদিকে রাত্রি হইল। আহারাদি সমাপ্ত হইল। ইন্দু নিশিকান্তকে শয়নগৃহে রাখিয়া চলিয়া আসিল। ইন্দুর নিকট নিশিকান্ত অপরিচিত বলিয়া নিশিকান্তের প্রতি ভাল করিয়া ফিরিয়া দেখিতেও ইন্দুর লজ্জা লজ্জা করিতেছিল নতুবা ছোট হইলেও ইন্দু আজ কালকার প্যাটানের মেয়ে, সে নিশিকান্তকে কিছু না কিছু বলিতই! দরজাটি বন্ধ করিয়া নিশিকান্ত শুইয়া পড়িল।

গ্রাম নিস্তব্ধ হইল। ইন্দু ও তাহার মা শুইয়া পড়িয়াছে। মধো নিজের বাটীতে গিয়া এতক্ষণ তাহার জীর্ণ-মলিন কাঁথাখানির উপর শুইয়া পড়িয়াছে। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে একটী পাখী দীর্ঘ ব্যবধানে থাকিয়া কুক্‌ দিতেছিল, এবং রাত্রির সেই গভীর নিস্তব্ধতাকে যেন একটু ভঙ্গ করিতেছিল।

নিশিকান্ত এতক্ষণ ভাবিতেছিল "চাঁপা আর ছোটটি নাই; এতদিন কেমনটিই হয়েছে! তাইত চাঁপা এখনও আস্‌ছে না, তার কারণ কি? নিশিকান্তের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল! নানা চিন্তা, নানা উৎকণ্ঠা একবারে নিশিকান্তের হৃদয়কে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। তাইত চাঁপা কি ওদের কাছে শুইল! না তা কি, কখনো হয়?"

নিশিকান্তের শয্যাকে কণ্টক স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। আর শুইয়া থাকা হইল না। নিশিকান্ত উঠিল। আস্তে আস্তে দরজাটি খুলিল। দশ পনেরো পা দালানের ভিতর দিয়া গেলেই সাম্‌নে ওদের ঘর। নিশিকান্ত সেই গভীর নিশীথে সেই ঘরের কাছে গেল; গিয়া

দেখে যে জগৎ নিস্তব্ধ নহে। সেই ঘরের ভিতর ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা হইতেছে। নিশিকান্তের কৌতুহল বাড়িল। সে কান খাড়া করিয়া রহিল। ভাল সুবিধা হইল না। নিশিকান্ত সেই অন্ধকারের আবছায়ায় দেখিতে পাইল যে নিকটে একটী জানালা আছে। জানালার কাছে গেল। দেখে যে, জানালায় একটী টাকা ভোর ছিদ্র, এবং সেই ছিদ্র দিয়া উর্দ্ধদিকে তির্য্যগভাবে আলোক-রশ্মি বিপরীত দিকের দেওয়ালে লাগিয়াছে। নিশিকান্ত নিঃশব্দে সেই ফোকরটির নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। এবার বেশ সুবিধা হইল। দেখা ও শুনা উভয় বিধ কার্য্যই চলিতে লাগিল।

নিশিকান্ত দেখিল যে ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় সৌন্দর্য্যশালিনী একটী যুবতী, সেই ছোট মেয়েটীর সহিত কথা কহিতেছে। নিশিকান্ত শুনিতে লাগিল :—

(মেয়ে)—মা, ও আমার কে হয় গা?

(মা)—ভগ্নীপতি হয়। চাঁপার সঙ্গে ওর বে হয়েছে।

(মেয়ে)—চাঁপা কে মা?

(মা)—নে ঘুমো ঘুমো! ঐ ভুত আস্‌ছে।

(মেয়ে)—মা, চাঁপা কে মা?

(মা)—আমার সতীন ঝি হয়।

(মেয়ে)—তোর সতীন কে মা?

(মা)—মরে গেছে। নে-মা ঘুমোনা, ঘুঁষ্যাগুন আজ তোমার চোখে ঘুম ধরে না কেন?

বকুনি খাইয়া ইন্দু চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল এবং খানিকক্ষণের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। নিশিকান্তের বুঝিতে আর কিছু বাকী রহিল না। নিশিকান্ত বুঝিল যে তাহার শ্বশুর ও শাশুড়ী মারা গিয়াছে, বালিকাটী তাহার সৎ শালী এবং যুবতীটী তাহার সৎ শাশুড়ী। কিন্তু চাঁপা কোথা! চাঁপাও কি মরিয়া গিয়াছে না কি? নানারূপ সমস্যায় প'ড়িয়া নিশিকান্তের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু কি করে! নিশিকান্ত যুবতীটির মুখ-পানে স্থিরদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। ভাবিল, ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করি, নৈলে কিছুতেই ত মন ঠাণ্ডা হইতেছে না। মনে চিন্তাগ্নি ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। নিশিকান্ত অবশেষে ঘরের ভিতর ঢোকাই স্থির করিল। কপাটটি ভেজোনা ছিল। ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। নিশিকান্ত ঘরে ঢুকিল। এখন কিন্তু ইন্দুর মা মাথায় কাপড় টানিল না। কে জানে তাহার মনে কি আছে। উভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! যেন প্রত্যেকে অপরের রূপচ্ছটা দেখিয়া মুগ্ধ!

বাড়ীতে আর কেহ নাই; নিস্তব্ধ নীরব! বৃদ্ধস্বামী গত হওয়ার পর প্রাণটা কেমন এক রকম হইয়া আছে। তায় আবার যৌবনের চল ঢল রূপে মন সর্ব্বদাই ভোরপুর! জানি না এখন এরূপ অবস্থায় ইন্দুর মা কেন স্থিরনয়নে নিশিকান্তের মুখপানে চাহিয়া আছে! রমণীর প্রাণের ভিতর এখন কি ভাবের ফোয়ারা যে নিয়ত উছলিয়া উঠিতেছিল—কে জানে!

খানিকক্ষণ পরে নিশিকান্ত বলিল—"মা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া এত রাত্রে আজ তোমার ঘরে ঢুকিয়াছি।"

এ কি! 'মা' বলিতেই রমণীটি যে মাথার কুন্তল-কুণ্ডলীর উপর কাপড়টি টানিয়া দিল! 'মা' বলিলে রমণীর প্রাণে ত স্নেহের মন্দাকিনী প্রবাহিত হয়। এমন কেন হইল? ইন্দুর মায়ের প্রাণে খাঁ। করিয়া কোনো দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল নাকি!

ইন্দুর মা নিশিকান্তের রূপে একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আদর করিয়া বসাইবার ছলে নিশিকান্তের অঙ্গস্পর্শ করিয়া ফেলিল। এবং মোহের বশে এক অননুভূতপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিতে লাগিল। উচ্ছৃঙ্খলা নিশিকান্তের মন অটল অচল! নিশিকান্ত কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ঘরে ঢুকিয়াছে। কি করিবে!

নিশিকান্তকে কাছে বসিতে অনুরোধ করিয়া ইন্দুর মা হাত ধরিয়া টানিল, এবং জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলে আপন আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিল। নিশিকান্ত টলবার ছোকরা নহে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা চাঁপা কোথা?"

রমণীর মন বোঝা বড়ই কঠিন! আহা, কত রকমের ভাব যে অহরহ সেই যুবতীর প্রাণে কমলদলের শিশির বিন্দুর ন্যায় ঝক্ মক্ করিতেছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে! ইন্দুর মায়ের চোখে জল আসিল। বিকৃত করুণ স্বরে আঁচল দিয়া চোখটি মুছিতে মুছিতে বলিল "সে আর নেই।"

শুনিয়াই নিশিকান্তের মাথায় বাজ পড়িল। চোখের সম্মুখে বিশ্ব যেন ঘুরিতে লাগিল। চোখের সামনে পিং পিং করিয়া যেন জোনাকী জ্বলিতে লাগিল। নিশিকান্তের কণ্ঠরোধ হইল। আর জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, চাঁপা কিরূপে মরিয়াছে বা কোথায় মরিয়াছে! অমনি কোনো গতিকে ভাব সংবরণ করিয়া উঠিয়া পড়িল। ইন্দুর মা বলিল, "তাতে মনে মনে কিছু দুঃখ ক'রো না' আমার এই ইন্দুটিকে না হয় বিবাহ করিবে; এটিও দেখতে দেখতে ডাগর হ'য়ে উঠবে। আর তোমার শ্বশুরের এই প্রায় বিশ হাজার টাকার সম্পত্তি তুমিই ভোগ করিবে।"

নিশিকান্ত "আচ্ছা দু-দশ-দিন যাক" এই বলিয়া নিজ শয়ন গৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিল। ইন্দুর মা-ই নিশিকান্তকে মজাইতে পারিল না, তা ইন্দু মজাইবে কেমন করিয়া! নিশিকান্ত যে চাঁপাকে বৈ আর কা'কেও ভাল বাসিতে জানে না, ওর প্রাণ যে একেবারে নির্ম্মল, আহা তা কি অভাগী ইন্দুর মা জানে!

নিশিকান্ত গিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কান্না ব'লে কান্না! প্রাণের অন্তস্তল হইতে সহস্র অগ্নিশিখা যেন একেবারে লহ লহ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। বিবাহের পর হইতে চাঁপাকে দেখে নাই এবং আর জন্মের মত দেখিতে পাইবে না, এ চিন্তা কি হৃদয় সহ্য করিতে পারে!

নিশিকান্ত প্রাতঃকালে উঠিয়া বৈরাগ্য পূর্ণ হৃদয়ে, উদাস প্রাণে শ্বশুরালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ যথেচ্ছভাবে গমন করিতে লাগিল। আর ঘরেতে যাইবার ইচ্ছা হইল না। ঘরে কোনো খবরও পাঠাইল না। চাঁপার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

দুপুর হইল। বৈশাখী রৌদ্র ত সামান্য নয়! মাটিতে পা দেয় কার সাধ্য। মাথার উপরে সূর্য্য যেন প্রলয়-কাণ্ড বাধাইবার উপক্রম করিতেছে। পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে। নিশিকান্ত নিকটবর্ত্তী একটী জলাশয়ে অঞ্জলিপূর্ণ জলপান করিল। এই তার প্রথম হাতে ক'রে জল খাওয়া! আহা, বড়মানুষের ছেলে। সুন্দর রূপ, দেখ্‌লে প্রাণ পুলকে পরিপূর্ণ হয়। তেমন চেহারা রোদে থাক্‌সে যাচ্ছে। নিশিকান্ত সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যার সময় এক নির্জ্জন শ্মশান-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিকটে তর্‌ তর্‌ করিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী বহিতেছে। কেহ কোথাও নাই। কেবলমাত্র একটী সন্ন্যাসী আছেন। নিশিকান্ত সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল। মৌনী-সন্ন্যাসী তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আহার্য্য দিল। কিন্তু কোন কথা কহিল না। যাহা হউক, ক্ষুধার্ত্ত নিশিকান্ত অবিলম্বে সেগুলি আহার করিয়া দীপ্ত জঠরাগ্নিকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিল। নিশিকান্তের প্রাণ সর্ব্বদাই খারাপ হইয়া আছে। কিছুই মনোহর বোধ হইল না। তবে ক্ষণকালের জন্য সন্ধ্যার সময় সেই নদীতটের শ্মশানে সন্ন্যাসীর নিকট কেমন এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে যেন সে সব ভুলিয়া গিয়াছিল। পরদিন প্রভাতে নদীর ধার দিয়া, বরাবর যেমনে দু'চক্ষু যায়, চলিতে লাগিল। চাঁপার চিন্তা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নিশিকান্ত গুন্‌ গুন্‌ করিয়া প্রাণমাতানো সুরে গান ধরিল।—

চল রে চলে চল
উদাস প্রাণে,
বেলা যে ব'হে যায়
প্রেমের টানে।

* * *

আপন মনে গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে নিশিকান্ত সমস্ত দিনই চলিল। বেলা প্রায় চারিটা হইয়াছে, আর পা চলে না। এমন সময় একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামটীর নাম—গিরিনগর। গ্রামটী অতি প্রকাণ্ড। তবে লোকের বসবাস অতি অল্প, সবে মাত্র ১২—১৪ ঘর বাস। নিশিকান্ত গ্রামের প্রান্তভাগে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। গ্রামের ভিতর দেখে যে আম কাঁঠালের বড় বড় বাগান। বাড়ী ঘর বড়ই কম। বাস বড়ই পাতলা পাতলা।

নিশিকান্ত প্রাচীরবেষ্টিত একটী বাগানের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আশা,—যে, আহার আশ্রয় দুইই মিলিবে। বাগানটী খুব বড়। ভিতরে কাঁকর দিয়া বেশ রাস্তা তৈয়ারী আছে। মধ্যে একটী পুষ্করিণীতে তব্‌তরে কাকের চক্ষু জল। ঘাটটী সান-বাঁধান। নিশিকান্ত সেই সান্‌-বাধানো ঘাটের চাতালে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। এ দিকে সূর্য্যিমামা রাঙা খড়ম পায়ে দিয়া পাটে বস্‌বার উপক্রম করিতে লাগিলেন। বসিয়া থাকিতে থাকিতে অলস বোধ হইল। নিশিকান্ত সেই চাতালটীর উপর কোঁচার খুঁটটী পাতিয়া শুইয়া পড়িল। শুইতেই ঘুম আসিল। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের শেষ কিরণ নিশিকান্তের মুখে লাগিয়া তার সোনার মতন বর্ণকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। সূর্য্য ডুবিয়া গেল।

মাঠের গোরু সব ঘরে ঢুকিল। সেই ফরসা ফরসা সময়টায় একটী প্রৌঢ়া রমণী সেই ঘাটে কলসী কাঁখে করিয়া আসিল। রমণী সেই তেমন অনিন্দ্যসুন্দর রূপ ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে দেখিয়া বড়ই ব্যথা পাইল। প্রৌঢ়া মনে করিল বোধ হয়, কোন শ্রান্ত পথিক এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। আহা, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় তোলা ঠিক নয়। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছিল। সুতরাং তাহার পক্ষে দাড়াইয়া থাকা অসম্ভব। অথচ পথিককে ফেলিয়া যাইতেও তাহার মন-কেমন করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করাই ঠিক করিল।

"হ্যাগা কে ঘুমুচ্চ গা ? হ্যাগা কে গো ?"

নিশিকান্ত চক্ষু মেলিল। দেখিল একটী প্রৌঢ়া স্নেহপূর্ণ বচনে তাহাকে ডাকিতেছে।

প্রৌ। তুমি কোথা থেকে আসছ গা ? এখানে এমন ক'রে ধূলোয় পড়ে কেন বাছা ?

নি। আমি উদাসীনভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি! এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। আজ আর কোথায় যাইব! তাই এখানে পড়ে আছি।

প্রৌ। আহা-হা! তুমি কেন এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছ বাবা ?

নি। আমার স্ত্রী-পুত্রাদি কেহই নাই। সংসার করিব কা'কে লইয়া ?

প্রৌ। তোমার কি ছেলে পিলে হ'য়ে মারা গেছে সব ?

নি। না; আমার বিবাহের পর স্ত্রী মারা গিয়াছে। ছেলে পুলে কিছুই হয় নাই।

প্রৌ। হ্যাগা, তা আজ কি খেয়েছ ?

নি। কি আর খাব মা! কিছুই খাওয়া হয় নাই। মনে করিতেছি, আজ এই বাগানের ফলমূল দুই একটা সংগ্রহ করিয়া খাইব, এবং তাহাতেই রাত কাটাইয়া দিব। তারপর কাল অন্য গ্রামে চলিয়া যাইব এবং ভগবান যা জুটাইবেন তাহাই খাইব।

স্ত্রীর প্রতি যুবকের এইরূপ একনিষ্ঠ ভাব দেখিয়া, ও তাহার সরলভাবের কথাবার্ত্তা শুনিয়া প্রৌঢ়া আর থাকিতে পারিল না। কি জানি কেন—প্রৌঢ়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, বাপু তোমার আজ এখানে থেকে কাজনি। তুমি আমার বাটীতে আজ খাওয়া দাওয়া করবে চল। আজ আমার বাটীতেই থাকবে-এখন।

প্রৌঢ়ার স্নেহগদগদকণ্ঠে ঐ কথাগুলি শ্রবণ করিয়া নিশিকান্ত বলিল,—"মা আমি যাইতে পারি--কিন্তু—"

প্রৌ। কিছু সঙ্কোচ ক'রো নি বাছা। তোমার কোন চিন্তা নাই। এখানে প'ড়ে থাকা ভাল নয় বাছা।

নিশিকান্ত লক্ষ্য করিল যে, ইন্দুর মায়ের ভাবভঙ্গী যেমন কলুষমাখা, এর মুখে তার কিছুই নাই। প্রৌঢ়ার মুখে পবিত্র স্নেহের যেন এক দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিশি-কান্ত এই সব দেখিয়া শুনিয়া এবং ভয়ানক জেদ দেখিয়া, সেই কালসাঁজিটার সময় কলসকক্ষা প্রৌঢ়ার পশ্চাদগমন করিল। বাটীতে পৌঁছিয়া দেখিল—কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নাই। কাছাকাছি কারও বাসই নাই।

সাড়া হবে কিসের! প্রৌঢ়ার অনুরোধে নিশিকান্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে অন্তঃপুরেই প্রবেশ করিল। দেখিল একটী যুবতী তাহাকে দেখিয়া জড়সড় ভাবে একদিকে সরিয়া বসিতেছে।

প্রৌঢ়া তাহার সেই বোন্‌ঝিটীকে বলিল,—"দেখ আজ ইনি আমাদের অতিথি। আজ ভাল ক'রে এঁর সেবা কর। অন্য কেহ নয়!—অতিথিকে দেবতার ন্যায় ভক্তি কর্‌তে হয়। সমস্ত দিন এঁর খাওয়া হয় নাই। আজ আমাদের বাগানে ইনি পড়িয়াছিলেন। এমন সরল প্রকৃতি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এঁকে লজ্জা কর্‌বার দরকার নাই।

আহা ও যুবতীটির প্রাণও কি সরল! ভগবান যেন রূপের সঙ্গে গুণ মিলাইবার জন্যই উটিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যুবতীটি একবারে সরলা বালিকার মতন মাথার কাপড় খুলিয়া অতিথির সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইল। পা ধোবার জল আনিয়া দিল। বসিবার জায়গা করিয়া দিল। নিশিকান্ত পরের বাটীতে এমন সেবা জীবনে কখনও পায় নাই। নিশিকান্ত মনে করিল সে দিন সন্ন্যাসীর মুখ দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া এত আনন্দের উৎস এখন তাহার হৃদয়ে উঠিতেছে। মুখ হাত পা ধুইয়া, ভগবানকে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম করিয়া নিশিকান্ত আসনে উপবেশন করিল। প্রৌঢ়া কিঞ্চিৎ জলখাবার আনিয়া দিল। নিশিকান্ত জলযোগ শেষ করিলে প্রৌঢ়া ও সেই তরুণী তাহার সঙ্গে নানা কথা কহিবার জন্য কাছটিতে বসিল। নিশিকান্ত যুবতীটির দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, এমন সৌন্দর্য্য, এমন হাসিমাখা মুখ, এমন সরলতা, এমন স্থৈর্য্যভাব, এমন প্রাণস্নিগ্ধকর চাউনি, সে খুব কমই দেখিয়াছে; দেখে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যুবতীটি বলিল, "মাসিমা, ময়দাটা আন্‌ব? ওঁর যে খাওয়া হয় নি; ময়দা মাখিতে মাখিতে কথা কহিব-এখন।" প্রৌঢ়া বলিল, "হ্যা মা, বেশ বলিছিস্; আর বেলনটা নিয়ে এসে বোস।"

নিশিকান্ত ভাবিতে লাগিল "আহা পল্লীগ্রামে এখনও এত উদার-স্বভাব আছে। আহা, এমন নিঃসঙ্কোচ প্রাণ, এমন অতিথি-সেবিকা সংসারে অতি দুর্ল্লভ। ওঃ! একটী প্রৌঢ়া ও একটীমাত্র যুবতী যে সংসারে আছে,সে সংসারে এখনো এমন আদর্শ পবিত্রতা আছে! আজ আমার নয়ন সার্থক হইল। পবিত্রতা! তুমি যে এখনও এমন নিভৃত-পল্লীর রমণী-হৃদয়ে নিত্যই লীলা কর, তা এই দেখিলাম। আজ আমার সুপ্রভাত।

যুবতীটি ময়দা মাখিতে লাগিল। তাহার সেই চম্পকসদৃশ অঙ্গুলিগুলি নাড়িয়া গুড়া ময়দাকে জলের সঙ্গে জড়াইতে লাগিল। তাহার মাসী নিশিকান্তের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল এবং যুবতীটি প্রাণ ভরিয়া তাহা শুনিতে লাগিল।

প্রৌ। হ্যাগা তোমার স্ত্রীর কি হয়েছিল?

নি। কে জানে কি হয়েছিল! শুনেছি মারা গেছে।

প্রৌ। কে বল্লে?

নি। আমার সৎ-শাশুড়ী। আমি সেই

শুনিয়া অবধি আর ঘরেও যাই নাই। সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইব, স্থির করিয়াছি।

(প্রৌ)—আহা আঁটকুড়িকে এমন সর্ব্বনাশের কথাও শোনাতে হয় কি! তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথা?

(নি)—মহেশপুরে।

"মহেশপুর" শুনিয়াই প্রৌঢ়ার ও যুবতীর প্রাণটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য আগ্রহ বাড়িয়া গেল। সৌভাগ্যবান্ নিশিকান্ত তখনও জানে না যে চাঁপা তাহার সম্মুখে বসিয়া ময়দা মাখিতেছে। চাঁপাও বুঝিতে পারে নাই যে, সে নিশিকান্ত। সেই বিয়ের সময় দেখা, আর এই দেখা! কেমন করিয়াই বুঝিবে।

(প্রৌ)—তোমার শ্বশুরের নাম কি গা? কার সঙ্গে তোমার বিবাহ হ'য়েছিল?

(নি)—শ্বশুরের নাম ৺কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার প্রথম পক্ষের এক কন্যা চাঁপার সহিত আমার বিয়ে হয়েছিল।

এই বলিতে বলিতে নিশিকান্তের শোকাবেগ উথলিয়া উঠিয়া চোখ দিয়া টস্ টস্ করে দুই ফোঁটা জল পড়ে গেল। যুগপৎ সুখে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া প্রৌঢ়াও উচ্চস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল। চাঁপা ভাবিতেছিল, যে ইনি যদি আজ এখানে আসিয়া না পড়িতেন এবং বিদেশে সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাহা হইলে আমার জীবনটা কি ভয়ানক তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে লজ্জা ভয় সব ভুলিয়া গিয়া নিশিকান্তকে জড়াইয়া ধরিল এবং তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাদের হৃদয়ের উচ্ছাস কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে চাঁপা তাহার সৎমার নিকট কত কষ্ট পাইয়া এই মাসীরবাড়ী চলিয়া আসিয়াছিল, সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বলিতে বলিতে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

নিশিকান্ত ভাবিল, "ওঃ! চাঁপা জীবিত ছিল! পাপীষ্ঠা কলঙ্কিনী সৎ-শাশুড়ীর কি ভয়ানক ব্যবহার!"

চাঁপার এখন সুখের সংসার। আমার কথাটি ফুরুলো. নটে গাছটি মুড়ুলো।

শ্রীমুনীন্দ্র নাথ জ্যোতীরত্ন।

দয়াল।

কিবা গৌর তনু
ভাবে ঢল ঢল্,
আবেশেতে সদা
করে টল মল্,
ঝরে প্রেম বারি
মুকুতারি ফল—
নাচিছে গোরারায়।
মুখে হরিবোল
বলে বিভোরায়,
হেম ভুজে বাঁধি
সবে কোল্ দেয়
অমৃত প্লাবনে
সব ভেসে যায়—
মদে মাতাইয়া।

দুহাতে বিলায়

অঞ্জলি ভরিয়া,

ঘরে ঘরে ফিরে

সে নাম যাচিয়া,

বলে দিন বহে যায়

আয়রে চলিয়া—

দুঃখী কাঙ্গাল ওরে।

দীন জন বলে

এস কুতুহলে,

এমন দয়াল

কভু নাহি মিলে,

এই শুভ যোগ

দাও যদি ছেড়ে —

(গোরায়) মিলিবেনা অতঃপরে

শ্রীজনরঞ্জন রায়

সাধু ও অসাধু।

বিমল সরসি-জলে শৈবালের সাথে
করি বাস, পদ্ম কভু সঙ্গদোষ তাহে
নাহি পায়,—সদা রহে অমল সুন্দর ;
তেমতি বিষয়ী সনে সাধুর অন্তর।
সুবিমল জলে ভেক কমলের সনে
থেকেও না দেখে কভু কমলের পানে
সতত আহার করে কর্দ্দম সমলে,
খেয়ে যায় পদ্মমধু মধুপ সকলে।

শ্রীজগবন্ধু চৌধুরী।

কেন ফুটে।

ফুটাতে পৃথিবী কোলে অপার্থিব শোভা,
বিলাতে জগত প্রাণে স্বরগ সৌরভ
ফুলফোটে কাননেতে জন মনোলোভা
স্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টি অমর গৌরব।
হাসিমুখে, মধুবুকে, সুবাস অন্তরে
জগতে জাগে সে শুধু পরের কারণ,
স্বার্থপর, সর্ব্বগ্রাসী বিশ্বের দুয়ারে
আপনা বিকায়ে করে সার্থক জনম।
ডেকে বলে মুগ্ধ নরে "যখন আমারে
মালা গেঁথে, বুকে করি, করিবে যতন,
একবার ভেবো সেই অনন্ত সুন্দরে
যে মোরে সুন্দর করে করেছে সৃজন।
আর ভেবো, তোমরাও আমারি মতন,
জগতে এসেছ শুধু পরেরি কারণ।

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী।

আহুতি।

Tragedy is poetry in its deepest earnest, comedy is poetry in unlimited jest—Coleridge.

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য-তপোবন ; প্রাঙ্গন

হোমানল, অনুপচন্দ্র, সত্যানন্দ, অদ্বৈতানন্দ,
আহুতি, নির্ঝরিনী।

অনুপ। পতিঃ। চিত্ত দমিত হ'লেই কি বিবেক
পূর্ণবিকশিত হয় ?

আহ। না;—চিত্তের দমনে বিবেক আসে না। যদি সারাজীবন চিত্ত দমন করতেই গেল, তবে চিত্ত শুদ্ধি হবে কবে? চিত্তের বিনাশেই বিবেকের উৎপত্তি।

হোমা। বৎস! অরুণোদয়ে শর্ব্বরী যেমন ক্ষীণা হ'য়ে পড়ে, বিবেকোদয় হলে বাসনা তেমনি ক্ষীণ হ'য়ে যায়। কিন্তু, এখন দেখা যাক, কি উপায়ে বিবেকের উদয় হয়। বৎস! সংসারে চিত্ত নাই, অবিদ্যা নাই, মন নাই, জীবও নাই, তবে চিত্তাদির উপলব্ধি হয় কেন? সে কেবল অজ্ঞানের বিকাশ। অজ্ঞতানিবন্ধন সম্যগদর্শন প্রতিবন্ধক অন্ধত্ব! দেখ, বিষগন্ধ পেলে চকোর যেমন তথায় প্রবেশ করে না, সেইরূপ বিষয়-রূপ বিষ-গন্ধে বিবেকও বিষয়ীর অন্তরে প্রবেশ করতে চাহে না। অর্থাৎ যার মন বিষয়ভোগে উদাসীন,সেই কেবল চিরবন্ধন-কর বাসনা-নিগড় কেটে, নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ সুখে সুখী! ভ্রান্তিময় চিত্তের পরিবর্ত্তে তারই কেবল জ্ঞানময় চিত্তের বিকাশ হয়, তার চিত্ত সর্ব্বদাই প্রশান্ত। ত্যাগ জান্‌তে পারলেই ভ্রান্তিময় চিত্তের উপলব্ধি হয় না; ইহা স্বরূপ জান্‌বে। আচ্ছা, যার কাছে এই জগৎ প্রপঞ্চ একেবারে অপরিচিত, ইহাতে যার আস্থার লেশমাত্র নাই,এবং যার নিকট ইহার কোন সত্তা নাই, বল দেখি, তার এই অজ্ঞানময় চিত্তের উৎপত্তি হয় কেন?

আহ। এই যে জীবাদির উপলব্ধি করছি, ইহাও অজ্ঞান বিলসিত,—যে এই সংসারকে ব্রহ্মময় দেখে, এবং যে ইহার আকারকে ব্রহ্মেরই আকার ব'লে বুঝতে পারে, তারই কেবল অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়।

হো। হাঁ, বৎস!—তার মনে জগতের আর দ্বৈতভাব থাকে না। অজ্ঞান তিরোহিত হ'লে, মিথ্যা ভ্রমোৎপাদক স্বভাব বিনষ্ট হ'য়ে এক তেজোময়ভাবের উদয় হয়, যাহা সূর্য্যাপেক্ষা তেজস্বী! যাহার প্রখর আলোকে অজ্ঞানান্ধকার ঘুচে যায়; তার তেজে ভ্রান্তিপূর্ণ চিত্ত শুষ্ক তৃণের ন্যায় চিরদিনের জন্য পুড়ে খাক হ'য়ে পড়ে ও জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃত-কণার মত কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়। যাঁরা বিবেক-বলে জীবন্মুক্ত, না মরেও,—সংসারের সহিত সম্পর্ক না ছেড়েও, তাঁদের কাছে সংসার পৃথক।—এই বিশাল সংসার তাঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ; সুতরাং তাঁরা পরাপরদর্শী ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী তাঁদের চিত্ত সত্বরূপে পরিণত হয়। তাঁদের বাসনা চিত্ত দিয়ে সম্পন্ন হয় না, সত্ব দিয়েই সম্পন্ন হ'য়ে থাকে। কেন না, যাঁরা এই সংসারের প্রকৃত তত্বজ্ঞ, তাদের চিত্ত থাকে না। তাঁরা নিত্যই সমদর্শী। তাঁদের দ্বৈতভাব নাই, তাঁদের বাসনাই, চিত্ত বিবেকোদয়ে নির্ম্মল, সেই চিত্তেরই নাম সত্ব! যখন চিত্ত সত্বরূপে পরিণত হয়, তখন মোহ উদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। যাঁর চিত্ত সত্ব হ'য়ে যাবে, তাঁর আর ভবে আনাগোনা করতে হ'বে না। জ্ঞান অগ্নি, চিত্ত-তৃণ, এ তৃণকে সে অগ্নি দিয়ে এমন করে পোড়াতে হ'বে, যেন তার মূল না থাকে, নতুবা অনুৎপাটিত মূল তৃণ যেমন দগ্ধ হ'লেও আবার অয়ে অয়ে

অঙ্কুরিত হতে থাকে, তদ্রূপ ইহারও পূর্ণ বিকাশ অনিবার্য্য।

আহু। পিতঃ! চিত্তের বিনাশে জগতের বিনাশ এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি?

হোমা। তাৎপর্য্য এই—যিনি ব্রহ্ম, তিনিই জগৎ; সুতরাং জগৎ ও ব্রহ্ম এক বস্তু, ভিন্ন নহে। জ্ঞানময় উজ্জ্বল চিত্ত আর ব্রহ্ম যেমন এক, ইহাও তদ্বৎ-অভিন্ন-এক বস্তু। আর অজ্ঞানাচ্ছন্ন চিত্তেই এই ত্রিভুবনের সত্ত্বা। ত্রিজগৎ স্বতন্ত্র নাই। যেমন মরিচ, তীক্ষ্ণতাই ইহার উপাদান, তীক্ষ্ণতাই ইহার শরীর, তীক্ষ্ণতার সত্ত্বাই ইহার সত্ত্বা; সেইরূপ চিত্তসত্ত্বাই জগৎসত্ত্বা। সংসারে আছে, ছিল না, এ দুই মিথ্যা, সুতরাং চিত্ত আর জগৎ এক। জগৎ বলে কোন স্বতন্ত্র উৎপত্তি নাই, স্বতন্ত্র বিনাশ ও নাই। এখন বুঝলে কি? চিত্ত যতক্ষণ, জগত ততক্ষণ, চিত্তের বিনাশেই, জগতের বিনাশ। বেলা অধিক হ'য়ে উঠল—এখন চল, অন্য দিন এ বিষয়ের মিমাংসা করা যাবে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পাহাড়ের নিকট তপোবন।

আহুতি ও ঋষিকন্যাগণ।

সকলে—প্রণমামি ঈশ্বর, তুমি সর্ব্বরূপী হে।
তুমি নির্ম্মল চিৎসার, তুমি সংসারের সার,
তুমি সর্ব্বকার্য্য তৎপর, উত্তম হে।
তুমি কারণ-কারণ, তুমি পদার্থ ভাবন,
তুমি অভাবনীয়, অভবস্বরূপ হে।
তুমি বৃত্তি প্রকাশ, তুমি শূন্য মায়া-লেশ,
তুমি বহুবীজ স্বরূপ, হে।
তুমি আকাশ স্বরূপ, তুমি ঝটিকার স্তূপ
তোমা হতে কোটী-মরু, সদ্য স্ফুরিত হে।
পাবক উষ্ণতা যথা, তুমি ধরা ক্ষিতি তথা,
তুমি মেরু-ধৃত, তুমি পরমাণু হে।
নিখিল মহী মণ্ডল, তব মহা-কবল,
সপ্ত সাগরা পৃথ্বি, তব সীমা নহে হে।
সংসার রচনা তব, কিন্তু তুমি হে নিশ্চল,
তুমি দ্রব্য নহ তবু, তুমি দ্রব্যবান হে।
তুমি আকার বর্জ্জিত, তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ড,
তুমি অদ্য তুমি প্রাতঃ, তুমি কিছু নহ হে।
তুমি অজর, অমর, অশেষ গুণসাগর
পরম পুরুষ পরাৎপর হে।
তোমাতে হে সমুদয়, হয় সদা অভ্যুদয়,
সমুদয় হ'তে তুমি, তুমি সর্ব্বময় হে।
দল-পল্লবশোভিত, তুমি বিশ্ব-প্রকৃতিগত
জগন্মোহিনী লক্ষ্মী, তব মূর্ত্তিময় হে।

ক্রমশঃ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

নিভৃত চিন্তা।

সে দিন গিয়াছে চলি, ফিরিবে না আর;
নিবেছে সুখের দীপ, ঘেরেছে আঁধার।
জীবন মধ্যাহ্নে বসি' কল্পনার সনে
এঁকেছিনু যেই ছবি ভাস্বর বরণে,
সময়ের স্রোতে, হায়, ভেসেছে সকলি;
কল্পনা যৌবন সাথী, সেও গেছে চলি।

উজল সোনার পাতে গঠেছিনু ঘর,
হাসিত সতত যথা সুখ-সুধাকর,
জননীর স্নেহধারা অমিত অতুল,
পত্নীর পবিত্র প্রেম পারিজাত-ফুল,
শিশুর মধুর বোল, যশের গুঞ্জন,
সখার প্রণয় কথা হৃদয়-রঞ্জন
এঁকেছিনু যাহা যাহা কল্পনার বলে
কালের আবর্ত্তে হায় ডুবেছে সকলে।
ছিন্নতার বীণা যথা নাট্যের শালায়
অথবা তরণী ভগ্ন সাগর বেলায়
পড়ে আছি একধারে ঘৃণিত লাঞ্ছিত;
সম মম সুখ দুঃখ হিত বা অহিত॥
"নিরাশ হওনা কবি, বাঁধ ভরসায়
ও ভগ্ন হৃদয় তব, সংসার বেলায়।"
গাইলা গম্ভীরে বাণী মধুর ঝঙ্কারে,
সঞ্জীবিত হল তনু আশার সঞ্চারে।
আবার উঠিল, শুন, ললিত ঝঙ্কার
ঢালিয়া ভগ্ন হৃদে শান্তি-সুধা-ধার।
"বিশাল জগতে ভাবি' আপনার ঘর
সাধহ কর্ত্তব্য তব বাঁধি' পারিকর।
যতেক পরাণী আছে ক্ষুদ্র বা মহান্,
আপনায় ভাবি' দাও স্বার্থে বলিদান।
পরহিতে নিয়োজিত করিয়া জীবন,
বিমল সুখের স্বাদ করিয়া গ্রহণ
যাও চলি মরণান্তে উঠি কীর্ত্তিরথে—
উজলি বিশাল বিশ্বে স্বরগের পথে।"

শ্রীরণধীর চট্টোপাধ্যায় বি, এ।

গৃহীর কর্ত্তব্য।

হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই সকলের শ্রেষ্ঠ। এখানকার যাবতীয় নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে মানব অনায়াসেই ভোগ-মোক্ষ করতলগত করিতে সমর্থ হয়। এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া গৃহীগণকে পদে পদে পরীক্ষা প্রদান করিয়া আত্মোন্নতি করিতে হয়। ধর্ম্মের সহায় ব্যতীত এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আর কোন উপায় নাই। ধর্ম্মই গৃহস্থ-গণের প্রধান বল, এই বলে বলীয়ান হইতে না পারিলে কেহই সংসারে থাকিয়া উন্নতি করিতে পারিবে না। গৃহ ধর্ম্মময় না হইলে, গৃহী ধার্ম্মিক ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী না হইলে, সংসারে তাহার শ্রেয় নাই। গৃহী মিথ্যাকথা কহিতে সতত ঘৃণা করিবেন, যাহাতে সদা-সর্ব্বদা সত্যবাদী হইতে পারেন—সে বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন। তবে সত্য কথা বলিয়া কাহার হৃদয়ে যদি আঘাত লাগে কিম্বা কাহার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেরূপ স্থলে কোনও কথা বলা উচিত নয়। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন "সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।"

গৃহী ব্যক্তি স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে ঈশ্বর সেবা করিবেন, কখনও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবেন না। অথচ কোনও ধর্ম্মের নিন্দা করা কদাচ উচিত নহে, কারণ সকল ধর্ম্মের মূল এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে। যিনি যেরূপ ভাবেই ধর্ম্মচর্চ্চা করুন না কেন; সকলেই যে

সেই পরম-কারণ, বিশ্বজীবন পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য লালায়িত, তাহা কেনা স্বীকার করিবে। প্রথমতঃ নানাবিধ শিক্ষার দ্বারা ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া আপনার চরিত্র মার্জ্জিত করিতে হইবে। অমার্জ্জিত-চরিত্র ব্যক্তি কখনও গৃহী নামের যোগ্য হইতে পারে না। চরিত্র মার্জ্জিত না হইলে কখন ধর্ম্মে মতি স্থির থাকিতে পারে না। যে গৃহের গৃহী ধর্ম্মে অচলা ভক্তি স্থাপন করিতে পারেন, সেই ব্যক্তিই সংসারে প্রকৃত সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ। ধর্ম্মই মানবজীবনের একমাত্র সহায় এবং সেই ধর্ম্মের ধন ভগবানই আমাদের পিতামাতা এবং সর্ব্ববিধ সুখ-দাতা। সংসারে আমরা যখন যেরূপ অবস্থায় থাকি না কেন; সেই একমাত্র কর্ত্তা ভগবান সকল অবস্থার ভিতর হইতেই আমাদের কল্যাণ-সাধন করিতেছেন; এইরূপ বিশ্বাস করিলে —তাঁহাকেই আমাদের একমাত্র মঙ্গলময় নিয়ন্তা জানিলে আর আমাদের ভাবনা কি? এইরূপ বিশ্বাস মনোমধ্যে দৃঢ়তর হইলে আমাদের পাপে দেহমন কলঙ্কিত হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। গৃহীর ধর্ম্ম বিনা গতি নাই; প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু গৃহস্থের ধর্ম্ম কার্য্য আরম্ভ হয়, হিন্দুর জীবনে এমন কাজ কিছুই নাই—যাহা ধর্ম্মের সহিত সংবদ্ধ নহে? প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত গৃহী যাহা করে, তৎসমস্তই ঈশ্বর পূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—
প্রাতঃরুত্থায় সায়হ্নাং সায়াহ্নাৎ প্রাতঃরন্ততঃ যৎকরোমি জগন্মাত তদেব তব পূজনং।

প্রত্যহ যাহা করিবে সমস্তই ঈশ্বরোদ্দেশে,—তাঁহার প্রীতি সম্পাদনের জন্য করিবে—ইহাই মনুষ্য-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা জানিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবেন। দেবতার প্রতি যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা ও আন্তরিক আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হয়; আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা জনক জননীর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি শ্রদ্ধাদি প্রদর্শন করা উচিত, না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। ভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ পিতামাতাই আমাদিগকে জন্মদান করিয়া লালন পালন করিয়াছেন, ইহ-জীবনে আমরা যাহা কিছু সম্ভোগ করিতেছি—তৎসমস্ত তাহাদেরই শ্রীচরণ প্রসাদাৎ, অতএব তাহাদের তুষ্টি সম্পাদন করা গৃহী মাত্রেই অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতা মাতা ব্যতীত অন্যান্য গুরুজনগণকেও যথাসম্ভব ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে। ভাই ভগিনী এবং আত্মীয় স্বজনকে স্নেহের চক্ষে দর্শন করিয়া তাহাদের সেবা করিবে; দাস দাসীগণকে কখনও কটু কথা প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানলাভ না করিলে গৃহী কখনই সংসারে উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন না। নানা শিক্ষায় পারদর্শী হইলে পর গৃহী ব্যক্তি ধর্ম্মশীলা, সদাচারিণী, গৃহধর্ম্ম—সুদক্ষা সুশিক্ষিতা এবং সদ্‌গুণসম্পন্না, সদ্বংশজা জায়ার পাণিগ্রহণ করিবেন। গৃহীর পক্ষে বিবাহ একান্ত আবশ্যক; লক্ষ্মীস্বরূপা গৃহিণীই গৃহের একমাত্র আলোক স্বরূপিনী, অবস্থানু-

সারে নির্ব্বাচন করিয়া এই রত্ন গ্রহণ করা উচিত। অঙ্গহীনা, রুগ্না বা ব্যাধিগ্রস্তা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা কদাচ উচিত নহে। মানুষ যতদিন অবিবাহিত থাকে, ততদিন পূর্ণত্ব, প্রাপ্ত হয় না।

নির্ব্বাচন সময়ে কোনরূপ রিপু পরবশ বা লোভের বশবর্ত্তী হইলে সে নির্ব্বাচন কখনই মনোমত হইবে না—তাহাতে কখনই সুফলের আশা করা যায় না। একের অধিক পত্নী গ্রহণ করা সংসারীর কোনক্রমে উচিত নহে। আমাদের আর্য্যঋষিগণ প্রায় সকলেই গৃহী ছিলেন; সকলেই মনোমত ধর্ম্ম পত্নী গ্রহণ করিয়া সংসার ধর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধন করিয়া গিয়াছেন।

গৃহীর গৃহ একটী ক্ষুদ্র রাজত্ব বিশেষ; গৃহী ও গৃহিণী এই রাজত্বের রাজা ও রাণী; এই রাজা ও রাণী স্বরূপ গৃহী ও গৃহিণী ধর্ম্মে পাকা না হইলে, অপরিপক্ক নাবিক কর্ত্তৃক তরণীর অবস্থার ন্যায় সংসারতরণীও সর্ব্বদা বানচাল হইয়া থাকে; এইজন্য অধীনস্থ জনগণের কষ্টেরও একশেষ হইয়া থাকে। সংসারী ব্যক্তি নিজ গৃহিণীকে লক্ষ্মী-স্বরূপা জানিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা সযত্নে প্রতিপালন করিবেন; অন্তরের সহিত ভাল বাসিবেন। অন্ন বস্ত্র এবং যদি অবস্থা অনুকূল হয়—তাহা হইলে অলঙ্কারাদির দ্বারা তাহার মনস্তুষ্টি করিতে অবহেলা করিবে না। যে সংসারে স্ত্রীপুরুষে এক ঐক্য হইয়া সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহাই স্বর্গের সমান এবং তথায় ধর্ম্মের স্রোত স্বতঃই প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। এইজন্য ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় সংহিতায় বলিয়াছেন,—

"যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গ স্তত্র বর্দ্ধতে।"

স্বামী স্ত্রীর প্রতি যেরূপ অনুরক্ত হইবেন, স্ত্রীও তদ্রূপ পতিকে আপন দেবতা-জ্ঞানে তাঁহার সৎদৃষ্টান্ত প্রতিপালন করিতে যত্নবতী হইবেন; পারিবারিক উন্নতির জন্য তিনিও ভর্ত্তার সহিত ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সহধর্ম্মিনী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন। সদা সর্ব্বদা দয়া মায়া ও দানে গৃহীগণ মুক্ত হস্ত হইবেন। পুরুষের প্রধান ধর্ম্ম যেমন দান, স্ত্রীজাতীর প্রধান ধর্ম্ম তেমনি সতীত্ব রক্ষা করা এইরূপ নিগূঢ় প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইলে তাঁহারা ইহলোকেই স্বর্গ সুখাস্বাদন করিতে পারেন। পত্নীর সহায়তা ভিন্ন গৃহী ব্যক্তির সংসারে কল্যাণপ্রদ অন্য কিছু নাই।

গৃহী ব্যক্তি কখন স্ত্রীপরবশ হইবে না, অথবা স্ত্রীর সহিত কখন কুব্যবহার করিবে না। স্ত্রী গর্ভবতী হইলে তাহার যথোপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা করা গৃহীব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য। সেই গর্ভে কন্যাই হউক কিম্বা পুত্রই হউক, তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহাদিগকে লালন-পালন করিবে। পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে যত্নের সহিত লালন পালন করিয়া, পরে বিদ্যা শিক্ষার জন্য সতত প্রয়াস পাইবে, কারণ পিতা মাতার উপরই পুত্র কন্যাগণের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পুত্রগণ যাহাতে চরিত্রবান ও ধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারে, সেবিষয়ে পিতামাতার তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা একান্ত উচিত। গৃহীগণ সদাচার-পরায়ণ না হইলে তাহার সংসারে লক্ষ্মী থাকে না। এই জন্য চলিত

কথায় বলিয়া থাকে "আচারে লক্ষ্মী, বিচারে পণ্ডিত।"

পুত্র কন্যাগণ বিবাহোপযুক্ত হইলে; যথার্থ পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের বিবাহ কার্য্য অবস্থানুসারে সম্পন্ন করিবে। কেবল অর্থের লোভে নির্গুণ পাত্র কিম্বা দুঃশীলা পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া শান্তিময় সংসারে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত করিবে না। অতি লোভ পরিত্যাগ করিবে, সৎপথে থাকিয়া যাহা উপার্জ্জন হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কখন অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিবে না। প্রাপ্ত-বস্তু পরিত্যাগ করা গৃহীর কর্ত্তব্য নয়। এইজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন "অতি লোভং নকর্ত্তব্যং, লব্ধং নৈব পরিত্যজেৎ, অতিলোভাভীভূতস্য চক্রং ভ্রমতি মস্তকে।" প্রত্যহ অতিথি সৎকার না করিয়া গৃহী ব্যক্তির জলগ্রহণ করা উচিত নহে। সামান্য ইতর ব্যক্তির প্রতিও সমান সদ্ব্যবহার করিবে। তিনি আয়ের অধিক ব্যয় করিবেন না, সকল বিষয়ে পরিমিতব্যয়ী হওয়া উচিত। অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া জীবনধারণ করাই গৃহব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। সংসারী ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিতে বা ঋণ প্রদান করিতে বিশেষ সাবধান হইবেন। এতদুভয়ের অন্তরে থাকিতে পারিলেই ভাল হয়। তবে যদি একান্তই ঋণ প্রদান করিতে হয়, তাহা আর প্রতি গ্রহণের প্রত্যাশা করিবেন না। ঋণদান করিয়া পুনঃপ্রাপ্ত না হইলে ভ্রাতার অভাবে সাহায্য করিয়াছেন—ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। কাহার নিকট ঋণগ্রহণ করিলে তাহা প্রতিজ্ঞামত যথা সময়ে প্রদান করা উচিত। গৃহী ব্যক্তির মামলা মকর্দ্দমায় লিপ্ত থাকা কখনই উচিত নয়। তবে যদি একান্ত বাধ্য হইয়া লিপ্ত হইতে হয়; তবে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। গৃহীমাত্রেরই ঈশ্বরবিশ্বাসী হওয়া কর্ত্তব্য। পরিবারস্থ কোনও ব্যক্তির বা নিজের পীড়া হইলে অবহেলা না করিয়া অবস্থানুসারে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা রোগের চিকিৎসা করান একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা পাপভাগী হইতে হয়। শোক-দুঃখ ও অভাব জনিত দুঃখে অধৈর্য্য না হইয়া ভগবানে মতিস্থির রাখিলে, তাহা অচিরেই বিনষ্ট হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জন্য স্মৃতি বলিতেছেন "স জীবতি গুণা যস্য যস্য ধর্ম্ম স জীবতি, গুণধর্ম্ম পরিভ্রষ্টো জীবন্নোপি ন জীবতি।", অর্থাৎ সদ্গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি আর ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই যথার্থ জীবিত; গুণহীন অধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ সংসারে জীবিত থাকিয়াও মৃত। অতএব ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান মানবই যথার্থ সংসারী হইবার যোগ্য, চরিত্রই মানবের প্রকৃত অর্থ; এই অর্থ বিতরণ করিবার জন্য ভগবান আমাদিগকে পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্মের নিয়ম প্রণালী শিক্ষা দিয়া মর্ত্তধামে প্রেরণ করিয়াছেন।

গৃহীর সকল বিষয়েই নিয়ম পরতন্ত্র হওয়া উচিত। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার স্নান, ও ব্যায়ামাদির দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্নবান হইবেন; অতি ভোজন, রাত্রিজাগরণ এবং আলস্য পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পরনিন্দা, পরকুৎসায় রত থাকা গৃহীব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে মানসিক বলের হ্রাস ও ধর্ম্মের হানি হইয়া থাকে। গৃহী ব্যক্তির বাস গৃহ সুসজ্জিত

এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। গৃহটী দেখিলে যেন লক্ষ্মীর গৃহ বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক গৃহীর গৃহে, দেবোপাসনার জন্য এক একটী পবিত্র গৃহ বা ঠাকুরদালান থাকা আবশ্যক। কিন্তু আজকাল অনেকেই সে প্রথা পরিত্যাগ করিতেছেন। আজকাল সকলেই ইংরাজী ধরণে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, দেবগৃহ বা ঠাকুরদালান পরিবর্জ্জন করিয়া এখন অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে। আমাদের মতে হিন্দুর পবিত্র গৃহ, গৃহদেবতার অধিষ্টানক্ষেত্র বর্জ্জিত হইলে, তাহা যেন যবনের গৃহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

সংসারী ব্যক্তি সর্ব্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। সংসারীরই পক্ষে সংসারই তাহার ধর্ম্মশিক্ষার আদর্শ স্থান; বাস্তবিক ধর্ম্মের সংসার করিয়া সংসার পাতিতে পারিলে, সে সংসারে ভয়ের কোনও কারণ নাই; মৃত্যু তাহাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে না। পাপীই মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকে, যে সংসারী পুণ্যাত্মা, ধর্ম্মই যাঁহার একমাত্র সহায়-সম্বল, তাহার মৃত্যু ভয় কোথায়? সে ত সকল সময়েই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, সে ত অম্লান বদনে সাহস পূর্ব্বক বলিবে—

"যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে,
নিয়ত লোলুপ মম মন মধুকর,
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত
হে মৃত্যু! তুমি তাহার শরণি নিশ্চয়,
কোনরূপে অতিক্রম করিলে তোমায়
সফল হইবে আশা যাইব তথায়।"

গৃহী ব্যক্তি এইরূপ ভাবে নির্লিপ্ত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। সংসারে সকল কাজ করিবেন, পুত্র কলত্রাদি প্রতিপালন করিবেন। মাছ ধরিবেন কিন্তু গাত্র যেন কর্দ্দমাকীর্ণ না হয়, এইরূপ ভাবে মতি যেন সেই চিদানন্দ চিন্ময় ভগবানের প্রতি স্থির থাকে? কারণ মর্ত্তধাম যে তাহার চিরস্থায়ী বাসস্থান নহে, ইহা যেন তাহার মনোমধ্যে সতত জাগরুক থাকে। যখন জগতে আসিতে হইয়াছে, তখন একদিন না একদিন যাইতে হইবে—মৃত্যু আসিয়া একদিন তাহাকে ভবধাম হইতে অনন্তধামে লইয়া যাইবে। সে দিন নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে, কারণ সেই দিনমণি—সূতের আগমন অবশ্যম্ভাবি। কখন যে তাহার অবির্ভাব হইবে—তাহা কে বলিতে পারে? এইজন্য পূর্ব্ব হইতেই তাহার প্রতীক্ষায় প্রস্তুত থাকা দেহী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। মৃত্যু কেবল দেহত্যাগ মাত্র; গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

বাসাংসী জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযতানি বানি দেহী॥

আমরা ইহজীবনে যেমন ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ট-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি। পরজীবনেও আমরা সেইরূপ তাঁহাকে প্রাণের দেবতা জানিয়া তাঁহার পদে লীন হইতে পারি। কারণ তথায় একমাত্র ভগবান ভিন্ন আর কেহ সহায় নাই। এক ভগবানের চরণ-তরণী ভিন্ন মৃত্যুকালে এই দুস্তর ভবজলধি উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য উপায় নাই।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে গৃহী ব্যক্তি ঈশ্বরের আদিষ্ট সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া, সকল আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া, ভগবদেচ্ছায় ইহ-জীবন ধর্ম্মভাবে সম্পূর্ণ হইল ভাবিয়া, তাঁহারই জয় গান করিতে করিতে মহানন্দে মহাপ্রস্থান করিতে পারিলেই তাহার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করা সার্থক হইল। তিনিই যথার্থ ধর্ম্মবীর বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং অন্তকালে তিনি যে সেই ত্রিলোকের কর্ত্তা, ভক্তবৎসল ভগবানের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

আং সং।

মাসিকপত্র সমাচার।

সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

প্রথমেই মুখপত্ররূপে "দুহু মুখ হেরইতে দুহু সে আকুল" নামক একখানি প্রেমের ছবি। পাঁচ রঙে রঞ্জিত। সুরেশ বাবু বেশ ছবি পছন্দ করিতে পারেন। আহা ছবিখানির ছাপা দেখিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। ভাবটি চমৎকার ফুটিয়াছে। এ বৎসর 'সাহিত্যে' আর একখানি ছবি দেখিয়াছি—'সদ্যঃস্নাতা'। নরেন সরকারের আঁকা। সে কি সুন্দর ছবি! ধন্য চিত্রকর!

"সাগরিকা" অক্ষয় কুমার মৈত্রের লিখিত। মৈত্রের মহাশয় ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করিতে ব্যাপৃত থাকুন।

"উপেক্ষিতা" দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা। ওঁর লেখা পড়্‌তে বেশ লাগে। হাত পেকেছে।

"স্নেহপাশ" একখানি চিত্র। বাহবা দিবার অযোগ্য নয়। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্তের "বেদমার্গ" হীরার টুক্‌রা।

দীনেশ বাবুর "সহজিয়া ধর্ম্ম ও সাহিত্য"। দীনেশ বাবু অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিয়াছেন।

"অমা-নিশীথিনী" একটী কবিতা। কবিতাটিতে ভাবের অভাব নাই। তবে একটা কথা এই 'বিশ্বশোষী তৃষা' ব্যাকরণ-দুষ্ট। পদ্যে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া কি ঘাড়ে পা দেওয়া ঠিক?

"যাদব চন্দ্রের আত্মকাহিনী" শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। তেমন কিছু বিশেষত্ব দেখিলাম না। অমন উচ্চ প্রকৃতির লোক বহুৎ বহুৎ হ্যায়।

"কাচ" ছোট একটী প্রবন্ধ। গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ লিখিত। দুই একটী কাজের কথা আছে। প্রবন্ধটীতে বর্ণাশুদ্ধি দু-একটী মাত্র আছে।

"বংশানুক্রম" শশধর রায়-লিখিত। পড়িতে পড়িতে বেশ কৌতুহলের উদ্দীপনা হয়।

"ভারতে অর্ণবযান" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। প্রবন্ধটি শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের Indian shipping নামক ইংরাজী গ্রন্থের সমালোচনা। পাঁচকড়িকে অমন বইএর পরিচয় দেওয়া খুবই ভাল।

"বঙ্কিম-প্রসঙ্গ" অতি সুন্দর। শচীশ বাবু ঐ রকম ধরণের জিনিষ আরও খুঁজুন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষের "বিদেশী গল্প" ৪০-৪০, অর্থাৎ চলন সই।

"ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ" শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়-লিখিত। বেশ চলিতেছে। চলুক। তবে ভয় হয় এই—

উনকোটী গ্রহ ঘোরে সবিতার পাশে,
ঘূর্ণিপাক দেখে পাছে ছেড়ে দাও ত্রাসে।

"মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা" যাহা দেখি তাহা নিরপেক্ষ ভাবেই হইয়া থাকে। কিন্তু এ সংখ্যায় 'ভারত মহিলার' জনৈক নবীন কবি শ্রীযুক্ত হরিপদ দে-কে বড়ই তিরস্কার করা হইয়াছে। আমাদের মতে উহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ—

আর এক দূর কোন্ কুটীর দুয়ারে,
আগ্রহে দাঁড়ায়ে আছে কবি তব তরে।

এই দুই লাইনের মিল মধ্যম শ্রেণীর মিল। এই মিলের জন্য কবিকে 'যা পদ্য যা মিলে যা' মিলের জন্য কবি কিছুদিন বালির কাগজে মক্স করিতে থাকুন প্রভৃতি বোল-চাল অসহ্য। শেষ ব্যঞ্জন বর্ণ যদি দীর্ঘস্বরযুক্ত হয়, তবে শ্রুতিকটুতাদোষ বর্জ্জিত হইলে উপান্ত স্বরের মিল না থাকিলেও মধ্যম মিল হয়। খামকা কিছু বলা ভাল দেখায় না। এবার থেকে একটু আধটু দোষ দেখিলে শ্রদ্ধাস্পদ সুরেশ বাবু দয়া করিয়া উদারা সুরে রাগ রাগিনীর আলাপ করিবেন।

প্রবাসী। আষাঢ় ১৩১৯।

প্রথমেই মুখপত্ররূপে একখানি ত্রিবর্ণেমুদ্রিত চিত্র। চিত্রখানির নাম "মশাল আলোকে" ঠিক যেন পোটোদের ছবি, কারণ উহা একখানি প্রাচীন ছবির প্রতিলিপি।

রবিবাবুর "জীবন-স্মৃতি" পড়িতে মন্দ নয়। ভাষার ঘোর প্যাঁচ অসহ্য। স্থানে স্থানে আত্মশ্লাঘা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে বিনয়ের পোষাক পরানো আছে।

"মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা" শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে।

"ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের পূর্ব্বাভিমুখী পথযাত্রার নূতন একটী প্রমাণ" এই দেড়হাত লম্বা শীর্ষের নিম্নে পৃষ্ঠাখানেক একটা প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্র' উপসর্গ টীর অর্থ করিতে গিয়া নূতন উপসর্গ জুটাইয়াছেন।

শ্রীনিরুপমা দেবীর "দিদি" বেশ চল্‌ছে।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায় "বাঙ্গালা শব্দকোষ" লিখিয়াছেন। রায় মহাশয় নিবের খোঁচা দিয়া কতকগুলি সংযুক্ত বর্ণকে ওল-ছাড়ানো করিয়াছেন, বাকীগুলাকে বোধ হয় একটু বুড়ো বয়সে কুরুণী দিয়া কুরিবেন। 'এলোমেলোই' ত জানি এলাযেলা কোথায় পেলেন?

দীনেশ বাবুর "ঢাকা জেলার কয়েকটী প্রাচীন স্থান" এতে অনেক খবর পাওয়া যায়।

"অজ্ঞ" শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তার রচনা !, চলনসই কবিতা।

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাসগুপ্ত লিখিত "বানরের নরলীলা" বেশ কৌতুহলদ্দীপক। ছবিগুলি বেশ দেওয়া হইয়াছে। বানরের ছবির মধ্যে কপিলমুনির ছবি কেন? প্রবন্ধটিতে দুই চারিটী ভুল আছে। (বানানভুল) যাবত, বাদ বিসম্বাদ। বেয়াড়া ধরণের ভাষা; যথা—

"আমাদের সকলের খেতে হবে; ও দিয়ে আমার দরকার আছে।

রবিঠাকুরের "যাত্রী" নামক কবিতার স্থানে স্থানে এমন গভীরতা যে "থ" পাওয়া যায় না।

"চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব" রামলাল সরকার লিখিত ক্রমপ্রবন্ধ।

"শ্যামসুন্দর" শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী রচিত কবিতা। নাম সহি করিবার সময় প্রিয়ংবদা লিখিলে ভাল হয় না কি?

"নাগ্নী পল্লীর গান" সত্যেন্দ্র দত্তের কবিতা। কেমন কেমন লাগে! "মহাপুরুষের উক্তি" ঐ সত্যেন্দ্র দত্তের। সত্যেন্দ্র বাবু মৌলিকত্ব দেখাইতে শিখিয়াছেন। এই দেখুন নমুনাঃ—করিয়ো, বলিয়ো, ছায়। বহ্নির বানান কি?

"রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্য্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন" এই প্রকাণ্ড মস্তকের নীচে ঝাড়া সাড়ে ন পাতা বহরের শরীর খানি সাজাইতে লেখক অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর জানটা হায়রাণ হয়ে গেছে। লেখক উপসংহারে বলিয়াছেন আমি অনেকক্ষণ আমার পাঠকদিগের সময় ও ধৈর্য্যের উপর অত্যাচার করিলাম"। আমি বলি—একটু আগে বুঝিলেই ত গোল চুকে যেত।

"জৈন কবিতা" সেই সত্যেন্দ্র দত্তের। তিনটে হোমিওপ্যাথি অষুদের একডোজ করে দিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনিটি।

প্রবাসীর আলোচনায় আগরতলার কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত কোকিল সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা বেশই হইয়াছে. ইহাতে শ্রীযুক্ত জলন্ধর দেব মহাশয়ের সন্দেহ দূর হওয়া উচিত। একস্থানে কালীপ্রসন্ন বাবু ভাবের গুঁতোগুঁতিতে পড়িয়া লিখিয়াছেন যে বৎসরের যে কোন সময়ে তিনি একটী ধাড়ী কোকিল (অন্ততঃ মৃত) জলন্ধর বাবুকে (তাঁহার ঠিকানা পাইলে) দিতে পারেন। আমি বলি মন্দ কি? তিনি ঠিকানাটা পাঠিয়ে দিন না। কালীপ্রসন্ন বাবু ততক্ষণ সাতনলাটা ঠিক করে রাখুন।

রবিবাবুর অবসান কবিতাটি ছি-ছি ও নয়, আহা-মরিও নয়। শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের "প্রাচীন ন্যায়" মধ্যে ন্যায়-অন্যায় নাই।

"বিরহাতঙ্ক" এর ভাবগ্রহণ করিতে হইলে চারটে হাত আর বত্রিশপাটী দাঁত চাই। মাগনা এ যার তার কবিতা নয়—সেই "প্রবাসী" প্রসিদ্ধ কবি বদরী-তিলক ভাবকিশুরী সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের!

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "হেমকণায়" ভাষায় কেমন যেন এক রকম একঘেয়েমি আছে; তবে লেখা ভাল।

নাকে কাপড় দাও, নাকে কাপড় দাও। কেন গো? না—আঁষ্টে গন্ধ আঁষ্টে গন্ধ। কিসের গো? অনুবাদের অনুবাদের। কি হ'য়েছে গো? চারু বাঁড়ুজ্যে "নষ্টোদ্ধার বঁলে একটা গল্প বার করেছেন। ছিঃ ছিঃ! এমন বাহারে ভাষা কেহ কখন দেখেছ? খুটিখাটা ছেড়ে দিয়ে চুপটি করে বস। আমি বলি শোন—

একই সঙ্গে; যাদুকর সূর্য্য উদয় হইবা মাত্র সেগুলিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাপী প্রবালের তোড়া করিয়া তুলিল; কী উজ্জ্বল তাহার ভবিষ্যৎ! সেই গাড়ী সমস্ত প্যারী সহরের বুকের উপর দিয়া অতিবেগে দীর্ঘপথ পান করিতে করিতে উদ্বেগের মতো ছুটিয়া চলিতেছিল; রাউল তাহার সঙ্গীর কোলের কাছে কেমন স্বচ্ছন্দ নির্ভরের সহিত শুইয়া আছে; তাহার কৃতজ্ঞ সামর্থ্য চিরদিন তাহাদিগের অনুসরণ করিলে তবেই তিনি সন্তোষলাভ করিবেন; আগুণের শিখার মত তাহার উত্তাপ মস্তিকের মধ্যে জাগিতেছিল; ইত্যাদি।

[অবশ্য উপরোক্ত (;) চিহ্ন-ব্যবহিত বাক্যাংশগুলি পরস্পর হইতে পৃথক] 'সচীব' শব্দটির বানান কি ? হ্রস্ব ই না দীর্ঘ ঈ ? 'জড়ো সড়' তে যদি প্রথম 'ড়' এ ওকার দিলেন, তবে শেষেরটাতে দিলেও ত বেশ হত। দৃষ্টাভাবে বসে থাক ত।

তারপর ৩৪৬ ও ৩৪৮ এর পৃষ্ঠায় যথাক্রমে 'অভ্যস্থ' ও 'জাগ্রত' সংশোধন যোগ্য নহে কি ?

প্রবাসী পরের কাগজে বানান ভুল বা ছাপার ভুল দেখিলে কট্ কট্ করে বোলচাল বাহির করেন। নিজের কি ঐ বিষয়ে ওমোরটা আছে ? তাই বলি "চালুনি আবার ছুঁচের বিচার করে"।

শ্রীশ্রীভক্তি রত্নাবলি।—শ্রীমনোমোহন বন্দোপাধ্যায় বি, এ বি, এল মহাশয় দ্বারা শ্রীমদ বিষ্ণুপুরী গোস্বামী বিরচিত সংস্কৃত শ্লোকগুলির অবিকল সরল পদে বঙ্গানুবাদ ; স্থানে স্থানে গ্রন্থকার বেশ ভাবুকতার ও ভক্তি রসের পরিচয় দিয়াছেন। এ গ্রন্থখানি বাঙ্গালী পাঠকের নিকট এতদিন অপরিচিত ছিল বলিলেই হয়, গ্রন্থকার বঙ্গে তাহা সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। ভক্ত মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে হৃদয়ে প্রভূত আনন্দ উপভোগ করিবেন মূল্য ১০ আনা। প্রাপ্তি স্থান কর্ম্মযোগ প্রেস ৮নং ভেলকল ঘাট রোড, হাওড়া। শ্রীবৃহস্পতি।

মণিলাল এণ্ড কোম্পানী—কলিকাতা ৪০ নম্বর গরাণহাটার বিখ্যাত জুয়েলার মণিলাল কোম্পানীর নাম বাঙ্গালা দেশে কাহার অবিদিত আছে। এই কোম্পানী নিজ সততা গুণে আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে সাধারণের নিকট বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। দেশের রাজা মহারাজ এবং শিক্ষিত ব্যক্তি সকলেই মণিলাল কোম্পানী নিকট নিজেদের অবশ্যকীয় সোণা রূপা, হীরা মুক্তা প্রভৃতির অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করাইয়া বিশেষ লাভবান হইতেছেন। স্বর্ণকারের দোকান হইতে অলঙ্কার গড়াইয়া দুই বৎসর পরে বিক্রয়ের আবশ্যক হইলে, তাহা যেমন অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় করিয়া সকলকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, ইহাদের নিকট হইতে অলঙ্কার প্রস্তুত করাইলে আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাই মণিলাল কোম্পানীর কারবার পরিচালনের বিশেষত্ব। ইহার সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দোপাধ্যায় এইরূপ সৎ উদ্দেশ্য মনোমধ্যে পোষণ করিয়া এই কারবারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। রামপদ বাবু যে কেবল এই দোকান খুলিয়াই সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন—তাহা নহে। তিনি এক জন শিক্ষিত ও সাহিত্য সেবী—"জীবন সংগ্রাম, মানব চিত্র" প্রভৃতি কয়েকখানি সুন্দর উপন্যাস ও তিনি রচনা করিয়াছেন। সম্প্রতী "ব্যবসায়ী" নামে একখানি মাসিক পত্র পরিচালনেও ব্রতী হইয়াছেন এরূপ লোকের কর্তৃত্বাধীনে এই কারবারের আরও উন্নতি হইবে, আশা করিতে পারা যায়।

বাঁটরা অনাথবন্ধু সমিতি।—এবার এই সমিতির সপ্তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ৬মধুসূদন পাল চৌধুরীর স্কুল গৃহে একটী সভা হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহিত্য ও "বসুমতী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও ষ্টার থিয়েটারের প্রবীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় ও অপরাপর সকলে সমিতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কয়েকটী বালকের উদ্যোগে এই "সমিতি" দিন দিন যেরূপ উন্নতি করিতেছে, তাহাতে কালে ইহার দ্বারা অনেক দেশ হিতকর কার্য্যের আশা করা যাইতে পারে ভগবান এই সকল বালকের দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্য প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রমজীবি সমবায় লিমিটেড্।

৯০।২ নং হ্যারিসন রোড, (কলেজ স্কোয়ারের মোড়।)

মূলধন এক লক্ষ টাকা।

৫৲ হিঃ ২০,০০০ অংশে বিভক্ত।

অংশীদারদিগের বিশেষ সুবিধা।

প্রথম বৎসরে শতকরা ৫৲ হিঃ লাভ দর্শাইয়া নূতন উদ্যমে, উৎসাহে ও বন্দোবস্তে কার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

প্রকৃত স্বদেশী দ্রব্যের
অপূর্ব্ব সম্মিলন স্থান।
যেমন স্বদেশী জিনিষ চাহিবেন তেমনটীই পাইবেন।

মিলের ধুতি, সাটী, তাঁতের ধুতি, সাটী, মিলের ছিট, তাঁতের ছিট, বিছানার চাদর, মোজা, তোয়ালে, গেঞ্জি, তৈয়ারী জামা, সার্ট, কোট, জ্যাকেট, সেমিজ, ফ্রক, পেনি, আয়া-নিকার, কলার।

এসেন্স, সাবান, চিরুণী, ব্রুশ, পুতুল, খেলানা, ফিতে, জরি, ছুরি, কাঁচি পাথরের ও

এ্যালুমিনিয়ম দ্রব্য।

বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস সম্ভার ও পটারি ওয়ার্কসের দ্রব্য।

পার্শি, বোম্বাই, গরদ, তসর, মট্কা, এণ্ডী, মুগা, বাপ্তা, মৌ-শিল্ক কাপড়, জ্যাকেট, পাঞ্জাবী।

ট্রাঙ্ক, ক্যাশবাক্স, পটারি দ্রব্য সম্ভার একস্থানে সব পাইলে কত সুবিধা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

একটী মাত্র অংশ খরিদ করিয়া
অংশীদারের সুবিধা ভোগ
করুন ও
স্বদেশী দ্রব্যের আদর
করিয়া স্বদেশী ব্যবসা স্থায়ী করুন।

দর্জ্জির কার্য্য সুলভ ও বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজিং এজেণ্ট।

আমেরিকার খ্যাতনামা চিকিৎসক "এ রবিন" সাহেব বহু গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা আদি যে সকল উপাদানে মানব দেহ গঠিত, তন্মধ্যে রক্তই মনুষ্যের জীবনীশক্তি। আবার তাড়িতশক্তির মূল রক্তকণিকা হইতেই শুক্রেনিকর সৃষ্টি হয়, সুতরাং শুক্র মধ্যেই তাড়িৎ শক্তির সম্পূর্ণ অধিকার, বাল্যের উচ্ছৃঙ্খলতায় শুক্রের অতিরিক্ত অপব্যয় জন্য তাড়িৎ শক্তির হ্রাস হইয়া সাধারণতঃ শুক্র সম্বন্ধীয় পীড়ার উৎপত্তি হয়। এজন্য উপরোক্ত রবিন সাহেব বিজ্ঞান ও রসায়ন বলে কয়েকটী বীর্য্যবান ভেষজ পদার্থের সহিত ইহাকে অলৌকিক উপায়ে তাড়িৎশক্তি সঞ্চারিত করিয়া মূত্রযন্ত্র ও জরায়ু সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়ার আরোগ্য কল্পে জগতে এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া দিতেছেন। ইহার তাড়িত সঞ্চারিত হওয়াও অলৌকিকত্ব ও বিশেষত্ব, যাহা কোন ঔষধে নাই, ডাক্তার সাহেব আজ তাহাই লোক সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন। চিকিৎসা জগত আজ স্তম্ভিত, ইহা সেবন মাত্রেই মনে হয়-শরীরাভ্যন্তরে কোন বৈদ্যুতিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, ধাতুক্ষীণ, শুক্রের তরলতা, অল্প উত্তেজনায় রেতঃপাত, স্ত্রীসহবাসে অক্ষমতা, সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রমেহ, প্রস্রাবের সহিত ফোঁটা ফোঁটা শুক্র ক্ষরণ, মলের বেগে বীর্য্যপতন, স্বপ্নদোষ, শিরঃঘূর্ণন, স্মরণ শক্তি হ্রাস, কোষ্ঠ কাঠিন্য, অজীর্ণ, অম্লশূল- উদরাময় ও বাত প্রভৃতিতে মন্ত্রশক্তির ন্যায় ফলপ্রদ। শিথিল ইন্দ্রিয়ের দৃঢ়কারিতায় এবং অধিকক্ষণ বীর্য্যধারণায় সমর্থ কল্পে ইহা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। ইহা স্ত্রীরোগেও ফলপ্রদ। দেড়মাসোপযোগী ১ শিশির মূল্য মাত্র মাশুল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা।

সোল এজেন্ট—মেসার্স এইচ, দে এণ্ড কোং।

২০২।১৪ নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট, পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা।

বঙ্গের রাজন্য ও জমীদার বর্গের পৃষ্ঠপোষিত

টেলার্স, মেসার্স কালিকা এণ্ড কোম্পানী।

১০৯ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

আমরা সুন্দর সুন্দর নূতন ফ্যাসনের শীত ও গ্রীষ্ম উপযোগী সকল প্রকার কাপড়ের যথা— লংক্লথ, মারামলুক, সুইজ, আদ্দি, ছিট, জিন, সাটীনজিন, ড্রিল বাপ্তা, আলপাকা, প্যারামিটার, গরদ, কুটক্লথ, ফ্ল্যানেল, এংগোলা, কাশ্মীরার, সার্জ্জ, বনাত, মেরুণো, সিল্ক সাটীন, প্রভৃতি কাপড়ের কামিজ, সার্ট, পিরান, পাঞ্জাবী, কোট, ওয়েষ্টকোট, চাপকান, চোগা, পেণ্টুলন অলেষ্টার, লংকোট চেষ্টারফিল্ড কোট, জ্যাকেট বডী, ফ্রক, পেনকোট, সলুকা পেশোয়াজ, সাচ্চা সলমা চুমকী কাজ করা জ্যাকেট, কোট পাঞ্জাবী পেজিফ্রক, মোজা নানাবিধ রুমাল আলোয়ান, র‍্যাপার সাল প্রভৃতি যাবতীয় পোষাক বাজার দর অপেক্ষা অনেক সুলভ মূল্যে এবং পছন্দমত দ্রব্যাদি ডাকে পাঠাইয়া থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

গায়ের মাপ পাঠাইলে অল্পদিনের মধ্যে অর্ডার মত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া থাকি। অর্ডারের সহিত কিছু অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

REGISTERED No. C. 116.

ষোড়শ বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩১৯ সাল। [৫ম সংখ্যা।

হিন্দু-সমাজের মুখ-পত্র

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

সূচীপত্র।

—কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনা কার্য্যালয়,

হাওড়া।

শিরোরোগ নিবারক ও কেশবর্দ্ধক মহা সুগন্ধি

বেগম-বাহার

হাকিমী কেশ-তৈল।

এরূপ অতুলনীয় গন্ধ বিশিষ্ট কেশ তৈল বাজারে অদ্যাবধি প্রকাশ হয় নাই।

এই তৈল বহুবিধ দুর্ল্লভ ইউনানী হাকিমী উপাদানে প্রস্তুত।

ইহা ব্যবহার করিবা মাত্রই মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও শীতল হয় এবং নিয়মিত ব্যবহারে শিরোঘূর্ণন মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, মাথাধরা, মনের অবসাদ, চক্ষু জ্বালা, অকালপক্কতা, টাকপড়া প্রভৃতি রোগ দূরীকৃত হইয়া কেশদাম ঘন, চিক্কণ, মসৃণ, কোমল ও কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়। স্নানান্তেও ইহার সৌগন্ধ নষ্ট হয় না, এবং ইহার মনোরম সৌগন্ধে মনপ্রাণ সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে।

এই তৈল এক সময় বাদসাহ বেগমদিগের বিলাসের সামগ্রী ছিল। মূল্য ১৲ প্রতি শিশির মাশুল ।৴০, আনা, ডজন ১০॥০ টাকা, মাসুল স্বতন্ত্র। সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।

হাকিম মসিহুর রহমান—ইউনানী মেডিকেল হল।

১১৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন।

মদন মঞ্জরী

শ্রীশ্রীযুগল মূর্ত্তি।

কর্ম্মযোগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্—হাওড়া।

সম্রাট হুমায়ন।

সম্রাট হুমায়নের এক ভৃত্যের নাম ছিল—জোহর। সম্রাটের পানীয় ও স্নানীয় সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনের জল তাহাকে যোগাইতে হইত। এই কার্য্য-ব্যপদেশে জোহর সর্ব্বদাই সম্রাটের কাছে থাকিত এবং সম্রাটের মৃত্যুর পরও অনেক দিন জীবিত ছিল!

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট হুমায়ন পরলোক গমন করেন, ইহার ত্রিশ বৎসর পরে জোহর 'তেজকিরাত উল ভকিয়ত' নাম দিয়া পারস্য ভাষায় সম্রাটের রাজত্বকালের এক ইতিহাস প্রকাশিত করেন। অনেকানেক ইংরেজ ঐতিহাসিক এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। প্রায় ৬০ বৎসর হইল, ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রচার করেন। উক্ত পুস্তক অবলম্বনেই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

হিন্দুস্থানের সম্রাট হুমায়নের পিতার নাম বাবর, পিতামহের নাম ওমার সেখ, প্রপিতামহের নাম আবু সৈয়দ, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম মহম্মদ মীর্জ্জা, তস্য পিতার নাম মিরণ হোসেন এবং তাঁহার পিতার নাম তাইমুর।

হুমায়নের পুত্রের নাম সম্রাট আকবর এবং আকবরের পুত্র ও ওয়ারিশগণের নাম যথাক্রমে—জাহাঙ্গীর, শাজাহান, আলমগীর, আরঙ্গজীব বাহাদুর শা, ফরাক্কাশীর, মোহম্মদ, আহম্মদ আলমগীর দ্বিতীয়, শা আলম, আকবর দ্বিতীয়।

৯১৩ হিজরীতে (১৫০৮ খৃষ্টাব্দে) হুমায়ন কাবুলে ভূমিষ্ঠ হন। ঐ বৎসরে তাঁহার পিতা বাদশাহা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা কামরণ, তৃতীয় ভ্রাতা হিন্দল এবং চতুর্থ ভ্রাতার নাম আসকারি। ইহারা সকলেই মীর্জ্জা (যুবরাজ) উপাধি স্ব স্ব নামের সহিত ব্যবহার করিতেন। *

৯৩২ হিজরীতে (১৫২৫ খৃঃ অঃ) বাবর যখন হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার সৈন্য-ব্যূহের দক্ষিণ ভাগ পরিচালনের ভার হুমায়নের প্রতি অর্পিত হয়। হুমায়ন সর্ব্ব প্রথম আফগানদিগের বিরুদ্ধে সমর-যাত্রা করেন। পাণিপাতের যুদ্ধের পর তিনি আগরা নগরী দখল ও সুলতান ইব্রাহিমের ধন-ভাণ্ডার হস্তগত করিতে প্রেরিত হন। ভাগীরথীর পূর্ব্ব প্রদেশস্থিত ভূস্বামীগণের সম্মিলিত সৈন্যের গতিরোধার্থ যে সম্রাটসেনা নিযুক্ত হয়,

* মুসলমানদিগের প্রত্যেক নামের অর্থ আছে। হুমায়ন অর্থে শুভ, কামরণ অর্থে জয়শীল, হিন্দল—ভারতীয়, আসকারী—শিবিরে সম্ভূত। অনেক আসকারিকে জারজ সন্তান বলিয়া মনে করেন।

হুমায়ন তাহার অধিনায়ক ছিলেন। এই সকল যুদ্ধেই তিনি সিদ্ধকাম হওয়ায় পিতা কর্ত্তৃক ১ কোটী ৭০ লক্ষ দাম (১) পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি আগরায় আসবাব সহ একটী প্রাসাদও পাইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি জোয়ানপুর নগর অধিকার করতঃ বিয়ানার সন্নিকট হিন্দু রাজাদিগের সহিত যে লোমহর্ষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই আহবে হুমায়ন মোগল-সৈন্যের সহিত যোগদান করেন। এই যুদ্ধেও তিনি প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন।

যদিও ভারতবর্ষে তাইমুরের সাম্রাজ্যকে মোগল সাম্রাজ্য বলে, কিন্তু তৎপরিবারের ব্যক্তিগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাহারা প্রধানতঃ 'জাগতারী তুর্কি' ইহারা মোগল অথবা তাতার অপেক্ষা উচ্চ সম্প্রদায় ভুক্ত। কিন্তু তাহাদিগকে কনষ্টানটিনোপোলের তুর্কী হইতে বিভিন্ন রাখিবার জন্য এই প্রস্তাবে তাহাদিগকে মোগল আখ্যাতেই অভিহিত করা হইবে।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণটুকু জোহর লিপিবদ্ধ করেন নাই, তিনি হুমায়নের সিংহাসন আরোহণের সময় হইতে ঘটনাবলী বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। পাঠকগণের বোধ সৌকার্য্যার্থে আমরা অতি সংক্ষেপে এই পূর্ব্বকথাগুলি বলিয়া লইলাম।

সম্রাট হুমায়নের সিংহাসন আরোহণের পর প্রথম ঘটনা,—সাম্রাজ্যের পূর্ব্ববিভাগে বিন্ ও বইজিদ্, আফগান ও মোহম্মদ লোদীর বিদ্রোহ। এই সকল বিদ্রোহ-বহ্নি নির্ব্বাণ করিতে সম্রাট কলিঞ্জর হইতে জোয়ানপুর অভিমুখে সৈন্য-পরিচালন করিলেন। গুমতীনদীর তীরে তাঁহার শিবির স্থাপিত হয়, তথায় ৯৩৮ হিজরীতে বিদ্রোহীদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন। বিজয়লাভের পর সম্রাট, প্রসিদ্ধ শের খাঁর পুত্র জেলালখাঁর অধিকৃত চুণার দুর্গাভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। চারিমাস অবরোধের পর জেলালখাঁ আত্ম সমর্পণ করিলে উভয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়। এই সন্ধিমূলে শেরের দ্বিতীয় পুত্র আবদুল রশিদ তাঁহার অধীন আফগান সৈন্য সহ সম্রাট-সেনার সহিত যোগদান করেন। অতঃপর তাঁহারা মোগল রাজধানী আগরা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। *

মোগল সেনা গুজরাট যাইবার পথে চেতুর (Cheture) দুর্গের নিকট পৌঁছিলে, সম্রাট গুজরাটের সুলতান বাহাদুরের নিকট হইতে একখানি পত্র পান। সুলতান তাহাতে লিখিয়াছেন যে তিনিই কাফেরদিগকে (Infidels) পরাভূত করতঃ মুসলমান ধর্ম্মের কিরণ-রশ্মি উজ্জ্বল করিবার আশায় চেতুর অবরোধ করিয়াছেন। সুতরাং সম্রাট যেন ইহাতে এখন হস্তক্ষেপ না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

সম্রাট স্বধর্ম্মের অনুরাগ বশতঃ উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন, এবং দুর্গ হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত সসৈন্যে তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর সুলতান বাহাদুর স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে, বহারম্পুর জেলার অধীন মারে নামক

(১) ৪০ দামে এক টাকা।

* See History of Bengal page 138.

'নেসার-উদ্দীন' হুমায়নের উপাধি। জেহের উদ্দীন ও নেসার উদ্দীন প্রকাশ্যবাচক,—ধর্ম্মের রক্ষক। প্রত্যেক মুসলমানই মোহম্মদ উপনাম গ্রহণ করিতে পারে।

একটী ক্ষুদ্র পল্লীর অভিমুখে সম্রাট অগ্রসর হইলেন।

এখানে সুলতান বাহাদুরের সেনা তাঁহার গতিরোধ করে। সম্রাট কি ভাবে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাহা সর্দ্দারগণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা প্রত্যেকেই সাধ্যানুসারে লড়িবেন, এমত অভিমত প্রকাশ করিলেন। অতঃপর সম্রাট শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিতেও তাহাদের রসদ প্রভৃতি সংগ্রহের পন্থা রোধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই আদেশানুসারে কতিপয় মোগল-সর্দার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং শত্রু-শিবিরে যাহাতে কোন প্রকার খাদ্য-শস্য প্রবেশ না করে, তাহার প্রতিবিধান কল্পে 'কসাক্' স্বরূপ কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইলেন। এইভাবে প্রায় তিন মাস যুদ্ধ চলিলে, শত্রুদিগের খাদ্য সামগ্রী নিঃশেষ হইল, তাহারা উদরের জ্বালায় অশ্বমাংস খাইতে আরম্ভ করিল! তাহাদের এই দুঃসময়েও সম্রাট-সৈন্য প্রত্যহ খণ্ডযুদ্ধে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিত।

একদা রজনীতে, শত্রু শিবির হইতে ভয়ানক গোলযোগ ও কোলাহল উত্থিত হইল। ইহার অল্পকাল পরেই প্রধান ইঞ্জিনিয়ার আলা-কুলী সম্রাটের তাম্বুর দ্বারে উপস্থিত হইল, সম্রাট তাহাকে গোলযোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুলী বলিলেন যে, তিনি অনুমান করেন, শত্রু-সৈন্য পলায়ন করিতেছে,' তাহাদের অস্ত্রাগারের অধিনায়ক রুমী খাঁ 'লিলি এবং 'মুজেনান' নামক দুইটী বৃহৎ কামান ফাটাইয়া ফেলিয়াছেন। এই কথোপকথনের সময় শত্রু-শিবির হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল যে, সুলতান বাহাদুর তাহার সেনা লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। সম্রাট সর্ব্বশক্তিমানকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন। পরে সম্রাট অশ্বারোহণে সুলতানের অনুসরণ করিলেন, পথিমধ্যে রুমী খাঁ তাঁহার সহিত যোগ দিয়া বলেন যে, তিনি বিপক্ষ পক্ষ ত্যাগ করিয়া সম্রাটের অধীনে কার্য্য করিতে আসিয়াছে।

সংবাদ আসিল সুলতান মালোয়া প্রদেশের মান্ডু দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন। বিজয়দৃপ্ত মোগল-সেনা তথায় অগ্রসর হইয়া দুর্গ অবরোধ করিল। কিয়দ্দিবস পরে সুলতান মান্ডু দুর্গ হইতে পুনরায় পলায়ন করিয়া চাম্পানীয়ারের সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে মোগল-সেনা মান্ডু দুর্গ অধিকার করিয়া তথায় বহুতর ধন রত্নাদি পাইল। সম্রাট তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বিপুল আগ্রহের সহিত সুলতানের অনুসরণ করিয়া গুজরাটের রাজধানী চাম্পানীরে উপস্থিত হইলেন এবং অচিরেই দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন। * এই অবরোধ সময়ে একদিন এক ব্যক্তি আসিয়া গোপনে সম্রাটকে জানাইল যে, সে একটী পর্ব্বতের শিখর দিয়া একটী সহজ পথ দেখাইয়া দিতে পারে। আগন্তুকের কথায় বিশ্বাস করিয়া সম্রাট গোপনে কেবল মাত্র দুইজন রণ-বাদ্যকর, কয়েকজন তুরী নিনাদকারী ও একদল সাহসী যোদ্ধা লইয়া শিবির ত্যাগ করিলেন

* See dow's History of Hindustan, Vol II, page 144 and also Edinburgh Gazetteer.

এবং অতি কষ্টে একটী পার্ব্বতীয় বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া দুর্গে প্রবেশলাভে সক্ষম হইলেন। সম্রাট অতঃপর রণবাদ্য বাজাইতে ও তূর্য্য-নিনাদ করিতে আদেশ করিলেন এবং সরদারগণ একত্রে চারিধার হইতে বিপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। অসতর্কিত বিপক্ষ সৈন্য এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া, পরিত্রাণের উপায় দেখিতে লাগিল, কয়েকটী বিপক্ষদল দুর্গ হইতে পলায়ন করিল, সুলতান বাহাদুরও ক্যাম্বের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এবম্প্রকারে সম্রাট এই প্রসিদ্ধ নগর ও উহার সমুদয় রসদাদি সহ স্বাধিকারে আনয়ন করিলেন কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও কোন ধনরত্ন পাইলেন না

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পর আলমখাঁ, নামক সুলতান বাহাদুরের একজন প্রধান কর্ম্মচারী সম্রাট সদনে আসিয়া কুর্নিশ করিলেন। ঐ নগরের ধনরত্নাদি কোথায় লুকায়িত আছে, তাহা বাহির করিয়া দিবার জন্য সম্রাটানুচরগণ আগন্তুককে বন্দী ও যাতনা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল কিন্তু সম্রাট বলিলেন,—"এই ব্যক্তি স্বইচ্ছায় আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, এখন তাহার উপর বল প্রয়োগ করা অসাধুতার পরিচায়ক। যদি নম্র ব্যবহারে কার্য্য উদ্ধার হয়, তবে রূঢ় ব্যবহার করিবার প্রয়োজন কি? তোমরা একটী প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন কর এবং তাহাকে মদ্য দ্বারা একবারে সংজ্ঞাশূন্য কর। তৎপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও এ নগরের ধনরত্ন কোথায় আছে?

সম্রাটের আদেশানুযায়ী একটী ভোজের আয়োজন হইল, সেই দিবস আলমখাঁকে অতিরিক্ত মদ্য পান করাইয়া প্রমত্ত করতঃ অনুচরগণ ধনরত্নের কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। আলমখাঁ মোগলের এই সাদর সমাদরে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিল, উক্ত প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসিত হইবা মাত্র তিনি বলিলেন—সম্রাট যদি সুলতানের ধনরত্ন লইতে ইচ্ছা করেন, তবে গোসলখানার জলরাশি অপসারিত করা হউক। এই সংবাদ সম্রাটকে জ্ঞাপন করা হইলে, তিনি তদনুযায়ী কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে আদেশ প্রতিপালিত হইতে চলিল, যখন মোগল ভৃত্য সকল ঐ কার্য্যে নিযুক্ত, আলমখাঁ তৎকালে তথায় যাইয়া বলিল যে, এভাবে কার্য্য করিলে পাওয়া যাইবে না। তিনি ভৃত্যদিগকে স্নানের স্থানের নিম্নে খনন করিতে উপদেশ দিলেন, তাহাতে একটী পয়ঃপ্রণালী ও একটী মুখ আচ্ছাদিত গর্ত্ত প্রকাশিত হইল। গর্ত্তের আচ্ছাদন উন্মোচন করতঃ জলরাশি নির্গত করিলে প্রচুর পরিমাণে ধনরাশি বাহির হইল। ঐ ধনরত্ন তৎক্ষণাৎ মোগল সেনাগণের মধ্যে বিতরিত হইল, প্রত্যেকে স্ব স্ব পদ মর্য্যাদা অনুরূপ ধন প্রাপ্ত হইল। তাহারা তৎপরে স্বর্ণ ও রৌপ্যে পূর্ণ একটী কূপ আবিষ্কার করিল। ঐ ধাতুদ্বয় গলাইয়া Ignot হইয়াছিল, সুতরাং তাহা সৈন্যগণ স্পর্শ করিল না।

সম্রাট তৎপর তার্দিবেগকে চাম্পানীরের অধিনায়ক করিয়া সুলতান বাহাদুরের অনুসরণে ক্যাম্ব অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রীগণ ছলনা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—

যে, এই অভিযোগের যাহা উদ্দেশ্য অর্থাৎ সুলতান বাহাদুরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করা, তাহা ভগবানের কৃপায় সম্রাটের সিদ্ধ হইয়াছে এবং প্রভূত ধনরত্নও হস্তগত হইয়াছে! এখন সৈন্যগণকে দুই এক বৎসরের মহিয়ানা দিয়া অবশিষ্ট টাকা ভবিষ্যতে প্রয়োজনের জন্য আনামত রাখা এবং সুলতান বাহাদুরকে আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ গুজরাট প্রদেশের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করি। ইহাতে সম্রাটের সদাশয়তা প্রকাশিত হইবে ও যশঃ সৌরভের গৌরব বর্দ্ধিত হইবে। এতদ্ব্যতীত সম্রাটের নিজের রাজ্যের অপর অংশের প্রতি বিশেষতঃ রাজধানী আগরার সুব্যবস্থা করার অবসর হইবে। কারণ তথা হইতে শুভ সংবাদ আসিয়াছে যে, মোহম্মদ জেমান সুলতান এবং আরো কতিপয় প্রধান প্রধান সরদার বিদ্রোহভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ অযাচিত উপদেশ শ্রবণে সম্রাট অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"তরবারির সাহায্যে এই মূল্যবান প্রদেশ পদানত করিয়া কি বৃথা ছাড়িয়া দিব? না, আমি ইহা রক্ষা করিব এবং দিল্লী সম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করিব।"

মন্ত্রীগণ যখন দেখিলেন যে, সম্রাট অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাদের পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না, তখন তাঁহারা যুবরাজ আসকারীকে (হুমায়নের ভ্রাতা) তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য লইয়া যাইতে এবং দিল্লী প্রদেশ আক্রমণ করিবার অভিসন্ধি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিতে ও উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। আসকারী তাঁহাদের পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন। এই সময়ে যুবরাজ যোজগার নাসির গোপনে চাম্পানীরের শাসনকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইয়া ব্যক্ত করিলেন যে, সম্রাট তাঁহাকে দুর্গের ও রাজ-কোষের ভার লইতে প্রেরণ করিয়াছেন। তার্দিবেগ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া সম্রাটের নিকট ঘটনা লিখিয়া পঠাইয়া আদেশ প্রার্থনা করেন। সম্রাট তৎক্ষণাৎ আদেশ করেন যে, দুর্গ ও ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ তুমিই করিবে। কিন্তু সম্রাট যখন বুঝিতে পারিলেন যে, মন্ত্রীগণই যুবরাজ ও সর্দ্দারগণকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে, এবং নানাস্থানে সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহার বলক্ষয় করিতেছে, তখন তিনি সৈন্যগণকে একত্রিত হইবার আদেশ দিয়া আহাম্মাদাবাদ (১) অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তিনি নানারকম বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া সুস্থ শরীরে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সম্রাট আগরায় প্রত্যাগমন করিলে সুলতান বাহাদুর সুরাটের পর্ত্তুগীজদিগের সহিত এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, এবং তাহাদেরই সাহায্যে ৬০০০ হাজার আবিসিনিয়ান ও নিগ্রো সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আহাম্মাদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন।

হুমায়নের গুজরাট অভিযানের মধ্যে যে বিদ্রোহীতা প্রকাশ পায়, তাহারই বিবরণ এখন লিপিবদ্ধ করিতেছি। সম্রাট যে সময়ে গুজরাট পদানত করিতে ব্যস্ত, মোহম্মদ জেমান সুলতান (তাইমুরের বংশধর (২)

(১) এখন গুজরাটের রাজধানী; ১৭৮০ ইংরাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।

(২) সুরাটের প্রসিদ্ধ সুলতান যোসেনের পুত্র। See Catalogue of Tipoo's Library.

ও ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের প্রিয় পাত্র) সম্রাটের অবর্ত্তমানে সুযোগ বুঝিয়া, ভাগীরথীর উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশ-সমূহ অধিকার এবং বেলগ্রামে নিজ আবাস নির্দ্দিষ্ট করেন। তাঁহার পুত্র আলেগমীর্জ্জা একদল শক্তিশালী সৈন্য লইয়া জোয়ানপুর কুরুরা এবং মানিকপুর প্রদেশ আক্রমণ করিতে প্রেরিত হন। আগরার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা সম্রাটের কনিষ্ঠ সহোদর যুবরাজ হিন্দল এই সংবাদ জ্ঞাত হইবামাত্র সসৈন্য কনোজ (Canowge) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুলতান মহম্মদও তাঁহার সেনাদল একত্রিত করিল, গঙ্গার উত্তর তীরে মোগল সেনার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিবার অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। উভয় পক্ষের সেনা দল এই স্থানে অনেকদিন অবস্থান করে। হিন্দলের চর কনোজের দশ মাইল উপরে গঙ্গার এক স্থানে অল্প জল দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলে যুবরাজ বিপক্ষের অলক্ষ্যে রজনীযোগে সৈন্য সামন্ত লইয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হইলেন।

রজনী প্রভাত হইলে উভয়পক্ষ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিম হইতে ভয়ানক ঝটিকা উত্থিত হইয়া ধূলিপটলে আকাশ মার্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, দিবাভাগে এমনি অন্ধকার হইল যে বিদ্রোহীগণ শত্রু ও মিত্র সহসা চিনিতে অক্ষম হইল। এমতাবস্থায় তাহারা জোয়ানপুর অভিমুখে পলায়নপর হইল। যুবরাজ হিন্দল বেলগ্রাম দখল করতঃ, বিপক্ষের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া অযোধ্যার সন্নিকটে আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু উভয় পক্ষই প্রবল হওয়ায়, খণ্ড যুদ্ধে অনেকদিন অতিবাহিত হয়। অবশেষে মহম্মদ সুলতান যখন শুনিলেন যে, সম্রাট সুস্থ শরীরে এবং নিরাপদে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তিনি আর বেশীদিন যুদ্ধ করিতে আশঙ্কা করিয়া, সপরিবারে বঙ্গদেশের নিকটবর্ত্তী কুচবিহার প্রদেশে পলায়ন করিলেন। যুবরাজ হিন্দল জোয়ানপুরে অগ্রসর হইয়া তৎপ্রদেশ অধিকার করিলেন।

অচিরেই সম্রাট নিরাপদে আগরা-প্রাসাদে উপনীত হইলেন। যুবরাজ হিন্দলও অনুচর সহ সমর-ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন। ইহারা সকলেই খেলাত প্রাপ্তে সম্মানিত হন। এই উপলক্ষে একটী প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন হয় এবং মহা সমারোহে যুবরাজ হিন্দলের উদ্বাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। যুবরাজ আস্কেরিড় তাঁহার সৎ স্বভাবের নিমিত্ত সম্বল জেলা প্রাপ্ত হন এবং তথা হইতে সমস্ত বিদ্রোহীদিগকে বহিস্কৃত করিয়া দিবার জন্য আদিষ্ট হন। এই সময়ে হুমায়ুন সংবাদ পান যে শের খাঁ আফগান, বেহারের ঝারখণ্ড জেলা নিজে অধিকার করিয়া বসিয়াছেন এবং প্রবঞ্চনা করিয়া রোটাসের * শক্তিশালী দুর্গ অবরোধ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড়নগর আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন, খুব সম্ভব অচিরেই তিনি উক্ত নগর অধিকার করিবেন।

এতৎ সংবাদে সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

* See History of Bengal Page 139.

বলেন,—"এই আফগান অবাধ্যতা-সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। এখন আমরা যাইয়া উহাদের হস্ত হইতে চুণার দুর্গ কাড়িয়া লইব।" তৎপর সম্রাট ঐ দুর্গ আক্রমণ সম্বন্ধেই ইঞ্জিনিয়ার রুমী খাঁর (সোলতান বাহাদুর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত) পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে রুমী বলিলেন,—"ভগবান অনুগ্রহ করিলে আমরা দুর্গ অধিকার করিতে পারিব।"

মোগল-সৈন্য আগ্রা হইতে যাত্রা করিয়া ৯৪৫ হিজরীর (১৫৩৮ খৃঃ অঃ) সোবেরাত দিনে চুণারের দশ মাইল দূরে আসিয়া পৌছিল। এখানে রুমী খাঁ বিপক্ষদিগের শক্তি ও সৈন্য সংখ্যা, দুর্গের কোন্ অংশ আক্রমণ ও কোথায় কামান পাতা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় জানিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার ফেলাফত নামক নিগ্রো ক্রীতদাসকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করেন যে, প্রত্যেক বেতের দাগ তাহার শরীরে সুস্পষ্টরূপে ফুলিয়া উঠে। অতঃপর তিনি তাহাকে বিপক্ষ শিবিরে পাঠাইয়া বলিতে বলিয়া দিলেন যে, সে শের খাঁকে যাইয়া বলিবে, সে রুমী খাঁর দাস। তাহার প্রভু বিনাদোষে নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে প্রহার করায় সে তাহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া এখানে কাজ করিতে আসিয়াছে। এই ভাবে যদি সে দুর্গে প্রবেশ করিতে পারে, তবে তথাকার সমস্ত বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিলে বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইবে।

ফেলাফত এই আজ্ঞানুসারে আফগান শিবিরে যাইয়া নিজের অবস্থা বর্ণন করিলে, আফগানেরা তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হইয়া দুর্গে লইয়া যায় এবং তাহার ক্ষতস্থান ধৌত করতঃ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেয়। ফেলাফত তথায় ব্যক্ত করে যে, সে ইঞ্জিনীয়ারীং কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী। যদি তাহারা অনুমতি করে তবে সে দেখাইয়া দিতে পারে, কোন্ স্থানে কামান পাতিলে শত্রুদিগকে সহজে অপদস্থ করা যাইতে পারে এবং রুমী খাঁর আক্রমণ হইতে রক্ষার নিমিত্ত দুর্গের কোন্ স্থান কি ভাবে সুরক্ষিত করা আবশ্যক, তাহাও সে বলিয়া দিবে।

তাহার প্রস্তাব গৃহীত হইলে, তাহাকে দুর্গ পরীক্ষা করিতে আদেশ করা হয়। * দুই একদিন পরে ফেলাফত রজনী যোগে পলায়ন করিয়া আসিয়া তাহার প্রভুর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া বলিল যে, নদীর তীরে সুড়ঙ্গ কাটিয়া তথা হইতে দুর্গ আক্রমণ করা উচিত এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান এইভাবে বেষ্টন করিতে হইবে যে, বাহিরের সহিত তাহারা কোনও সংশ্রব রাখিতে না পারে। এই প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রাপ্তে রুমী খাঁ নদীর তীরে বৃহৎ কামানগুলি সাজাইয়া দুর্গের চারিধারে বিভিন্ন সেনাপতির অধীনে বিভিন্ন বিভিন্ন সেনাদল রক্ষা করিলেন।

রুমী খাঁ দেখিলেন নদীর তীরে এমন উপযুক্ত স্থান নাই যেখান হইতে কামান

* ইুয়ার্ট বলেন,—"In the year 1763 the English attempted to take Chunar by storm but were repulsed: it afterwords capitulated," See Edinburgh Gazatteer.

লাগিয়া দুর্গের ভিতরের কোনও অনিষ্ট সাধন করা যাইতে পারে। তজ্জন্য নদীর উপর কাষ্ঠের মঞ্চ করিয়া কামান পাতিবার জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহাই করিতে সম্রাট আদেশ করিলেন। তদনুসারে তিনি তিনখানি নৌকা একত্র করতঃ তদুপরি একটী মঞ্চ নির্ম্মাণ করিলেন। এইভাবে প্রস্তত হইতে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। পরে ঐ ভাসমান মঞ্চ রজনী যোগে আফগান শিবিরের নিকট আনিয়া, দুর্গ আক্রমণের আদেশ বিঘোষিত হইল। কিন্তু বিপক্ষগণ এমনিভাবে বহির্ভাগ রক্ষা করিয়াছিল যে এই আক্রমণে তাহাদের কোন অনিষ্টই হইল না। সম্রাটের ভাসমান ব্যাটারি বিধ্বস্ত হইল এবং সাত শত মোগল-সৈন্য দুর্গের একটুমাত্র অনিষ্ট করিয়া মহানিদ্রায় অভিভূত হইল।

পরদিবস ভাসমান ব্যাটারি মেরামতের নিমিত্ত মিস্ত্রি নিযুক্ত হইল। অবরুদ্ধকারীগণ দেখিল যে, সম্রাট দুর্গ অধিকার করিতে একান্তই মনস্থ হইয়াছেন এবং তাহাদের সাহায্য প্রাপ্তির পথও নাই। কাজেই তাহারা জীবনের অনিষ্ট হইবে না এই সর্ত্তে আত্ম সমর্পণ করিতে সম্মত হইল।

এইভাবে দুর্গ অধিকৃত হইলে, রুমী খাঁ বন্দীগণের মধ্য হইতে তিনশত যোদ্ধা বাছিয়া তাহাদের হস্ত কাটিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। সম্রাট এই আদেশে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলেন যে, তাহারা জীবন নষ্ট হইবে না এই আশ্বাস পাইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে এখন এইভাবে তাহাদিগকে বিকলাঙ্গ করা অতি অবৈধ ও ঘৃণিত কার্য্য।

এই প্রধান দুর্গ অধিকার করিয়া সম্রাট একটী বৃহৎ খানার আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে প্রচুর আমোদ প্রমোদ ও বিলাস-সাগরের ফুয়ারা ছুটে। কর্ম্মচারীগণের পদোন্নতি ও সর্দ্দারগণ খেলাত প্রাপ্ত হন।

অতঃপর সম্রাট রুমী খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি ভাবে এই দুর্গ রক্ষা করিতে হইবে এবং কাহার উপর বা সেই ভার অর্পণ করা যায়। রুমী বলিলেন যে, বেগ মীরেক ব্যতীত দলের অন্য কোনও ব্যক্তির উপর এ কার্য্যের ভারার্পণ করা যাইতে পারে না। তদনুসারে সম্রাট মীরেককে দুর্গাধিপতি স্বরূপ নিযুক্ত করেন। কিন্তু অন্যান্য সর্দ্দারগণ রুমী খাঁর এই বিদ্রূপ ভাবের উপদেশ দানের জন্য এমনি অসন্তুষ্ট হন যে, অচিরেই রুমীর খাদ্যের মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়া তাহার জাগতিক রঙ্গমঞ্চের অভিনয় শেষ করেন।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

শ্মশানে। *

(১)

দু'ধারের কত জনকোলাহল,
কেউ হাসে, কেউ ফেলে আঁখিজল,
তার মাঝে তুমি নীরব অচল,
কা'রো পানে ফিরে চাও না।

* একটী অল্পবয়স্ক বালকের রচিত।

(২)

জাতিভেদ প্রথা নাহিক তোমাতে,
কা'রো মুখ তুমি ঢাকনা লাজেতে,
যে আসে যখন খেলার শেষেতে,
বুকে লয়ে নাশ' যাতনা !

(৩)

ওচিতা অনলে নাহি দেয় তাপ,
ও শিখা অনল নাশে যত পাপ,
অজ্ঞাত তোমার ছল-অপলাপ,
সবাই সমান আপন।

(৪)

ক্লিষ্ট অতিথী এসেছে দুয়ারে,
কণামাত্র স্থান প্রাণ জুড়াবারে
দে গো জননী দে গো দয়া ক'রে
দেখিব মরণ কেমন !

(৫)

খেলিতে খেলিতে খেলা ভেঙ্গে দিয়ে,
আধ খেলা ফেলে এসেছি চলিয়ে,
খেলীরা আমার আছে পথ চেয়ে
সে আধ খেলা বুকে ধরে !

(৬)

নীরব, প্রশান্ত, প্রগাঢ় শান্তি,
অচল, বিশাল তোমার মুরতি,
জাগায় গোপনে নশ্বরতা গীতি
শ্মশানবাসীর অন্তরে।

(৭)

লাগেনা ভাল ও গীতি আমার,—
আমার সংসার—সাধের সংসার,
সাধের মিলন—এমন কাহার ?
পিয়াসা এখনো মেটেনি !

(৮)

গান শিখায়েছে, সুর না দিয়াছে,
সুর পেনু যদি—গলা ভেঙ্গে গেছে,
কুসুম ফুটায়ে বাস কেড়ে নেছে,
মন-আশা সব পূরেনি !

(৯)

তাই আসিয়াছি সমাধির স্থানে,
যদি শান্তি পাই অশান্ত পরাণে,
সেই আশে মাগি অন্তিম শয়নে
সে কোমল হৃদি তাজিয়ে !

(১০)

মনে হলে বুক বিদরে সদাই,
তবু— তবু চিতা আজি তোরে চাই,
যদি পারি দেখি হৃদয় জুড়াই
তোর শিখা বুকে ধরিয়ে !

শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সতীন—

(১)

"যাও সই ! সন্ধ্যা হইয়াছে বাড়ী যাও"—এই বলিয়া সুশীলার সই মনোরমা আপনার বাড়ী প্রবেশ করিল। আসন্ন সন্ধ্যার অতি ঘন অন্ধকারে মনোরমার বসনের শেষ শুভ্র প্রান্তটুকু,পথহারা নাবিকের শুকতারার মত সুশীলার নেত্রপথের অন্তরাল হইলে কে যেন তাহাকে কোনও স্বপ্নসৃজিত সুখময় প্রদেশের হৃদয়-স্নিগ্ধকর বিস্মৃতি-মন্দির হইতে বেগে আকর্ষণ করিয়া বাস্তব জ্বালাময়ী পৃথিবীর ভীষণ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করিয়া দিল। সুশীলা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া

রহিল, সে যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল সে কোনও রূপবান নবীন যুবক নহে। রজনীর গাঢ় অন্ধকারই তার হৃদয়ের বাঞ্ছিত বৈভব। তাহার অন্ধকারাবৃত প্রাণটুকু যেন অন্ধকারাবৃত দেহ মধ্যেই সুস্থ থাকে। সে কাহাকেও দেখা দিতে চাহে না। যদি পারিত তবে বুঝি সে শর্ব্বরীর সমস্ত গহনাগুলি খুলিয়া তাহাকে বিধবা সাজাইয়া তাহার হৃদয়-মধ্যে আপনাকে লুকাইয়া রাখিত।

তাহার পর যখন মৃদুমন্দ পদক্ষেপে তাহার ক্ষুদ্র চরণের ক্ষুদ্র অঙ্গুলিগুলি পদে পদে পৃথিবীর কানে কানে কাতর প্রাণের মর্ম্মব্যথার কথাগুলি বলিতেছিল, তখন তাহার নয়নের প্রান্তদেশে দুই স্বর্গীয় অশ্রুবিন্দু তাহার হইয়া ধরণীকে একটু বিদীর্ণ হইতে অনুরোধ করিতে আসিল। সুশীলার একান্ত আত্মীয়-বর্গও যেন তাহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। নয়ন বলিল—সুশীলা! তোমার জন্য আর কত কাঁদিব? কর্ণ বলিল—সুশীলা! তোমার জন্য আর কত-দিন এ তিরস্কার সহ্য করিব? কোমল অঙ্গগুলি ঢুলিতে ঢুলিতে বলিল—এই দেখ, আমি বড় অবসন্ন, এরূপ নিত্য-নির্য্যাতনে আমি আর কত দিন দাঁড়াইতে পারিব? সুশীলা বলিল—তোমরা বিদায় হও আমি তোমাদের পশ্চাৎ আসিতেছি।'

সুশীলা শৈশবে বড় আদরিণী ছিল, তাহাকেই কৈশোরে এত দুঃখিনী হইতে হইয়াছে। আদরের পরিণাম দুঃখ, ইহা কোন্ ঈর্ষাকাতর অথর্ব দেবতার অভিশাপ—জানি না। একদিন পূর্ণিমা রজনীর অবসান হইতে না হইতে সুশীলার পিতা জ্যোৎস্না-প্লাবিত ধরণীর অঙ্ক হইতে মহা প্রয়াণের পথ-যাত্রী হইলেন। সুশীলার জননী সেই তীর্থবন্ধুর বিরহে আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না। শোকে অনিদ্রায় অনাহারে তাঁহার জরাজীর্ণ দেহখানি ক্রমে লুটাইয়া পড়িল। একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি সুশীলার সুন্দর বিষাদ-কাতর মুখখানি বুকে লইয়া দেখিতে লাগিলেন। দুই ফোঁটা অশ্রু পড়িলে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন—সেই শেষ।

সুশীলা তাহার খুল্লতাত গৃহে আশ্রয় পাইল। তাহার পিতৃসম্পত্তি ও প্রভুকন্যা সুশীলার সহগমন করিল। সুশীলার খুড়ী-মা হৈমবতী বড় সুক্ষ্মদর্শিনী। তিনি জানিতেন, আদরে ও সোহাগে পরকাল নষ্ট হয়। সেই জন্য নিজের পরকালের আগে সুশীলার পরকাল রক্ষায় আত্মসমর্পণ করিলেন।

লঘু পাপে গুরু দণ্ড, কঠোর তিরস্কার ও অজস্র প্রহার, এই সব বর লইয়া যখন তিনি সুশীলার সম্মুখীন হইতেন তখন তাহার অঙ্গ হিম হইয়া পড়িত; কোন দিন বা ভূমিবিলুণ্ঠিত ধূলিধূসর কেশাবৃত মস্তকে তদীয় স্নেহময়ী খুড়ী-মার অলক্তকরাগ রঞ্জিত,বহু বয়োভূষিত মলযুক্ত শ্রীপদের দারুণ আঘাত সুশীলার কল্পিত কপট মূর্চ্ছার প্রতিকারার্থ প্রযুক্ত হইত। আহার্য্য ও পানীয়, বেশ ও ভূষা, বিশ্রাম ও নিদ্রা এ সকল সুশীলার শত্রু; তাই তাহার হিতৈষিণী খুড়ী-মা সযত্নে ঐ সমস্ত সুশীলার নিকট হইতে দূরে রাখিতেন। এইজন্য সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে সেদিন সুশীলা ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে বাড়ী ফিরিতেছিল।

২।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" একথা অমঙ্গলের ক্ষেত্রে ঠিক খাটে। সুশীলার ভাবনাও সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তাহার বাটী প্রত্যাগমনের ঈষৎ বিলম্বে ধৈর্য্যহীনা হৈমবতী তীব্র ক্রোধানলে রমণী-হৃদয়ের শেষ স্নেহসূত্র-টুকু আহুতি দিয়া, দক্ষিণা স্বরূপ সহস্র মুষ্টিমুদ্রা দান করিয়া সুশীলাকে গৃহে বরণ করিয়া লইলেন। সুশীলার রূপ-গুণও সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। তাহার আনত, অতি পরিস্ফুট, কৃষ্ণ পল্লবাবৃত বিষাদ-ম্লান নেত্রদ্বয়ের চঞ্চল তারা দুটী দেখিয়া ও তাহার নির্য্যাতনের কথা শুনিয়া গ্রামস্থ শিক্ষিত জমিদার-পুত্র অমরেন্দ্র বিনাপণে সুশীলার পাণিগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। অমরেন্দ্রের পিতা ও মাতা ইহাতে যে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নহে। মাতা জগৎলক্ষ্মী বলিলেন—"তা হউক, অমরেন্দ্র যদি সুখী হয়, আমাদের তাহাতেই সুখ। বধূ যদি স্বামী সোহাগিণী হইয়া কপালের সিন্দুর রাখিয়া, হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, আমরা সাবিত্রী সত্যবান দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইব, টাকার কাজ কি? পিতা হরচন্দ্রও সেই মতে মত দিলেন। হৈমবতীর কিন্তু তাহা অনুমোদিত হইল না; যেহেতু তিনি সূক্ষ্মদর্শিনী; ধনি-গৃহে সুশীলার বহু-যত্ন-সাধিত শরীর আলস্যে নষ্ট হইয়া যাইবে। বিলাসে আত্মহারা হইয়া পড়িবে। বিলাসে আত্মহারা হইয়া পরম শত্রু অহঙ্কারের অন্ধকারে পরকাল হারাইয়া আবার কি ভীষণ নরকে ডুবিবে? আদরে ও সোহাগে সেই চির-পীড়িত হৃদয় যদি গলিয়া যায়, তবে সুশীলার তখন আর কি উপায় থাকিবে?

সুশীলার খুল্লতাত তত প্রখর-বুদ্ধি ছিলেন না। সেই জন্য সুশীলার বিবাহ-সম্বন্ধ-সংবাদে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া কৃতজ্ঞতার পবিত্র কুসুম-রাগে হৃদয় ও নেত্রকে রঞ্জিত করিয়া যখন তিনি জমিদার হরচন্দ্রের সহিত দেখা করিলেন, তখন হরচন্দ্র বলিলেন—"তোমার স্ত্রী বলিয়া পাঠাইয়াছেন, প্রজার দ্রব্য জোর করিয়া লইলে জমিদার মহাপাতকে নরকগামী হইবেন। সুশীলাকে যদি অমরেন্দ্রের সহিত বিবাহ দিতে হয়—তবে তাহা ভয়ে,—স্বেচ্ছায় নহে।"

গৃহে প্রত্যাগমন করিলে হৈমবতী স্বামীর মস্তিষ্ক পরিষ্কার করিয়া দিলেন, বুঝাইয়া দিলেন যে ইহাতে সুশীলার ত সর্ব্বনাশ হইবেই, উপরন্তু জমীদারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহারাও বিপদগ্রস্ত হইবেন। সুশীলার পিতৃ সম্পত্তি ও জমীদারী লইব মনে করিলে—কে তাহাকে ক্ষান্ত করিবে? সুতরাং সে বিবাহে লুচি সন্দেশের আশা আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইল। পাঠিকারা লুচি সন্দেশ অপেক্ষা দুটী পবিত্র হুলুধ্বনি, দুই একটী কর্ণ মর্দ্দন ও গুটি কয়েক হাস্য পরিহাসের আশা করিয়া ফিরিয়া চলিলেন—এই দুঃখ। তা হউক, সুশীলা বাঁচিয়া থাকিলে সে আশা তাঁদের এক দিন পূর্ণ হইবে।

মন্মথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী মাধবিকা অনেক জেদ করিয়া ও মা বাপের অমঙ্গল ভয় দেখিয়া পিতৃ-গৃহে যাত্রা করিলেন। মন্মথবাবু বলিয়া দিলেন, "দেখ, যেমন নিজের ইচ্ছায়

যাইতেছ, তেমনি নিজেই আসিতে হইবে; কেহ আনিতে যাইবে না।"

মাধবিকা বাড়ী গিয়া সব কথা মাতাকে বলিলেন। মাতা মাধবিকার পিতাকে বলিলেন। তিনি বলিলেন "দেখা যাইবে।"

তাহার পর সুদীর্ঘ একটী বৎসরের মধ্যে মন্মথবাবুর বা তাঁহার জননীর কোন পত্র আসিল না। একদিন একখানি পত্র আসিল। সকলেই শুনিল—মন্মথবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ হইতেছে। ইহা তাহারই নিমন্ত্রণ পত্র। মাধবিকা পিতাকে বলিল—"আমাকে শ্বশুর বাড়ী যাইতে হইবে।" পিতা বলিলেন—"লইতে আসে, যাইতে পার। না ডাকিলে পাঠাইতে পারিব না।"

নির্ব্বিঘ্নে সুশীলার সহিত মন্মথবাবুর দ্বিতীয় বার বিবাহ হইয়া গেল। হৈমবতীও নিজ হইতে কিছু খরচ করিলেন না। তবে তিনি জানিতেন—সুশীলার এখানে পরকাল নষ্ট হইবে না; তাহার শাশুড়ীকে তিনি বেশ জানিতেন।

অল্পদিন পরে সুশীলার দ্বিরাগমনের দিন ধার্য্য হইল। সুশীলা পাল্কী আরোহণ করিয়া শ্বশুর বাড়ী চলিল, আর একজন কে অদৃশ্য হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিনা আবাহনেই তাহার শ্বশুর বাড়ী প্রবেশ করিলেন। ইনি কে? পাঠকগণ ইহাকে জানেন;—শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্ব দিন ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ইনিই তাঁহাকে বনে পাঠাইয়াছিলেন।

অভিমন্যুর রণ-কৌশল-পরাজিত সপ্তরথী যুদ্ধে পলাইয়া যাইলে, ইনিই তাহাদিগকে বীর-হেয়-কৌশলে অভিমন্যুর লীলাভিনয়ে যবনিকা পাত করাইয়া ছিলেন। ইনি সেই ভাগ্য-দেবী। সর্ব্বত্র নিরাপদে ইঁহার গতি বিধি। শৈশব-সহচরী সুশীলার সঙ্গত্যাগ তাঁহার অসাধ্য। তাই তিনি সুশীলার সহিত আসিলেন। মন্মথবাবু ও তাহার জননী নিত্যকালী দেখিলেন, এ শুধু হাতে, শুধু পায়ে বৌ আসিয়া দাঁড়াইল। হৈমবতী বেয়ানকে যে পত্র দিয়াছিলেন—তাহাও লঙ্কার রসে ও বিষের কালিতে লেখা ছিল। তখনও তৈজসাদি রাখিবার জন্য পুরাতন সিন্দুক মেরামতের খরচ—দেনা আছে।

বৈকালে প্রতিবাসিনীগণ দ্বিরাগমনের দ্রব্যসম্ভার দেখিতে আসিয়া টীকা টীপ্পনি অনেকেই কাটিলেন। পূর্ব্ব বধূ মাধবিকার কথা, তাহার রূপ-গুণের কথা, তাহার পিতার উদারতা ও অশেষ গুণগরিমার কথা তখন সেই স্থানে বেশ জাগিয়া উঠিল। নিত্যকালীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল; হায়! কেন তিনি সোণার লক্ষী পায়ে ঠেলিলেন। আর সুশীলা—সে আর কি করিবে? মৃণালচ্ছিন্ন আতপক্লিষ্ট কমলের ছিন্ন দলের মত এক পার্শ্বে ঘোমটা দিয়া বসিয়া রহিল। তাহার উপরেও চূড়ান্ত বচনোক্তি চলিতে লাগিল। আবার সুশীলার নয়নদ্বয়ও তখন তাহাকে বলিল,—"সুশীলা! আমরা কি তোমার জন্য চিরদিনই কাঁদিতে আসিয়াছি?" ক্রমাগত সপ্ত রাত্রির নানাবিধ স্তব-স্তুতি ও ভ্রুকুটী গর্জ্জনেও সুশীলাকে হাস্য পরিহাসে বা বিশেষ আমোদ উৎসবে বিরত দেখিয়া মন্মথ একদিন স্বীয় জননীকে বলি-

লেন, "সুশীলা একবার পিতৃ গৃহে যাইতে চাহে, মাধবিকাকে আনাও।" সুশীলা কোন কথা বলে নাই, স্বামী সেবাতেও তাহার বিশেষ ত্রুটী ছিল না। কিন্তু তাহার বিষাদ-ম্লান আননে হাস্যের ফুটন্ত রেখা কেহই দেখিতে পাইত না। আমোদ আহ্লাদে বিরত, সদা সর্ব্বদা বিষণ্ণমনা পত্নীকেই বা কে ভালবাসে?

তাই সুশীলার পরিবর্ত্তে মাধবিকার আনয়নের ব্যবস্থা হইল জননী নিত্যকালীরও সেই ইচ্ছা; কেবল মনমথের ভয়ে এতদিন কিছু বলিতে পারেন নাই। সুতরাং এতদিনে সুশীলা আবার তাহার বড় সাধের পিতৃ-গৃহে চলিল। কিন্তু কৈ সেই জন্মভূমির সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি কই? সেই কমল দীঘির কাল জলের সেই শীতালতা কৈ? তাহার প্রাণের সঙ্গিনী মনোরমাও পিতৃ-গৃহে চলিয়া গিয়াছে!

এখন হইতে যে দুর্দ্দিনের তপন তাহার অদৃষ্টাকাশে উদয় হইল তাহা বড়ই ভয়ানক। যদিও গৃহ-কার্য্যে তাহার সহায়তা ভিন্ন হৈমবতীর দিন চলা কঠিন হইত, তথাপি সেই চির গলগ্রহ পরিত্যক্তা মন্দভাগিনীর অনন্ত গুণ কীর্ত্তনে ও অজস্র লাঞ্ছনা প্রদানে হৈমবতীর বিশ্রাম ছিল না। সুশীলা কাঁদিতেই আসিয়াছে কাঁদিয়াই ফিরিয়া যাইবে, তথাপি সূতিকাগৃহে দারুণ বিধাতৃ-লিপি খণ্ডন হইবার নহে। কেহ সহানুভূতি দেখাইতে নাই—কেহ অশ্রু মুছাইতে নাই। সম্মুখে, পশ্চাতে চতুর্দ্দিকে কেবল লাঞ্ছনার ভৈরবী মূর্ত্তি তাঁহাকে ঘেরিয়া রহিল। যৌবনের কামনা, জীবনের আশা সবই তাহার নির্য্যাতনের দাসী হইয়া রহিল, মরণোন্মুখী হৃদয়ের কোমল মর্ম্মস্থল নিদাঘের মরুভূমিতে পরিণত হইল। সাধের সুশীলাকে শোকের চিরচ্ছায়াসে পতিত হইতে হইল। হায়! সুশীলাকে কেহ বলিয়াও দিল না—মরণের পথ কোথায়?

মাধবীকাকে মন্মথ প্রকৃতই ভালবাসিতেন। তিনি যে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন তাহাও সেই ভালবাসার উৎকৃষ্টতা ব্যঞ্জক। আসক্তি যত বেশী অভিমানও তত দৃঢ় হয়। রাধিকা-রমণ শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জন। কল্পনা ক্ষেত্রে দেখিয়া ভক্তের হৃদয় ফাটিয়া যায়। কৃষ্ণ প্রেমময়ী রাধিকার কৃষ্ণের সেই কাতর বিলাপে ভ্রুক্ষেপ নাই। দুর্জ্জয় অভিমানের ফল প্রবল অনুতাপ সেই অনুতাপানলে পুড়িয়া, অভিমান প্রেমে পরিণত হয়।

সেইজন্যই সুশীলা ফিরিয়া গেল; মাধবিকার পুনরাগমন হইল।

মাধবিকা বুঝিল সে বড় নির্দ্দয়ের কার্য্য করিতেছিল। পতির প্রেম ও পতির দুঃখ স্বামী-সোহাগিনী অবহেলা করে না, মন্মথও নিজের ত্রুটী দেখিতে পাইল।

সংসারে এরূপ উভয়েই একটু বুঝিবার ত্রুটীতে, একটু কর্ত্তব্যের ত্রুটীতে কত সর্ব্বনাশ হয়, ভ্রমর ও গোবিন্দলাল তাহার সাক্ষ্য দিবে। যখন মন্মথ ও মাধবিকা উভয়েই ঐরূপ উভয়েরই ভ্রম ও অন্যায় দেখিতে পাইল, তখন তাহাদের মনের ভিতর একটা তীব্র অনুরাগ আসিয়া বদ্ধমূল হইল। উভয়েরই প্রেমরস আরও উজ্জ্বল হইয়া

উঠিল। সুশীলাকে বলিদান দিয়া তাহার মর্জ্জা দ্বারা তাহাদের অনুরাগ-প্রদীপের শিখা ঊর্দ্ধ-মুখী হইয়া উঠিল। মাধবিকা তাহা বুঝিয়াছিল; কিন্তু সে কি করিবে? মন্মথের হৃদয়ে তাহার স্থান হয় নাই; কারণ সুশীলা অপ্রেমিকা; সুশীলা অবাধ্যা, সুশীলা পত্নিত্ব-পদের সম্পূর্ণ অযোগ্যা। মাধবিকার একবার সুশীলাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। সপত্নীকে দেখিতে কি ইচ্ছা হয় না? সপত্নীগণই তাহা বলিতে পারেন। মন্মথ ও তাহার জননী, মাধবিকার সে বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেও মাধবিকার প্রবল অনুরোধ এড়াইতে পারিল না। স্বস্ত্যয়ণ উপলক্ষ করিয়া তিন দিনের জন্য সুশীলাকে আনিতে পাঠান হইল। যে পরিচারিকা গেল মাধবিকা তাহাকে বলিয়া দিল, যেরূপে হউক সুশীলাকে আনিতে হইবে। কেন? দুর্দ্দাশাপন্ন শক্রকে—উপেক্ষিতা সপত্নীকে দেখিতে ও তাহার ক্ষতাক্তে লবণ প্রক্ষেপ করিতে কি? সুশীলা কি করিবে? সেই মূঢ়া সরলা বিষাদিনী বালিকার কর্ত্তব্য কি? তুমি মানিনী পাঠিকা, তুমি বলিবে একগাছি সম্মার্জ্জনী পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু তুমি যদি তোমার ঐ মনকে ঐ অহঙ্কারের আবর্জ্জনাপূর্ণ মরুভূমিকে স্বামী-প্রেমের সুশীতল চন্দ্রালোকে আলোকিত কর, তবে দেখিবে তুমি তোমার, না স্বামী তোমার? তুমি স্বামীকে পাইয়া সুখী হও; না স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সুখী হও? তুমি তোমার স্বামীকে তোমার শ্রীচরণে বাঁধিয়া রাখিতে চাও, না স্বামীর স্নিগ্ধ চরণ ছায়ায় তুমি লুকাইয়া পড়িতে চাও?

সুশীলাও সেই সর্ব্বতীর্থসার পতিপদের উদ্দেশে যাত্রা করিল। সে তাহার বাঞ্ছিতের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া আসে নাই। যাহা দেখিয়াছিল, তাহাও ভাল করিয়া মনে নাই। তাহার সুদীর্ঘ ভবিষ্যজ্জীবনে একমাত্র ধ্যেয়, একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র শান্তি-সুখ আশা ও বৈভব সেই শান্ত,হৃদয়-সর্ব্বস্ব পতিমুখের ছবিখানি আর একবার হৃদয়-মন্দিরে আঁকিয়া আনিতে চলিল। হউক না কেন তিন দিনের জন্য, হউক না কেন সে মুখকমল সপত্নী কণ্টক সমাবৃত, হউক না কেন সে কাল ভুজঙ্গিনী পরিবেষ্টিত—সুশীলা চলিল। সে জানিত এই তাহার শেষ স্বামী-দর্শন। সে বুঝিয়াছিল সপত্নী নির্য্যাতনই যে আবাহনের মূল উদ্দেশ্য, সে ভাবিয়াছিল—তাহার দুঃখের উজ্জ্বলতম দিনমণি সপত্নীর গৃহে তাহাকে ভস্মীভূত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাই ধীরে ধীরে অতি ধীরে একটী গভীর অন্তঃস্থল-নির্গত দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত সান্ত্বনাপ্রদ মাতৃ-নাম উচ্চারণ করিয়া সে যাত্রা করিল। সুশীলা আসিবে কিছুক্ষণ পরে মাধবিকা তাহাকে দেখিতে গেল; সে ঘরে আর কেহ ছিল না। মাধবিকা দেখিল সুশীলার চক্ষু দুইটি ছল ছল, মুখখানি ম্লান। মাধবিকাকে দেখিয়াই সুশীলা বুঝিল—ইনিই তাহার সপত্নী। একবার ভয়ে ভয়ে বিষাদ-পূর্ণ-লোচনে সুশীলা সপত্নীর দিকে তাকাইল। দেখিল বড় সুন্দর। মাধবিকাও সেই সময় দেখিল, সুশীলার মুখ খানি বড় সুন্দর।

সুন্দরে সুন্দরে, মধুরে মধুরে, এ মধুর মিলনে

কেন হলাহল উঠে? রমণীর হৃদয়, শিশুর হাঁসি, এই সব যে প্রেমময় বিধাতার স্বর্ণময়ী প্রতিমার সোহাগ-সৃজিত প্রেমোদ্যানের প্রীতি-কুসুম। সুশীলা যখন মুখ নামাইল তখন চারিটী নয়ন হইতে চারি বিন্দু অশ্রু পৃথিবীকে যুগপৎ আলিঙ্গন করিল, তন্মধ্যে দুই বিন্দু অশ্রু যে পবিত্রতা লইয়া আসিয়াছিল, তাহার স্পর্শে পৃথিবীর রেণুগুলি পবিত্র হইয়া গেল। আর সেই অশ্রু-বর্ষিনী মাধবিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র কন্দরটী সহানুভূতির মৃদু ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর খাদ্য ও বসনাদি আনিয়া যখন মাধবিকা তাহার পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধাতৃষ্ণাকাতর সপত্নীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল, তখন সেই পূত-সলীলা করুণা জাহ্নবীর পবিত্র স্রোতে পৃথিবী ধন্য হইল: আর সুশালা সেই স্রোতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া কৃতার্থ হইল।

(৬)

সে দিন আর দিন যায় না। অপরাহ্ণ হইতে সুশীলাকে সাজাইতে সাজাইতে মাধবিকা বাহিরে আসিয়া দিবাকরের দিকে তাকাইয়া অনেকবার কি বলিয়া দিল। তখন রোষারুণ নেত্রে দিবাকর সারথীর প্রতি তাকাইলেন। সারথী স্বর্ণ-বেত্রে সপ্তাশ্বকে প্রহার করিল, রথ অচলান্তরে চলিয়া গেল। বিহঙ্গ কুল সপ্তাশ্বের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিল।

রাত্রি প্রহরাতীত হইলে মন্মথ শুইতে আসিল। শয্যা প্রান্তে অবগুণ্ঠানাবৃতা সুশীলা বসিয়া আছে, মাধবিকা নীচে বসিয়া পান সাজিতেছে। মন্মথ মাধবিকাকে জিজ্ঞাসা করিল 'ও কে? ও কেন?" মাধবিকা সুশীলার অবগুণ্ঠন ঈষৎ মোচন করিয়া মন্মথকে বলিল "দেখ, দেখি, কেমন সুন্দর!"

মন্মথ। না, তাহা হইবে না!

মাধবিকা। কেন হইবে না? হইতেই হইবে। এ সরলা অভাগিনীর মর্ম্মচ্ছেদী দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে আমার সর্ব্বস্ব ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমি ভাসিয়া যাই সেও ভাল; তবু আমার সর্ব্বস্ব, তোমাকে ভাসিতে দিব না। তুমি সুশীলারও সর্ব্বস্ব, সে ছাড়বে কেন? তাহার আর কে আছে? তাহাকে বঞ্চনা করিলে আমিও তোমাকে পাইব কেন। তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার কথা রাখিবেই। যেটুকু স্নেহ আমার জন্য তোমার হৃদয়ে আছে। পায়ে ধরি তাহার অর্দ্ধেক দিয়া এ অভাগিনীকে রক্ষা কর।

মন্মথ। একি মাধবিকা? তুমি কে? তুমি কি কোনও মূর্ত্তিমতী দেবী আমাকে ছলনা করিতেছ?

মাধবিকা। তোমার আদরেই আদরিণী তোমারই দাসী আমি। আমাকে বড় ভালবাস তুমি আজও বাসিবে নাকি? যদি দোষ করিয়া থাকি,তুমি গুরু—ক্ষমা কর,আবার পায়ে ধরিয়া বলি, এস আমরা সুখে এ ক্ষুদ্র জীবন নদী পার হইয়া যাই, তুমি এনদীতে নৌকা ডুবাইও না।

(৭)

মরা গাঙ্গে বান ডাকিল। বিধাতার আশীর্ব্বাদ সকলকে ডাকিয়া বলে "তোমার কল্যাণ হইবে এই অমৃত ফল গ্রহণ কর।" যে শুনিতে

পায়, যে গ্রহণ করে সেই কৃতার্থ হয়—তাহার পদার্পণে পৃথিবী ধন্য হয়।

সুশীলা ও মাধবিকা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী মন্মথের গৃহ আলোকিত করিল, সে আলোকে তাহার জননী নিত্যকালীও দেখিল, মধুরে মধুর-মিলন।

সুশীলা একদিন মাধবিকাকে জিজ্ঞাসা করিল "দিদি যে স্বস্ত্যয়ন জন্য আমাকে আনাইলে, তাহা কবে হইবে ?

মাধবিকা। তাহা ত যেদিন তুমি আসিয়াছ, সেই দিনই হইয়াছে।

সুশীলা। তা বটে! কিন্তু তুমি আমার কে ?

মাধবিকা। কেন, তোমার সতীন।

সুশীলা। আমার সতীন ? হাঁ আমারইত বটে। নতুবা আমার জন্য এ নরমেধ যজ্ঞ কে সাধনা করিত। কিন্তু সতীন কি এমনই ?

মাধবিকা—

যাহারা এক পতির পত্নী, তাহারাই সপত্নী পত্নী বলিয়া যে গৌরব করে, সপত্নীকেও তাহারা সহোদরা ভাবে, আর যাহারা মনে করে পতি তাহাদের বিলাসের সামগ্রী, পতি তাহাদের নিজের ধন, তাহারাই সপত্নীর প্রতি ঈর্ষা পরায়ণা।

সুশীলা। এ সব কিছু বুঝি না। তবে জানি তুমি মানবী নও। তোমার দাসী হইয়া, তোমার চরণধূলিতে এ হৃদয় রঞ্জিত করিলে যদি এ হৃদয় তোমার মত হয়। যদি কখন এ হৃদয় হইতে অনাথা-পতিতার উদ্ধারের জন্য সমস্ত রক্তবিন্দু স্নেহের জলে পরিণত হয়, তবে সে তোমারই আশীর্ব্বাদ। আর জন্মান্তরে যদি কিছু কামনা থাকে, তবে তাহা তোমারই মত 'সতীন।

জাপান মহিলার পাতিব্রত্য।

কেহ কি বলিতে পারেন অসভ্য জাপান আজ এত উন্নত কেন, কেন আজ জাপানের বলবীর্য্য দেখিয়া পাশ্চাত্য জগৎ স্তম্ভিত। ইহার মূলে যে নিশ্চই কোন ধর্ম্মভাব নিহিত রহিয়াছে ; কোন নিগুঢ় ধর্ম্মভাবই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম ভিন্ন জাতীয় জীবনে উন্নতির আর অন্য আশা নাই। হিন্দু যে একদিন উন্নতির চরম সীমায় উঠিতে পারিয়াছিল, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিয়াছিল। এই ধর্ম্ম ভাবই তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ। আজ সেই ধর্ম্মভাব পরিবর্জ্জিত হইয়া, ধর্ম্মের ভিত্তি এত শিথিল হইয়া হিন্দু জীবনে এত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। নগণ্য জাপানও এতদিন পরে কেবল ধর্ম্মভাবে অণুপ্রাণিত হইয়াই জাতীয় জীবনের ভিত্তিমূল এত সুদৃঢ় করতে পারিয়াছে। সে ধর্ম্মভাব আর কিছু নহে, জাপান কুল লক্ষ্মীগণের ধর্ম্মশীলতা ও পাতিব্রত্যই ইহার মূলীভূত কারণ। এক দিন এই পরাধীন ভারত যাহার বলে সমগ্র পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, এক দিন পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম-নীতির অনুসরণ করিয়া যে ভারত ললনা জগতে পূজনীয়া হইয়াছিলেন। আজ জাপান রমণীগণ সেই সতীত্ব তেজে আপনাদের স্বামী পুত্রকে এতদূর সতেজ করিয়াছে যে, মুষ্টিমেয় হইয়াও তাহারা প্রবল পরাক্রান্ত রুষ জাতিকে অনায়াসে যুদ্ধে পরাজিত করিল, তাই আজ তাহারা জগতের ইতিহাসে ধন্য ও বরেণ্য হইয়া রহিল। অন্নবলে জাপা-

নের ন্যায় নগণ্য জাতি প্রভূত বিক্রমশালী রুষিয়ার রণবাহিনীর গতিরোধ করিতে পারে নাই। একমাত্র জাপানে কুললক্ষ্মীগণের জলন্ত সতীত্ব তেজেই তাহারা এক্ষণে পৃথিবীস্থ অপরাপর জাতির অগ্রগণ্য হইতে পারিয়াছে. আর সেই জন্যই আজ কাল পৃথিবীস্থ সকল জাতিই তাহাদের বহুবিধ প্রশংসা করিয়া থাকে। জাপানের এই অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের এরূপ জাতীয় অভ্যুদয় দেখিয়া মনে আনন্দও হয়, আবার আমাদের পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া হৃদয়ে দারুণ ক্ষোভেরও উদয় হইয়া থাকে। একদিন আমাদেরও এইরূপ তেজোদীপ্তি সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিল, একদিন স্ত্রীজাতির সতীত্ব গুণে আমরাও দুরন্ত যবনগণকে চমকিত করিতে পারিয়াছিলাম। সেই পুণ্যবতী রাজপুত ললনাবৃন্দের অমানুষিক সতীত্বতেজে এককালে এই হতভাগ্য জাতিকেও উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ করিয়াছিল। জাপান আজকাল আর অসভ্য বর্ব্বর আখ্যায় আখ্যায়িত হইবার জাতি নহে, আজ তাহারা ধর্ম্মবলে আদর্শ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুর ত্রিকালদর্শী, ঋষিগণ সংহিতা শাস্ত্রে যে স্ত্রীনীতি গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; আমাদের সেই অরুন্ধতী, দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী, প্রভৃতি রমণীগণ যে নীতির অনুসরণ করিয়া দেবীরূপিণী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় আদর্শ প্রতিমা আমরা এখন পূজা করিয়া থাকি। রাজপুতনা একদিন যে নীতি অনুসরণ করিয়া সমগ্র মেদিনী প্রকম্পিত করিয়াছিলেন, জাপান আজ সেই নীতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, সেই আর্য্যঋষি প্রদর্শিত পথের পথিক হইয়া বলবীর্য্যে এত উন্নত হইয়াছে। বিবি ইসাবেলা "Unbeaten tracks in Japan" নামক গ্রন্থে জাপানী স্ত্রীর যে চরিত্র চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, কিছুদিন হইল বঙ্গবাসীতে যাহার কতক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল, আমরা সেই জাপানী-স্ত্রী চরিত্রের কয়েকটী নীতি কথা আজ পাঠকবর্গের গোচর করিব—

(১) জাপানে প্রত্যেক বালিকার যোগ্য বয়সেই বিবাহ দিতে হইবে। জাপানী-পিতা মাতা,—নিজ পরিবার, আত্মীয় স্বজন-বংশে কন্যার বিবাহ দিতে পারিবে না।

(২) জাপানী পিতা মাতা,—পুত্র অপেক্ষা কন্যার শিক্ষাবিধানে ও চরিত্র-গঠনে বিশেষরূপ মনোযোগী হইবেন; কেননা, কন্যাকে শ্বশুর-শাশুড়ীর, স্বামীর এবং তাঁহাদেরই অন্যান্য পরিজনবর্গের অধীন ও মনোমত হইয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

(৩) সুন্দরী অপেক্ষা সুচরিত্রা হওয়াই জাপানী রমণীর উৎকৃষ্ট গুণ। পতিব্রতা, সুশীলা সুধীরা, বশীভূতা স্ত্রীই জাপানী সংসারের আনন্দরূপিণী। উচ্চহাসিনী, উচ্চভাষিণী, কলহপ্রিয়া, প্রগলভা. কর্কশা, ব্যাপিকা, গৃহকুৎসা-ব্যক্তকারিণী, অধীরা, উগ্রা কামিনী জাপানী সমাজবিধি অনুসারে পরিত্যজ্যা।

(৪) জাপানী স্ত্রী কখন কোন কুকথা শুনিবে না; কু দৃশ্য দেখিবে না; আত্মীয়-কুটুম্ব পুরুষকেও হাতে তুলিয়া কোন দ্রব্য দিবে না; একাসনে বসিবে না;—একত্র পথ চলিবে না,—একত্র বস্ত্র রাখিবে না; শৈশব

অবস্থা হইতেই পুরুষের সংসর্গ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে শিক্ষা করিবে। জাপানী পিতা মাতা,—কন্যার বাল্যকাল হইতেই তাহাকে এই সকল নীতিশিক্ষায় শিক্ষিত করিবে।

(৫) কোন জাপানী বালিকাই স্বেচ্ছায় স্বয়ংবরা হইতে পারিবে না; পিতা মাতা ঘটকের সাহায্যে কন্যাকে পরিণীতা করিবেন। মৃত্যুও শ্রেয়, তথাপি জাপানী কুমারী নষ্টচরিত্রা হইতে পারিবে না, চরিত্র-রক্ষার জন্য ধাতু প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া থাকিবে।

(৬) স্বামীর সংসারই,—জাপানী বিবাহিতা রমণীর আত্ম-সংসার; স্বামী গৃহই স্ত্রীর গৃহ; স্বামী নিঃস্ব হইলেও জাপানী স্ত্রী কদাচ পতিগৃহ পরিত্যাগ করিবে না।

(৭) জাপানী রমণী অনূঢ়া অবস্থায় পিতা মাতাকে ভক্তি সম্মান করিবে; তাহাদেরই সেবাপরায়ণা হইবে; কিন্তু বিবাহ হইলেই জাপানী স্ত্রী, পিতা মাতা অপেক্ষাও শ্বশুর শাশুড়ীকে অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিতে অভ্যাস করিবে। তাহারা কটু কহিলেও, জাপানী বধূ রুষ্ট হইবে না,—প্রফুল্ল মনে তাহাদের সেবা করিবে; এরূপ করিলে, শ্বশুর শাশুড়ী,—বধূকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

(৮) বিবাহিতা জাপান-রমণীর স্বামী ব্যতীত অন্য কোন প্রভু বা দেবতা নাই। রমণী সতত প্রফুল্ল বদনে এবং বিনীত বচনে স্বামীর সহিত কথোপকথন করিবে; স্বামী রূঢ় বাক্য কহিলেও, স্ত্রী তাহার প্রতিবাদ করিবে না; হৃষ্ট-মনে স্বামীর আজ্ঞাপালনে তাহাও প্রফুল্ল মুখে, বিনীত ভাষায়। স্বামী স্ত্রীর কথা না শুনিলে, ইহার জন্য বার বার তাহাকে কিছু বলিবে না; প্রবৃত্তি শান্ত হইলেই,—স্বামীর চরিত্র আপনিই শোধিত হইয়া যাইবে।

(১১) জাপানী-স্ত্রী বৃথা বহু বাক্য বলিবে না, মিথ্যা কহিবে না, কাহারও নিন্দা করিবে না। অপরের নিন্দা শুনিলে চাপিয়া রাখিবে,—ফুটিয়া বলিবে না; বলিলে, সংসারে দ্বন্দ্ব কলহ উপস্থিত হইতে পারে।

(১২) জাপানী স্ত্রী সর্ব্বদাই সংসারের কাজ কর্ম্ম করিবে; প্রত্যূষে সকলের অগ্রে শয্যা হইতে উঠিবে; সকলের শেষে শয়ন করিবে। পান ভোজনে বা বেশপোষাকে বহু ব্যয় করিবে না; থিয়েটার যাত্রা দেখিবে না; যেখানে বহুপুরুষের সমাগম, এমন স্থলে যাইবে না।

(১৩) যুবতী স্ত্রীলোক,—কোন যুবা পুরুষের সহিত,—স্বামীর কোন আত্মীয় পুরুষের সহিত এমন কি,—স্বামীর পুরুষভৃত্যের সহিতও মেশামেশি ভাবে কথা কহিবে না; সহস্র প্রয়োজন থাকিলেও, কোন যুবককে পত্র লিখিবে না।

(১৪) বিবাহিতা স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ীরই সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া থাকে,—পিতা মাতার নহে; সুতরাং বিবাহিতা স্ত্রী—পিতা মাতা অপেক্ষা শ্বশুর শাশুড়ীর অধিক সেবা করিবে। ঘন ঘন পিতা মাতাকে দেখিতে যাইবে না; প্রয়োজন হইলে, লোক পাঠাইয়া তত্ত্ব লইবে। স্বামীর আদেশ ব্যতীত কুত্রাপি

নিযুক্ত থাকিবে। কারণ স্বামীই স্ত্রীর স্বর্গ; স্বামীর অসন্তোষই,—স্ত্রীর স্বর্গলাভের অন্তরায়।

(৯) স্বামীর আত্মীয় স্বজনই স্ত্রার আত্মীয় স্বজন; স্ত্রী তাহাদের সহিত কখন কলহ করিবে করিবে না। কারণ, ইহাতে স্বামীর সংসার অশান্তিময় হইয়া উঠিবে।

(১০) স্বামী অসচ্চরিত্র হইলেও স্ত্রী অসূয়া-পরবশ হইবে না। স্বামীর চরিত্র-শোধনের জন্য তিরস্কার করিবে বটে; কিন্তু যাইবে না; তাঁহাদের কোন সামগ্রী দিবে না।

(১৫) বহু ভৃত্য থাকিলেও, বিবাহিত স্ত্রী, স্বামীগৃহে সকল কার্য্যই নিজে করিবে। শ্বশুর শাশুড়ীর কাপড় কাচিবে। অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিবে; জাপানী প্রসূতি ছেলেদের ময়লা মাথা কাপড় নিজেই পরিষ্কার করিবে। সর্ব্বদাই নিজের বাড়ীতেই থাকিবে।

(১৬) স্বামী-সংসারের চাকর চাকরাণী যদি স্বামীর কোন আত্মীয় স্বজনের নিন্দা করে, তাহাদের নামে লাগায়, তাহা হইলে, জাপানী স্ত্রী সে কথায় কাণ দিবে না। কিছুকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ বিবাহের অগ্রে যে শ্বশুর শাশুড়ী নববধূর একান্ত অপরিচিত ছিল, তাহাদের নামে লাগাইয়া মন ভাঙ্গাইয়া দিতে,—মন ভাঙ্গাইয়া সংসার সুখ নষ্ট করিতে কতক্ষণ? যে পাপবুদ্ধি চাকর চাকরাণী এরূপ লাগাইতে আসিবে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে।

(১৭) নিন্দা করা আর দ্বেষ করাই স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকের দোষ। মূর্খতাই ইহার কারণ। ইহার ফলে সোণার সংসার ছারখার হইয়া যায়। এই সব কারণে বিবাহিতা জাপানী-স্ত্রী কোন বয়সে কোন অবস্থাতেই স্বতন্ত্র চলিবার চেষ্টা করিবে না; সর্ব্বদাই স্বামীর বশে থাকিবে। ভাল কাজ করিলেও তাহার জন্য বড়াই করিবে না। লোকে মন্দ বলিলে নীরবে সহ্য করিবে; দোষ শোধরাইয়া লইয়া ভাল হইবার চেষ্টা পাইবে।

(১৮) জাপানী-স্ত্রী যদি শ্বশুর শাশুড়ীর আজ্ঞা প্রতিপালনে অযত্ন প্রকাশ করে, যদি অবিশ্বাসিনী, হিংসাপরায়ণা, কুষ্ঠরোগাদিতে রুগ্ন, কলহপ্রিয়া, চৌর্য্যাপরাধে অপরাধিনী এবং বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। পতি-ত্যক্তা স্ত্রী বড়ই দুর্ভাগ্যবতী; তাহার জীবন,—মৃত্যুর তুল্য।

পাঠক! ইংরাজ মহিলা বিবিইসাবেলা জাপানী রমণীর বিষয় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হউন; জাপান আজ হিন্দু ধর্ম্মের পবিত্র পন্থা অবলম্বন করিয়া কতদূর উন্নত হইয়াছেন—দেখুন। বিবি ইসাবেলা স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিয়াছেন, জাপানী স্ত্রী বস্তুতই সুশীলা, কুললক্ষ্মী, একান্ত পতিপরায়ণা, সর্ব্বথা সংসার শুভকারিণী। জাপানী-স্ত্রী বস্তুতই সংসার তরুর বিনোদ-বল্লরী, শান্তিকুঞ্জের সুরভিমল্লিকা, গৃহ-সরোবরের প্রফুল্ল নলিনী, পতি হৃদয়ের চিরপ্রহ্লাদিনী। জাপান রমণী শৈশব হইতে পাতিব্রত্য ধর্ম্মে অনুরাগিণী হইয়া থাকে। জাপানে এইরূপ শিক্ষাই প্রচলিত, তাই আজ তাহাদের এত উন্নতি, তাই আজ আমাদের

যশোসৌরভে দিগন্ত পরিপূরিত। ধন্য জাপান! আজ তোমরা ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া, স্ত্রীজাতিকে প্রোজ্জ্বল ধর্ম্মশিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়া জগতে চিরকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছ; যে কীর্ত্তি চিরকাল উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়া জগতের লোককে হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবে। ভাই! হিন্দু! আর তোমরা তোমাদের চির পূজ্য ধর্ম্মে বীতস্পৃহ হইয়া কিরূপ অধোগতির পথে অগ্রসর হইতেছ, একবার দর্শন কর। ধর্ম্ম ভিন্ন যে জাতীয় জীবনের উন্নতি কোনও রূপেই সংশোধিত হইতে পারে না, জাপানের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সকলে সে বিষয় বিশেষরূপে বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

আজকাল সকলে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী, কিন্তু হিন্দু রমণী কিরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে সমস্ত জাতির মুখোজ্জ্বল হয়, সংসার শান্তিময় হয়। নৈতিক বলে বলবন্ত হইয়া সংসার সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে এস, আমরা আমাদের রমণীগণকে সেই শিক্ষা প্রদান করিয়া ধন্য হই। হিন্দুর যশোলক্ষ্মী পুনরায় পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া আমাদিগকে ধন্য করুক। যতদিন না আমরা পুনরায় আমাদের স্ত্রীগণকে অসার শিক্ষার পরিবর্ত্তে সেই পূর্ব্ব শিক্ষায় শিক্ষিতা করিতে পারিব, ততদিন আমাদের উন্নতির আশা করা শূন্যে গৃহনির্ম্মাণের ন্যায় নিষ্ফল।

ফুল।

১।

কর হে আনন্দ আজি ফুল নিরখিয়া,
সামুরসের মর্ম্ম-মূলে
ফুলেই ত্রিদিব খুলে
কি এক অজ্ঞাত সুখ তুলে জাগাইয়া
কর হে আনন্দ আজি ফুল নিরখিয়া?

২।

জগতে যোগ তপস্যা এনেছে সে ফুলে,
মৌন-হর্ষ বিতরণে
অজ্ঞাতে সবার মনে
সেই তত্ত্বাতীত ব্রহ্ম আঁকিয়া সে তোলে
জগতে যোগ তপস্যা আনিয়াছে ফুলে।

৩।

কি প্রীতি লইয়া আহা রচিত কুসুম,
কি মাধুরী দলে দলে
কি বর্ণে কি পরিমলে
ফুলের পরশে পুত এ মরত ভূম
কি প্রীতি লইয়া আহা রচিত কুসুম।

৪।

প্রভাতে নির্ম্মল হাসি প্রসূনে প্রকাশে,
সে সত্ত্ব-প্রধান কালে
অরুণ কিরণ ঢালে
ধরা আমোদিত হয় আলোকে সুবাসে
প্রভাতে নির্ম্মল হাসি প্রসূনে প্রকাশে!

৫।

বিলাসের উপাদান নহে ফুল রাশি,
কেবল যুবতী বালা,
গাঁথিয়া বিনোদ মালা,
পরাবার নহে উহা প্রিয় কণ্ঠে হাসি
বিলাসের উপাদান নহে ফুল রাশি।

৬।

আমি হেরি ফুল যেন ইঙ্গিতে কি কয়,
দুলি দুলি মন্দানিলে
আনন্দ দানে অখিলে
মনে হয় সে আনন্দ পৃথিবীর নয়
আমি হেরি ফুল যেন ইঙ্গিতে কি কয়!

৭।

আপন অস্তিত্ব বিভু করিতে প্রমাণ,
সুনীল গগণ তলে
গড়িয়াছে গ্রহদলে
ভূতলে গড়েছে এই ফুলের বাগান
আপন অস্তিত্ব বিভু করিতে প্রমাণ!

৮।

স্তবকে স্তবকে কিবা লাবণ্য বিহরে,
কি পাদপ কি বল্লরী
রয়েছে অঞ্জলি ধরি
বিশ্ব বিধাতার পদ স্মরিয়া অন্তরে,
স্তবকে স্তবকে কিবা লাবণ্য বিহরে!

৯।

শরত বসন্তে ধরা ফুলে ফুল-ময়,
শারদা বাসন্তী বেশে
জননী আসেন দেশে
উল্লাসে মাতিয়া উঠে ফুলের হৃদয়,
শরত বসন্তে ধরা ফুলে ফুল-ময়!

১০।

হে মানব! কি ভাবিছ চে'য়ে ফুল পানে,
ও বিচিত্র বর্ণ রাগে
যে প্রীতি ভকতি জাগে
সতত ফুলের মত স'প ভগবানে,—
হে মানব! কি ভাবিছ চে'য়ে ফুল পানে?

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ওঙ্কার।

(১)

জীবরে! তরিতে এ'জীবন-নদী
করিলি উপায় কিরে।
উঠে কর্ম্মেন্দ্রিয়-তরঙ্গ ভীষণ
জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ নীরে॥

(২)

রূপ আদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বিষয়
ভীষণ আবর্ত্ত তার।
জন্ম-মৃত্যু-জরা আদি দুঃখরূপ
মকরাদি ভীমাকার॥

(৩)

হায়! দেখ চেয়ে কতজন ভুগে
নদীর পাকেতে পড়ি'॥
সময় যায়রে, করগো উপায়
যাইতে এ'নদী তরি'॥

(৪)

এ'নদীর জলে হংস এক খেলে,
ওঙ্কার তাহার নাম।
"অকার" তাহার দক্ষিণের ডানা,
"উকার" ডানাটী বাম॥

(৫)

"মকার" সুন্দর পুচ্ছ হয় তার,
"অর্দ্ধমাত্রা" তার শির।
"রজস্তম" গুণ, দুইটি চরণ;
সত্ত্ব গুণ দেহ, স্থির॥

(৬)

"ধর্ম্মাধর্ম্ম" তার দুইটি নয়ন,
দিব্য জ্যোতিঃ তার গায়।
লুকায়ে লুকায়ে করে বিচরণ,
প্রেমী শুধু দেখা পায়॥

(৭)

অনাহত, নামে আবাহন-স্বর
স্থমধুর শুনা যায়।
সে কাকলি ধরি হংসেরে যে খুঁজে,
সে জনা তাঁহারে পায়॥

(৮)

অণু হ'তে অণু, বড় হ'তে বড়,
দৃঢ় তার কলেবর।
ধরি প্রেম জোরে পিঠে চড়ি তার,
তরে নদী যোগিবর॥

শ্রীজগদ্বন্ধু চৌধুরী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পৃথিবীর ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড। দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত। বাঙ্গলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে দুর্গাদাস বাবুর নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। প্রতিভাই জগতে মানুষকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে। দুর্গাদাস বাবুও নিজ প্রতিভাবলে সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। পূর্ব্বে তাঁহার যে কোন রূপ পরিচয় থাকুক না কেন, এক্ষণে এই পৃথিবীর ইতিহাসই তাঁহাকে বাঙ্গালী সমাজে তথা সাহিত্য-সমাজে অমর করিয়া রাখিবে। জগতে এইরূপ অমর-কীর্ত্তি বজায় রাখিয়া চলিয়া যাইতে পারিলেই মানুষের যথার্থ মনুষ্যত্ব বজায় থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস দ্বিতীয়খণ্ড প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ, কাগজ, ছাপা ও বাঁধা অতি মনোহর, হাওড়ার কর্ম্মযোগ প্রেসে মুদ্রিত। গ্রন্থখানিতে ভারতে আর্য্য-প্রতিভার বিস্তার, তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের রাজত্ব বিস্তার, জাতি ও সম্প্রদায় বিভাগ, ধর্ম্ম সমন্বয় প্রভৃতি বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রবীন গ্রন্থকার তাঁহার গভীর গবেষণার দ্বারা গ্রন্থে যে সকল উপাদেয় বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন—তাহা হিন্দু মাত্রেই পাঠ্য। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ পত্রিকার রূপে গৃহে রাখিলে বাঙ্গালীকে আর কোন বিষয়ের জন্য হাতড়াইয়া মরিতে হইবে না। হাওড়া, পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয়ে—পাওয়া যায়।

অর্থ-শাস্ত্র—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি,এ, প্রণীত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ প্রথম কল্প, অবশিষ্ট সত্বর প্রকাশিত হইবে বলিয়া গ্রন্থকার আশা দিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ এই নূতন যোগীন্দ্র বাবু কলেজের অধ্যাপনা কার্য্যের বহু পরিশ্রম সত্বে কয়েক বৎসর এই সকল উপাদেয় লুপ্তরত্ন বাঙ্গলার নানাবিধ মাসিক পত্রে ধারাবাহিক রূপে,প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। নব্য ভারত নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়াছিল। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদের দেশে এই সকল বিষয়ের অভাব না থাকিলেও সাধারণের বোধগম্য-ভাষায় এরূপ গ্রন্থ ছিল না বলিলেই হয়। গ্রন্থকার সে অভাব দূর করিয়াছেন,এই জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র। এরূপ পুস্তকের আদর চিরবাঞ্ছনীয়। পুস্তকের ছাপা, বাধা ও কাগজ অতি সুন্দর,

মূল্য ১০ আনা। হাওড়া পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। বর্ম্মযোগ প্রেস মুদ্রিত।

শীশ মহল—শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১৷৹ টাকা। কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। হরিসাধন বাবু বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সুপরিচিত; সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম বাবুর প্রচার মাসিক পত্রে তাঁহার হাতে খড়ি; সেই হইতে তিনি সাহিত্য সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, লুপ্ত ঐতিহাসিক তত্ব উদ্ভাবনে হরিসাধন বাবুর প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। ইতিহাসই তাঁহার জীবনের সার সম্বল, এ যাবত তিনি যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজ সমলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহার অধিকাংশ ইতিহাস-প্রসূত। ঐতিহাসিক তত্ব নিরূপণে তাঁহার কৃতীত্ব সমধিক। আলোচ্য গ্রন্থখানিও মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত; তাহা এত মিঠে, ভাষা এত প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ যে, পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। আমরা ইহা পাঠে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়াছি। হরি সাধন বাবু নামের প্রত্যাশী নহেন কিন্তু পাংশুজালে যেমন অগ্নি আচ্ছাদিত থাকে না, ইহার নামও সেইরূপ সাহিত্য-সমাজে ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ভগবান তাহাকে দীর্ঘজীবী করুন—ইহাই প্রার্থনা।

মিত্র-দুহিতা—(সজীব উপন্যাস)। শ্রীযুক্ত মোহিত কুমার বাকচি প্রণীত। প্রকাশক কলিকাতার প্রসিদ্ধ পি, এম, বাকচি কোং, মূল্য এক টাকা। গ্রন্থকারের ইহা নূতন উদ্যম হইলেও স্থানে স্থানে ভাবের মাধুর্য্য বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে! পুস্তকখানির বর্ণনার ছটায় বেশ পড়িতে আগ্রহ হয়—আমরা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। তবে যুবক গ্রন্থকার তাহার পুস্তক মধ্যে যে সকল quotation করিয়াছেন, তাহা সমস্তই ইংরাজী পুস্তক হইতে, একটীও বাঙ্গালা বা সংস্কৃত পুস্তক হইতে সংগ্রহ করা হয় নাই। কেন, আমাদের ভাষায় কি এ সকলের কিছু অভাব আছে? মোটের উপর নূতন গ্রন্থকারের উদ্যম ও লিপিকুশলতা প্রশংসনীয়। চেষ্টা থাকিলে কালে উন্নতি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। পুস্তকে যে সকল চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা অতি চমৎকার; ইহার ছাপা, কাগজ ও বাঁধা সুন্দর। ১৬ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়।

শান্তি—একখানি ক্ষুদ্র গল্পের বহি। শ্রীযুক্ত বরদা কান্ত ঘোষ প্রণীত মূল্য ।০ আনা; ঢাকা বিক্রমপুর হইতে শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকখানিতে সাতটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প আছে। গল্পগুলি বেশ শিক্ষাপ্রদ ও মনোরম, ধর্ম্মমূলক এরূপ গ্রন্থ প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়। উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত "অমৃত-রেণু" ও "রাজভক্তি" নামক আরও দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমরা পাইয়াছি। অমৃতরেণু "শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের" মোহমুদ্গরের সরল পদ্যানুবাদ, নূতন না হইলেও পদ্যে ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। "রাজভক্তি" ইহাতে স্বর্গীয়া মহারাণী ভারতেশ্বরীর ও তদীয় পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ডের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। মন্দ নহে!

প্রার্থনাশতক—শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য প্রণীত: কলিকাতা নিমতলা ষ্ট্রীট বাণী প্রেসে মুদ্রিত মূল্য ।০ আনা। গ্রন্থকার গৌরাঙ্গ সম্প্রদায় ভুক্ত; তিনি ভক্তপ্রবর নরোত্তম ঠাকুরের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীচৈতন্যের প্রার্থনাশতক পদ্যে লিখিয়াছেন। প্রার্থনা স্থানে স্থানে বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে; আমরা ইহা পাঠে প্রীত হইয়াছি; এরূপ সদ্গ্রন্থের প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বৈষ্ণব-বিবৃতি—শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী প্রণীত। বাণী প্রেস হইতে মুদ্রিত। মূল্য ৷৹ আনা। ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনেক সারতত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রমে নানা শাস্ত্র হইতে এই গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহা পাঠে ভক্তমাত্রেই হৃদয়ে প্রভূত আনন্দ অনুভব করিবেন। এরূপ পবিত্র গ্রন্থের আদর হইলে আমরা সুখী হইব।

The Debalaya its aims and objects : পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত মূল্য ।০ আনা। ইংরাজী ভাষায় লিখিত। ইহাতে ব্রাহ্মমন্দির দেবালয়ের উদ্দেশ্য ও ধারা এবং উক্ত মন্দিরের সংস্থাপক শ্রীযুক্ত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং লেখক মহাশয়ও তাঁহার রচনায় বেশ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন।

এইচ, ব্যানার্জী কোং কলিকাতা [illegible]পার চিৎপুর রোডের এইচ, ব্যানার্জী কোং'র মায়াপুরী মেটেলের কারখানা বিশ্ববিখ্যাত, ইহাদের কারুকার্য্য বিশিষ্ট মায়াপুরী মেটেলের অলঙ্কার দেখিয়া স্বদেশনায়ক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল প্রভৃতি মহাত্মাগণে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আমরাও ইহাদের কার্য্যের তৎপরতা দেখিয়া যার পর নাই সুখী হইয়াছি। এতদিন কেমিকেলের অলঙ্কারের প্রতি লোকের বড় আশঙ্কা ছিল। [illegible]পদ বাবু এতদিন পরে মায়াপুরী মেটেল আবিষ্কার করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ইহাদের "বন্দেমাতরম্ চুড়ি" লোকের চিত্ত বিশেষ রূপে আকর্ষণ করিয়াছে। এ মেটেল চিরদিন ব্যবহার করিলেও বিবর্ণ হয় না। [illegible] পূজার বাজারে যাঁহারা অল্পব্যয়ে গৃহিণীর প্রীতি সম্পাদন করিতে চাহেন, তাঁহারা এইচ, ব্যানার্জীর দোকানে আসুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য পূজার সময় গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা স্থানান্তরে যাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজ নিজ ঠিকানা [illegible] আপিসে বলিয়া যাইবেন।

মাসিকপত্র সমাচার।

প্রতিভা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

প্রথমেই গোবিন্দ চন্দ্র দাস-লিখিত একটী কবিতা—'সন্ন্যাসী'। শেষ কবিতাটা কেমন-কেমন। মোটের উপর লেখা ভাল। অন্যান্য প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিলাম যে প্রতিভা চলেছে মন্দ নয়। কিন্তু পড়া শেষ হইতে না হইতে আমাকে একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বিষম সমস্যায় পড়িতে হইল। প্রতিভার বার্ষিক মূল্য ২৷৶০ (মায় ডাকমাশুল)। সুতরাং ভিঃ পিঃ তে লইলে ২৷৶০ দাবী করা উচিত। আমার অনুগত জনৈক ব্যক্তি ভিঃ পিঃ তে প্রতিভা আনাইয়া নূতন গ্রাহক হওয়ায় তাহার নামে ২॥০ টাকার এক ভিঃ পিঃ আসিয়াছিল। ফিরাইয়া দেওয়া ভাল নয় বলিয়া, অথবা ভাল দেখায় না বলিয়া, ভদ্রলোকটী ২॥০ টাকা দিয়া উহা গ্রহণ করিল। তাহাতে ছিল বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা। আমিই তাহাকে 'প্রতিভার' গ্রাহক হইতে বলিয়াছিলাম, সুতরাং সে আমারই কাছে আসিয়া আবদার জুড়িয়া দিল। প্রতিভা-প্রকাশক কোন্ বাবদে এক আনা অধিক লইলেন, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? আমি গ্রাহকটীকে বলিলাম "তুমি না হয় এক আনা কাহাকেও পান খাইতে দিয়াছ মনে কর না।" সে উত্তর করিল "মশাই, আমি যদি কলিকাতা বা ঢাকার কোন কাগজ লইতাম, তাহা হইলে এই ভাবে আমি ত এক আনা বাঁচাইতে পারিতাম।" আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম "হয়েছে হে, পদ্মা-পারাণী এক আনা।" হাসির ধুম পড়িয়া গেল।

গ্রাহকটী এখনও আষাঢ়ের কাগজ পায় নাই। ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কাগজ যদি নিয়মিতরূপে না পৌঁছায়, তাহা হইলে একজন লোকের দ্বারা যে কাগজ পরিচালিত, সে কাগজের উপর একটু আধটু দেরীর জন্য গ্রাহকের অভিমান করা ঠিক কি? বরং দেশের (নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের মাসিক পত্রের) প্রতি সহানুভূতি দেখান উচিত। আজ ১৩ই শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল। প্রতিভা, আষাঢ়ের কাগজখানি একটু সকাল সকাল প্রকাশ করিলে ভাল হয় না?

শ্রীবৃহস্পতি।

নূতন বিষয় দেখুন।

জ্যোতিষের মতে রোগ চিকিৎসা।

এবং বহু আশ্চার্য্য গণনা।

পুস্তকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসার সঙ্গে অবধৌতিক, তান্ত্রিক এবং জ্যোতিষের মতে গ্রহ চিকিৎসা লিপিবদ্ধ আছে। গ্রহবিরুদ্ধ না হইলে কোন রোগ উপস্থিত হয় না, একারণ অগ্রে তাহার মীমাংসা করিয়া কোন গ্রহ বিরুদ্ধে কি রোগ উৎপন্ন হয়, কোন ধাতুঘটিত ঔষধে বা কোন দ্রব্য ধারণে উক্ত গ্রহ-শান্ত হইয়া কি উপকার হয়, কিম্বা কিরূপ নিয়ম অবলম্বন করিলে কি প্রকার খাদ্য, কিরূপ বস্ত্র, কিরূপ রত্নাদি ব্যবহারে সর্ব্বরোগ শান্তি হইয়া থাকে। তাহা এই পুস্তকে বিবৃত আছে, অর্থাৎ—কেন যে ধ্বজভঙ্গ, শূল, গুল্ম, পীহা, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, মূত্ররোগ, শুক্রদোষ, জ্বর, রক্তদোষ, চক্ষুরোগ প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হয়, কেনইবা উহার মধ্যে অনেক রোগ সারে না, কেনইবা উপযুক্ত চিকিৎসা-সত্ত্বেও রোগ নির্দ্দোষ হয় না, কেনইবা কোন কোন রোগী আজীবন রোগ ভোগ করিয়া থাকে, এই সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ সহ গ্রহচিকিৎসা, গ্রহৌষধি, গ্রহরত্ন, গ্রহবিচারাদি দ্বারা জ্যোতিষের মতে চিকিৎসা, ঔষধ ও বিবিধ ঔষধ-প্রস্তুত প্রণালীসহ ইহার চিকিৎসাধ্যায়ে আছে। ইহা ছাড়া এই—

নূতন প্রণালী মতের অবধৌতিক গ্রন্থে

প্রশ্নগণনা, লাগ্নিক প্রশ্ন গণনায় রোগ নিরূপণ, মানসিক প্রশ্ন গণনা, জয়-পরাজয়, সুজাতক বিজাতক, লাভালাভ, পাশ, ফেল, উন্নতি, অবনতি, স্ত্রী পরীক্ষা, কপটাচারিণী স্ত্রী, দুর্ভাগ্য স্ত্রী, কুলট-স্ত্রী, সুলক্ষণা স্ত্রী, ভাগ্যহীনাস্ত্রী, কন্যাদায়িনীস্ত্রী, পুত্র প্রসবিনী স্ত্রী, মৃতবৎসাস্ত্রী, বন্ধ্যাস্ত্রী প্রভৃতি পরীক্ষা সহ আপনাপন ভাগ্য বিচার পদ্ধতি বিনা গুরুর উপদেশে শিক্ষা করিতে পারিবেন ইহা সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া স্বেচ্ছগামিনী, প্রগলভা, বিধবা, ক্লীবপত্নী, কামুকী, মায়াবিনী, পতিহন্ত্রা, কুটিলা, পুনর্ভূ, নীচসংসর্গরতা, এবং কাকবন্ধ্যাস্ত্রী পরীক্ষা অতীব প্রশংসাহ সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়াও—

গ্রহ পূজাদি অধ্যায়ে গ্রহগণের অর্চ্চনা

পুষ্পনির্ণয়, দান, রত্নব্যবস্থা, প্রভৃতি গ্রহ সম্বন্ধীয় অনেক তথ্য-বহুল কথা সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে, ইহাত গেল জ্যোতিষ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, ইহা ছাড়াও চিকিৎসা সম্বন্ধে—

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন।

শ্রমজীবি সমবায় লিমিটেড্।

৯০।২ নং হ্যারিসন রোড, (কলেজ স্কোয়ারের মোড়।)

মূলধন এক লক্ষ টাকা।

৫৲ হিঃ ২০,০০০ অংশে বিভক্ত।

অংশীদারদিগের বিশেষ সুবিধা।

প্রথম বৎসরে শতকরা ৫৲ হিঃ লাভ দর্শাইয়া নূতন উদ্যমে, উৎসাহে ও বন্দোবস্তে কার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

প্রকৃত স্বদেশী দ্রব্যের

অপূর্ব্ব সম্মিলন স্থান।

যেমন স্বদেশী জিনিষ চাহিবেন তেমনটীই পাইবেন।

মিলের ধুতি, সাটী, তাঁতের ধুতি, সাটী, মিলের ছিট, তাঁতের ছিট, বিছানার চাদর, মোজা, তোয়ালে, গেঞ্জি, তৈয়ারী জামা, সার্ট, কোট, জ্যাকেট, সেমিজ, ফ্রক, পেনি, আয়া-নিকার, কলার।

এসেন্স, সাবান, চিরুণী, ব্রুশ, পুতুল, খেলানা, ফিতে, জরি, ছুরি, কাঁচি পাথরের ও

এ্যালুমিনিয়ম দ্রব্য

বেঙ্গল কেমিকাল ওয়াকর্স সম্ভার ও পটারি ওয়ার্কসের দ্রব্য।

পার্শি, বোম্বাই, গরদ, তসর, মট্‌কা, এণ্ডী, মুগা, বাপ্তা, মৌ-শিল্ক কাপড়, জ্যাকেট, পাঞ্জাবী।

ট্রাঙ্ক, ক্যাশবাক্স, পটারি দ্রব্য সম্ভার একস্থানে সব পাইলে কত সুবিধা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

একটী মাত্র অংশ খরিদ করিয়া

অংশীদারের সুবিধা ভোগ

করুন ও

স্বদেশী দ্রব্যের আদর

করিয়া স্বদেশী-ব্যবসা স্থায়ী করুন।

দর্জ্জির কার্য্য সুলভ ও বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ম্যানেজিং এজেন্ট।

বিশ্ববিমোহন উপহার!

হিন্দুর সেই মহামূল্য আবশ্যকীয় গ্রন্থ, ভক্তের সেই তিনখানি উপাদেয় পুস্তক। (১) ষটচক্রভেদ, (২) প্রশ্নগণনা, (৩) কর্ম্মফল কিছু দিনের জন্য বিতরণ করিতেছি; কেবল মাত্র খরচ লইয়া দিব, এ সুযোগ কেহ ছাড়িবেন না। সংসারী, সাধু প্রভৃতি সকলে সত্বর হউন, যাহা, কখন হয় নাই এবং হইবার নহে, তাহাই হইতেছে। "ষটচক্র"—কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান, স্তব, প্রাণায়ম, ভূতশুদ্ধি, প্রাণতত্ত্ব, ষটচক্রচিত্র প্রভৃতি। "প্রশ্নগণনায়"—রাক্ষসী তান্ত্রিকী, গণকচূড়ামণি, পিশাচী, লগ্ন, স্বরোদয় প্রভৃতি মতে নানাবিধ গণনা, নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধার, এবং বহুবিধ গণনার বিষয় আছে। "কর্ম্মফল,"—ধর্ম্মসাধন, আমি কে, আত্মাতত্ত্ব, কুলাচার ও পূজা, কর্ম্মবিপাক ও শান্তি প্রভৃতি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের বিষয় ব্যাখ্যা আছে। মূল্য তিনখানি মায় মাশুল ১৲ টাকা।

বিজ্ঞা।—শুক্রমেহ, মধুমেহ, মূত্রমেহ, সুরামেহ, হরিদ্রামেহ, রক্তমেহ, মজ্জামেহ, প্রভৃতি যে কুড়ি প্রকার মেহ আছে, তাহা তিন দিবসে আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

মহানন্দা তৈল,—ইহা ব্যবহারে কোষবৃদ্ধি রোগ ত্বরায় নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

মহাকালী—হাঁপানি কাশিতে বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্য করে, মূল্য প্রতি শিশি ১৲ ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

ষোড়শী।—বাধক নষ্ট করিবার ব্রহ্মাস্ত্র, মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০।

তরলা।—ইহা স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত, পীত, নীল ও লোহিত প্রদর রোগের ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

কামেশ্বর।—ইহা সেবনে রতিশক্তি অতি প্রবল হয় এবং ধ্বজভঙ্গ রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে, মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

সফলা—ইহা উপদংশ, ক্ষত খোস, চুলকনা, দদ্রু,বাত, প্রমেহ, জ্বর, কুষ্ঠ, বাতরক্ত প্রদর, মস্তিকের দুর্ব্বলতা, স্নায়ুর দুর্ব্বলতা, মাথা ঘোরা, চক্ষুর নিস্তেজতা, বক্ষঃস্থলের পীড়া, বাধক বেদনা, ঋতুবন্ধ ও ঋতু পরিস্কার না হওয়া, ক্ষয়কাশ, মৃতবৎসা, পারদ, পুরুষত্বহীন, ধাতুক্ষীণ রক্তদুষ্টি, চক্ষুরোগ এবং অম্ল প্রভৃতি রোগের উপকারক এবং পুষ্টিবর্দ্ধক এই সালসা দেশীয় নানাবিধ উদ্ভিদে অর্থাৎ অনন্তমূল, অশ্বগন্ধা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ৬৪ খানি মশলায় প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদ্বারা শোণিত বিশোধিত, শরীর পুষ্ট, মন উল্লাসিত ও স্বাস্থ্য পুনঃ স্থাপিত হয়। ইহা খাইতে বিশেষ সুস্বাদু এবং গন্ধ অতি মনোরম, উহাতে প্রাণে আনন্দ হয়। মূল্য প্রতি বড় শিশি ১৷৷০ টাকা। ডাক মাশুল ৷৷০ আনা।

শ্রীশ্যামানন্দ স্বামী—তান্ত্রিক ঔষধালয়।
১৪৬ নং খুরুট রোড, হাওড়া।

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন।

সুরমা ও সুকেশ।

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনীগণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব কেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি?—আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়। "সুরমা" ব্যবহারে অতি শীঘ্র কেশ ঘন দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না। শুধু ইহাই নহে—"সুরমা" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথা জ্বালা, অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন—সুরমার সদ্‌গন্ধ—জগতে অতুলনীয়। বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা। একত্র বড় তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৸৶৹ তের আনা। দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

নেত্রবন্ধু।

নেত্র জীবদেহের পরম বন্ধু। সেই নেত্রের সকল উপসর্গ দূর করে বলিয়া এই ঔষধের নাম "নেত্রবন্ধু" চোক উঠিলে, পাকিলে, লাল হইলে, কর কর করিলে, অথবা চক্ষু হইতে জল পিচুটি প্রভৃতি নিঃসৃত হইলে, নেত্রবন্ধু, অকপট-বন্ধুর মতই তাহা শীঘ্র নিবারণ করে। চক্ষুর পাতলা ছানি এবং জালবৎ পদার্থও ইহাদ্বারা সত্বর দূরীভূত হয়। এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র। মাশুলাদি ।৶৹ পাঁচ আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর

পুষ্পসার।

বকুল।—আমাদের বকুলের সৌরভ টাটকা বকুলফুলের মতই অটুট সুন্দর।

বেলা।—অবসন্ন গ্রীষ্মবেলায় "বেলার" গন্ধ স্বর্গসুখ আনিয়া দেয়।

পারিজাত —
এ যেন সত্য সত্যই স্বর্গীয় সৌরভ।

বঙ্গমাতা।—
বাঙ্গালীর "বঙ্গমাতা" সমস্ত বাঙ্গালার গৌরবস্বরূপ।

মিলন।—"মিলনের" সুবাস মিলনের মতই মনোরম।

রেনুকা।—"রেনুকা" এখন বিলাতী কাশ্মীরী বোকে অপেক্ষা উচ্চাসন অধিকার করিয়াছে।

কামিনী।—যামিনীর জ্যোৎস্না কামিনীর সৌরভে মধুরতর হইয়া উঠে।

চম্পক।—চাঁপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বল-মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জিনিস

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸৹ বার আনা। ছোট ৷৹ আট আনা। মাশুলাদি ।৶৹ পাঁচ আনা। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার একশিশি ৸৹ বার আনা, ডাকমাশুল ।৶৹ সাত আনা। অডি-কোলন একশিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ পাঁচ আনা। আমাদের অটো-ডি-রোজ, অটো-অব্-নিরোলী, অটো-অব্-মতিয়া, অটো অব্-খস্‌খস্ ও অটো-ডি-হেনা অতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা ডজন ১০৲ দশ টাকা।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন-সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

REGISTERED No. C. 116.

ষোড়শ বর্ষ।] আশ্বিন ১৩১৯ সাল। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

হিন্দু-সমাজের মুখ-পত্র

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক

([illegible])

সূচীপত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনা কার্য্যালয়,

হাওড়া।

শিরোরোগ নিবারক ও কেশবর্দ্ধক মহা সুগন্ধি

বেগম-বাহার

হাকিমী কেশ-তৈল।

এরূপ অতুলনীয় গন্ধ বিশিষ্ট কেশ তৈল

বাজারে অদ্যাবধি প্রকাশ হয় নাই।

এই তৈল বহুবিধ দুর্ল্লভ ইউনানী হাকিমী উপাদানে প্রস্তুত

ইহা ব্যবহার করিবা মাত্রই মস্তিস্ক স্নিগ্ধ ও শীতল হয় এবং নিয়মিত ব্যবহারে শিরোঘূর্ণন মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, মাথাধরা, মনের অবসাদ, চক্ষু জ্বালা, অকালপক্কতা, টাকপড়া প্রভৃতি রোগ দূরীকৃত হইয়া কেশদাম ঘন, চিকণ, মসৃণ, কোমল ও কৃষ্টবর্ণে পরিণত হয়। স্নানান্তেও ইহার সৌগন্ধ নষ্ট হয় না, এবং ইহার মনোরম সৌগন্ধে মনপ্রাণ সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে।

এই তৈল এক সময় বাদসাহ বেগমাদিগের বিলাসের সামগ্রী ছিল। মূল্য ১৲ প্রতি শিশির মাশুল ।৵৹, আনা, ডজন ১০৷৹ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।

হাকিম মসিহর রহমান—ইউনানী মেডিকেল হল।

১১৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন।

অর্থনীতি ও অর্থশাস্ত্র প্রণেতা

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি-এ।

আগমনী।

(১)

প্রাবৃটের ঘন ঘটা
গগনে নাহিক আর;
প্রকৃতি হ'য়েছে ফুল্ল
ঘুচিয়াছে অশ্রুধার।

(২)

শরত আগত এবে
আগমনে শারদার;
প্রকৃতি ইঙ্গিতে বলে,
"বিলম্ব নাহিক আর।"

(৩)

আসিলে আনন্দময়ী
আনন্দে ভাসিবে ধরা;
সংবৎসর পরে পুনঃ
বহিবে করুণা-ধারা।

(৪)

জরা ব্যাধি অত্যাচার
মানবের শত্রু যত;
মায়ের চরণ স্পর্শে
হবে কাল—কুক্ষিগত।

(৫)

মরতে রবে না আর
মানবের দীর্ঘশ্বাস;
ঘুচিবে তনয়-শোক
জননীর "হা হতাশ।"

(৬)

পরস্পর হিংসা দ্বেষ
অভাবের হাহাকার;
ভবানী আসিলে ভবে
না থাকিবে দেশে আর।

(৭)

রোগী দুঃখী জড় যত
বহিছে দুঃখের ভরা;
ঘুচিবে অভয়া এলে
উহাদের অশ্রুধারা।

(৮)

এস মাতঃ কৃপাময়ি!
পুত্রগণে কোলে কর;
অন্নপূর্ণা অন্নদানে
ভারতের দুঃখ হর।

(৯)

তুমি না আসিলে হেথা
তনয়ের দুঃখ ভার;
কৃপায় করুণাময়ি!
কে বল হরিবে আর?

(১০)

হরিতে ভবের দুঃখ
সমাগত ভব-দারা;
উঠ জাগ দেশ বাসী
মোহ নিদ্রা ত্যজি ত্বরা।

(১১)

সুসময় যায় চলি

মায়ের সন্তান যত ;

বিষয় ছাড়িয়া হও

চরণ সেবায় রত।

(১২)

আনন্দে তুলিয়ে সবে

ভকতি প্রসূন চয় ;

মায়ের রাতুল পদ

করহ কুসুম ময়।

(১৩)

ষড় রিপু—মহা ছাগ

শক্তি-পদে দাও বলি ;

"জয় তারা" বলি ডাক

হ'য়ে সবে কৃতাঞ্জলি।

কবিরাজ—শ্রীবরদা কান্ত কবিরত্ন।

আকবরের জন্ম ও তৎ-সাময়িক বৃত্তান্ত।

তেজকেরাহ্ অল-ভকিয়ত্ হইতে।

হিজরী ৯৪৯—৯৫০।

৯৪৯ হিজরীতে সম্রাট হুমায়ন অমরকোট দুর্গে পরিবারবর্গকে রাখিয়া তাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। কিয়দ্দূর আসিয়া পথিমধ্যে রজনীতে পুষ্করিণীর তীরে বিশ্রামার্থ শিবির সন্নিবেশ করিয়া আছেন, ইতিমধ্যে প্রত্যূষে অমরকোট হইতে আনন্দময় সংবাদ আসিল যে, তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী একপুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। এই শুভ ঘটনা ৯৪৯ হিজরীর শ্রাবন মাসের পৌর্ণমাসী রজনীতে সংঘটিত হয় ; তজ্জন্য সম্রাট প্রহৃষ্টচিত্তে পুত্রের নাম—বদর উদ্দীন (ধর্ম্মের পূর্ণচন্দ্র) মহম্মদ আকবর রাখিলেন। তৎপর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সাষ্টাঙ্গভাবে ভূমিতে পড়িয়া সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। (১)

এই শুভ সংবাদ রাষ্ট্র হইলে যাবতীয় আমির ওমরাও একত্রিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তেজকেরাহের গ্রন্থকার বলেন - জোহরের জিম্বায় যে সমুদায় ধন রত্ন ছিল, তাহা বাহির করিতে সম্রাট আদেশ করিলে, জোহর দুইশত শাহরুক্ষ (shahrukhys) নামক রৌপ্য মুদ্রা, একখানি রৌপ্য বলয়, এবং মৃগনাভী কস্তুরী পূর্ণ একটী পাত্র আনিয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। প্রথম দ্রব্য দ্বয় যাহার নিকট হইতে লওয়া হইয়াছিল, তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ হইল। তৎপরে একখানি চায়না প্লেটের উপর কস্তুরীর কৌটাটি ভগ্ন করতঃ প্রত্যেক প্রধান কর্ম্মচারীকে উহার কিয়দংশ করিয়া উপহার দিয়া সম্রাট বলিলেন,—আমার পুত্রের জন্ম উপলক্ষে ইহাই কেবল সকলকে উপহার দিতে পারি। এই কস্তুরীর সুগন্ধে এই কক্ষটি কেমন আমো-

---

(১) সম্ভবতঃ গ্রন্থকার সময় নির্ণয় করিতে ভুল করিয়াছেন। আকবরের জননী অল্প বয়সে ৯৪৮ হিজরীতে বিবাহিতা হন এবং বিবাহের পর বৎসরেক ইওাসের নিকটবর্ত্তী স্থানে অতিবাহিত করেন। আকবরের জন্ম রেজার মাসে হয় এবং তাঁহার উপাধি জেলাল উদ্দীন (ধর্ম্ম-বর্ত্তার) ছিল। see Prices Mahammedan History, vol iii, page 807.

দিত হইয়াছে, আশাকরি, কালে আমার এই পুত্রের যশঃসৌরভে সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইবে। অতঃপর তুরী-ভেরী নিনাদিত হইল, জয়ঢক্কা গর্জ্জিয়া উঠিয়া জগৎবাসীর সমক্ষে এক শুভ সমাচার জ্ঞাপন করিল।

সাম্ব্যোপসনার পর সকলে অমরকোট রাণার সৈন্য ও মেকআলি বেগের অধিনায়কত্বে একশত মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পুষ্করিণীর তীর হইতে যাত্রা করিয়া পাঁচটী অভিযানের পর জুান (১) নগরের সমীপবর্ত্তী হইলাম। এখানে অমরকোটের পূর্ব্বাধিকারী জানীবেগ এবং একজন প্রসিদ্ধ কোসাকের (cossac) অধীনস্থ বহুসংখ্যক অশ্বারোহীসৈন্য কর্ত্তৃক আমাদের পথরোধ হয়। রাণার জাট সৈন্য ও মোগল সেনানীগণ অবিলম্বে বিপক্ষগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতঃ সৈন্য বিনাশ করিয়া হত্যাবশিষ্টগণকে বিতাড়িত করে এবং যে সকল শত্রু সৈন্য তাহাদের হস্তে বন্দী হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মোগল সেনাবিভাগ হইতে পলাতক একজন সৈনিক ছিল, সে মুখমণ্ডলে গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। মীর্জ্জাকুলী খাঁ তাহাকে সম্রাট সদনে লইয়া গিয়া তুর্কী ভাষায় বলিলেন,—"এই নরাধম এক সময় জাঁহাপনার অবমাননা করিয়াছিল।" সম্রাট বলেন,—তাহার উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়াছে, এখন উহাকে ছাড়িয়া দাও।" কিন্তু অবশিষ্ট বন্দীগণকে নিহত করিবার আদেশ করিলেন।

এই ঘটনার পর সকলে অগ্রসর হইয়া "জান" অধিকার করতঃ এক বৃহৎ উদ্যানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এইস্থানে বহুতর জমীদার আসিয়া সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন, সম্রাট প্রথমতঃ দুর্গাকারে উদ্যানের চতুঃপার্শ্বে গভীর খাত খনন কার্য্যের ব্যবস্থায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন। এই স্থান হইতে নব-জাত সাহাজাদা ও তদীয় জননীকে আনিতে অমরকোটে লোক প্রেরিত হয়। রমজান মাসের ২০শে তারিখে সাহাজাদা তথায় উপনীত হইলে, তাহার জন্মের পঁয়ত্রিশ দিবসে সম্রাট তাঁহাকে প্রথম আলিঙ্গনে সম্মানিত করেন।

বর্ণনা সৌকার্য্যার্থে এ স্থলে অপর সময়ের দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিতে হইতেছে। মোগল সৈন্য যে সময় জেওয়ান (Johwin) অবরোধ করে, তৎকালে দেখা যায় যে, দুর্গাভ্যন্তরে একজন সৈনিক এমনিভাবে বন্দুক চালাইতেছে যে, স্বপক্ষের কয়েক জন লোক তৎকর্ত্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে সম্রাট বলিয়াছিলেন—"আমি আশাকরি এক দিন এ ব্যক্তিকে হাতে পাইব। সৈনিক পুরুষটী তাহাতে উত্তর করে,—যে ব্যক্তি আমার মস্তকের নিম্ন হইতে তরবারী লইয়াছে এবং কোষ হইতে অর্দ্ধ নিষ্কাশিত করিয়াছে, আমার ইচ্ছা তাহাকে ধরিতে পারিব।" মোগল সৈন্য যখন জান অধিকার করে, ঘটনাক্রমেউক্ত দুইব্যক্তিই তথায় উপস্থিত ছিল এবং এক অদ্ভুত যোজনায়

(১) ইুয়ার্টসাহেব বলেন,—"আমি যে সকল মানচিত্র দেখিয়াছি, তাহাতে জান বা জোয়ান (jan or jowah) নগরের উল্লেখ নাই। আবুল ফজল ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে ইহা ইণ্ডাস্ তীরে অবস্থিত এবং অতি মনোরম স্থান।"

উভয়ে মিলিত হইয়া স্ব স্ব বীরত্বের বড়াই করিতেছিল। তাহাদের কথোপকথন শ্রুতিগোচর হওয়ায় তাহারা ধৃত হইয়া সম্রাট সমীপে আনীত হয়। সম্রাট বিচার করিয়া বন্দুকধারীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রচার করেন, কিন্তু ক্ষমা করতঃ ...বান খেলাৎ প্রদান করিলেন।

"জানে" অবস্থান কালে দেশের যাবতীয় প্রধান ব্যক্তিকে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করণ উদ্দেশ্যে আদেশ প্রচারিত হয়। তদনুসারে সুধ (sudha) সিমক্ (symech), প্রভৃতির রাজন্যবর্গ এবং বিকারের পূর্ব্বতন সর্দ্দার ও জানের (jan) বর্ত্তমান অধিপতি সম্রাটের সম্বর্দ্ধন করেন, এইস্থানে অন্যূন পোনর ষোল হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগৃহীত হয়।

এই সময় সাহ হোসেন টাট্টা হইতে বহির্গত হইয়া জানের আট মাইল দূরে ইণ্ডাস্ নদীতীরে আড্ডা গাড়েন। একদা সন্ধ্যার সময়—রমজান ঈদের মধ্যে সম্রাট যখন মুখে একটু জল দিয়াছেন, এমন সময় সংবাদ আইসে যে, তারসবেগ সৈন্যদল হইতে পলায়ন করিয়া তাহার শত্রু হোসেনের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সংবাদে সম্রাট অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া বলিলেন,—উহার মরণ সন্নিকট দেখিতেছি। প্রকৃতই অদৃষ্টের তীক্ষবজ্র অতি সত্বর তাহার উপর আপতিত হইল। হোসেনের সহিত মিলিত হইলে হোসেন তাহাকে একটী ক্রীতদাস উপহার প্রদান করেন। একদিন এই দাসের কোন অপরাধে তারসবেগ তাহার নাসিকাচ্ছেদন করেন। উক্ত ঘটনার তিন দিন পরে দাস তাহাকে নির্দ্দয় রূপে নিহত করিয়া নাসিকাচ্ছেদের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এই হত্যাসংবাদ রাষ্ট্র হইলে মোগল অনুচরগণ প্রচারিত করিল,—আমাদের সম্রাট দৈবজ্ঞ পুরুষ, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই—যেহেতু আমাদের কোরাণে আছে,—"সম্রাটগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি।" পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সম্রাট হুমায়নের প্রকৃত রাজচক্রবর্ত্তীত্বের প্রমাণ।

এই সময় সাহাহোসেন টাট্টা হইতে অমরকোটের রাণার নিকট, পরে সম্রাটের নিকট দূত পাঠান। তৎপর রাণাকে স্বপক্ষভুক্ত করিবার আশায়, একটী সম্মাননীয় পরিচ্ছদ, একখানি মূল্যবান ছোরা এবং অপর কতিপয় সামগ্রী তাঁহাকে উপহার পাঠাইয়াছেন। রাণা অবিলম্বে ঐ সমস্ত দ্রব্য সম্রাটকে দেখাইলে সম্রাট বলেন যে, প্রাগুক্ত দ্রব্যনিচয় একটী কুক্কুরের পৃষ্ঠে চাপাইয়া সাহ হোসেনের নিকট ফেরৎ পাঠান হোক্। তদনুরূপই করা হইল, সাহহোসেন অতিশয় অপ্রতিভ হইল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর খোয়াজগাজী নামক একজন মোগল সরদারের সহিত রাণার কলহ হয়, তাহাতে রাণা নিজের সমস্ত অনুচর সহ মোগল শিবির ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান,—"মোগলগণের সাহায্য-কল্পে তিনি যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা সমস্তই বৃথা হইল।" রাণার দেখাদেখি অপরাপর জমীদার বৃন্দও তাহাদিগকে অদৃষ্টের উপর ফেলিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরদিবস মোনায়েমবেগও পলাইয়া গিয়া সাহ হোসেনকে জানাইল যে, সম্রাট এখন একাকী আছেন এবং তাঁদের শিবির একটী খোলা সমতল ক্ষেত্রে, তথা হইতে

তাঁহাকে সহজেই পরাজিত ও ধৃত করা যাইবে। সৌভাগ্য বশতঃ পূর্ব্বাহ্নেই এই সংবাদ সম্রাটের কর্ণে পৌঁছিলে তিনি শিবিরের চতুঃপার্শ্বে গভীর খাদ খননের আদেশ করেন, এমন কি সম্রাট স্বয়ং যষ্টিহস্তে করিয়া খাদ খননের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এমনি দ্রুত গতিতে খনন কার্য্য হয় যে, তিন দিবসেই পরিখা সমাপ্ত হইল। এমতে সাহহোসেন আক্রমণার্থে আগমন করতঃ শিবির সম্পূর্ণ সুরক্ষিত দেখিয়া মোনায়েম বেগকে প্রবঞ্চনা করার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যাহাহউক কয়েকটি খণ্ড-যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে গার্ড বাজ (Gurd baz) নামক একজন মোগল সরদার নিহত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধাহবের মধ্যে সংবাদ আসিল যে, কনোজ যুদ্ধ হইতে পলাতক বৈরামবেগ (খাঁ) * সম্রাটের সহিত মিলিত হইতে গুর্জ্জর হইতে আগমন করিতেছেন। এই শুভ সংবাদ প্রাপ্তে সম্রাট তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত কতিপয় সরদার আগে পাঠাইলেন। অবিলম্বেই তিনি উপস্থিত হইয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন এবং সম্রাটও তাঁহার ন্যায় একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির আগমনে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

পরদিন রজনীতে সাহ হোসেন মোগল পরিখার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার রণ-ভেরী বাজাইলেন, বৈরামবেগ ও অপরাপর মোগল সরদার তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান জন্য বাহির হন, কিন্তু সম্রাট বৈরামকে ফিরাইয়া আনিয়া রামেনবেগ ও অন্য সরদারগণকে শত্রুর অনুসরণ করিতে আদেশ করেন। তাহারা শত্রু শিবিরের নিকটস্থ হইলে রামেনবেগ ও বিপক্ষীয় বাবর কুলির সহিত দ্বন্দযুদ্ধ আরম্ভ হয়। রামেন বিপক্ষের অশ্বটি নিহত করেন, কিন্তু একজন পদাতিক সৈন্য এমনিভাবে তাঁহার অশ্বের উরুদেশ ছেদন করে যে, অশ্বটী তাঁহার প্রভুকে শিবিরে আনিয়াই প্রাণত্যাগ করে। "তাপ্‌তক্‌" (Tupchak) জাতীয় অশ্বের ইহাই নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা বা গুণ।

এই ঘটনবসানে সম্রাট সেখ আলিবেগকে সেকো (chekaw) নামক স্থানে যাইয়া খাদ্য শস্য সরবরাহ করিবার আদেশ করেন। সেখ আলি যথারীতি কর্ত্তব্য পালন করিতে থাকে, কিন্তু সাহহোসেন এতৎসংবাদ অবগত হইয়া রসদ সংগ্রহের পথরোধ করিবার নিমিত্ত শক্তিশালী এক সেনাদল প্রেরণ করেন। সম্রাটও আলির সেনাদল বর্দ্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে তেহার সুলতানের অধীনে সেনানী প্রেরণ করেন। সেখ আলি ইহাতে অপমান জ্ঞান করিয়া তাহাকে ফিরিয়া যাইবার আদেশ করিবার জন্য সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করেন। এই ঘটনায় দুই সরদারের কিছু মনান্তর উপস্থিত হয়।

সম্রাট হুমায়ন এইভাবে শিবির অবরোধ থাকায় অতিশয় বিরক্ত হইয়া একদা বলিলেন,—এইবার সাহ হোসেন শিবিরের নিকট আসিলে আমি নিজে যাইয়া তাহাকে তিরস্কার করিব পরে তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব প্রস্তুত রাখিয়া

* পরে সাহাজাদা আকবরের রক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত হন। See Dows Hindusthan

আদেশ করিলেন। পবিত্র রমজান মাস হইলেও তাহারা পরদিন একটা যুদ্ধ-কাণ্ডের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। রজনীতে নদীর তীর হইতে একটী লোক আসিয়া বলিল—"কতকগুলি লোক নদীর অপর তীরে নৌকা অন্বেষণ করিতেছে।" তাহারা কে এবং কি জন্য নৌকা অন্বেষণ করিতেছে, সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল,—"তেহার সুলতান তাহার মধ্যে আছে।" তচ্ছ্রবণে সম্রাট বলিলেন,—ভগবানের আশীর্ব্বাদে যেন সেই সুসংবাদ থাকে। তৎক্ষণাৎ তেহারকে আনিতে একখানি নৌকা প্রেরিত হইল, তেহার পার হইয়া আসিয়া জানাইল যে, আমাদের সেনাদল আক্রান্ত হইয়াছিল, সেখ আলী নিহত হইয়াছেন, এবং তেহার অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে। পর দিবস প্রাতঃকালে সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, সমস্ত রাত্রি তাঁহার আর নিদ্রা হইল না।

এই সময় সৈন্যদল পুষ্ট হওয়ায় সা হোসেনও যুদ্ধের সংকল্প আঁটিয়াছিলেন, কিন্তু রাত্রিতে মোহম্মদ বিনায়াজ নামক একজন সরদার তাঁহাকে গোপনে সংবাদ দেয় যে, পর দিবস প্রত্যুষে সম্রাট তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন। সরদার আরো বলেন যে, নানারূপ বিপদপাতে সম্রাট এখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন, এসময় তাঁহার সহিত আপোষ করা সাহ হোসেনের কর্ত্তব্য।

এই উপদেশানুযায়ী কয়েক দিবস পর সাহ হোসেন কতকগুলি সামান্য দ্রব্য উপহার সহ বাবর কুলীকে হুমায়নের নিকট পাঠাইয়া তাহার অতীত কার্য্যাবলীর নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তৎসঙ্গে তিনি আরো বলিয়া পাঠান যে, কেবল লজ্জা বশতঃই তিনি নিজে যাইয়া সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। সম্রাট দয়াদ্র্ভাবে দূতকে, হোসেনবেগও তাহার সহিত যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে বলিলেন। দূত বাবর কুলী বলিলেন যে, হোসেন বেগ বর্ষার সাহায্যে তাঁহাকে অশ্ব হইতে নামিতে বাধ্য করেন কিন্তু তাঁহার আর কোন ক্ষতি করেন নাই কিন্তু অপর কতিপয় ব্যক্তি হোসেনের অশ্বটি আহত করে। সম্রাট তৎপর হোসেনবেগকে ডাকাইয়া পরস্পর আলিঙ্গন দান করিতে বলিলেন। অতঃপর অবিলম্বে তিনি সিন্ধু প্রদেশ পরিত্যাগ করিতেছেন, এই আশ্বাস দিয়া দূতকে বিদায় করিলেন।

এই খানেই ৯৪৯ হিজরীর (১৫৪২ খৃষ্টাব্দ) বৃত্তান্ত শেষ হইল। আগামীবারে আকবরের জন্মের দ্বিতীয় বর্ষের ঘটনাবলী বিবৃত হইবে।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

উন্মাদিনী।

বৈশাখ মাস দিবসের অবসান সময়, প্রকৃতি হাস্যময়ী, অস্তগামী সূর্য্যের ম্লানরশ্মি ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষশীর্ষে, সৌধ মস্তকে আশ্রয় লইয়াছে।

গোপালনগর ও মহম্মদপুর এই দুই গ্রামের মধ্যবর্ত্তী একখানি সুবৃহৎ প্রান্তর, প্রায় ক্রোশ-

ধিক পরিমিত হইবে। প্রান্তরটী বৃক্ষশূন্য, গৃহ শূন্য কেবল চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে, আজকাল এ প্রান্তরে লোক যাতায়াত অতি অল্প, প্রায় নাই বলিলেও হয়, কাল বৈশাখীর ভয়ে বৈকালে কেহ পথ চলে না, তবে যাঁহাদের না গেলে নয়, তাঁহারাই কেবল এ পথে যাতায়ত করেন, কিন্তু আজ এই প্রান্তর মধ্যে শ্যামাদূর্ব্বা পরিশোভিত বাপীতীরে বসিয়া নিরানন্দময়ী একটী রমণীমূর্ত্তি, বয়স প্রায় পঞ্চবিংশতির অধিক হইবে না। দেখিলে উন্নতবংশীয়া বলিয়া বোধ হয়, রমণীর কোলে একটী দুগ্ধপোষ্য ক্ষুদ্র শিশু, দুই কি তিন মাসের হইবে, শিশুটী রোদন করিতেছে, কিন্তু শিশুটীর কাতর ক্রন্দন তাহার কর্ণরন্ধ্রে স্থান পায় নাই। রমণী সূর্য্যপানে চাহিয়া আপন মনে কি ভাবিতেছিল, তাহার পর হিংসাদৃপ্ত নয়নে শিশুটীর মুখপানে চাহিয়া আপনাপনি বলিতে লাগিল!—এখনও ইহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে, এইখানে ইহার ক্ষুদ্র-দেহ সমাধি করিব। সংসারের জঞ্জাল,গৃহের আবর্জ্জনা দূর করাই ভাল। এই বলিয়া বস্ত্রাঞ্চল হইতে কি বাহির করিয়া শিশুটীর ক্ষুদ্রমুখে ঢালিয়া দিয়া স্তনপান করাইতে লাগিল। ক্ষুধার্ত্ত শিশু শান্ত হইল, তৎপরে কিয়ৎক্ষণ মধ্যে শিশুটী যেন নিদ্রাঘোরে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

তাহা দেখিয়া রমণী তীব্র কণ্ঠে বলিতে লাগিল, বিষ ধরিয়াছে আর রক্ষা নাই, এ নিদ্রা ইহাকে মরণের পথে লইয়া যাইবে।

দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র শিশুটীর প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গেল, পিশাচী আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না, কপোলদেশ সিক্ত করিয়া নয়ন প্রান্ত হইতে দুই বিন্দু উষ্ণ অশ্রু ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িল, পরে মৃত সন্তানের মুখ চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিল, আমার গর্ভের সন্তান তুই, তবুও তোর প্রতি যেরূপ পুত্রস্নেহ প্রদর্শন করিলাম, জগতে বায়ুভূকই তাহার একমাত্র আদর্শ দেদীপ্যমান, তোর জন্য আমার প্রাণ কাঁদিতেছে, হৃদয় আকুল হইতেছে, কিন্তু কি করিব বৎস, জনসমাজে তোর স্থান নাই, দেখিয়া বিদায় দিতেছি। যাও বৎস। এই পাপ-তাপ-প্রবঞ্চনাপূর্ণ সংসার ছাড়িয়া, সেই জগৎপাত। জগদীশ্বরের অনন্ত শান্তিরাজ্যে গিয়া কিছুদিন আমার জন্য অপেক্ষা করিও, আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া তোর সহিত সাক্ষাৎ করিব, এখন আমার বুকে প্রতিহিংসার ভীষণ আগুণ জ্বলিতেছে এ আগুণে আর একটীকে আহুতি দিয়া অগ্নি দিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিব, "আর কেন এইবার যাই" বলিয়া রাক্ষসী উঠিল। মৃত শিশুটীকে সেইখানে রাখিয়া গোপালনগরের দিকে অগ্রসর হইল।

সূর্য্যদেব আর এ রাক্ষসী-লীলা দেখিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে সংসারকে অন্ধকার গর্ভে নিমগ্ন করিয়া পশ্চিমাকাশ-কোলে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

(২)

সুলতানপুর একটী গণ্ড গ্রাম। ইহার মধ্যে একটী ছোট খাটো বাজার আছে, প্রতি সপ্তাহে বুধ ও শনিবারে হাট বসে। আজ বাজারের দিন, বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছে, বাজারের সদর রাস্তার একপার্শ্বে একখানি

সুন্দর খড়োঘরের অলিন্দে বসিয়া একটী উন্মাদিনী ধুলা কাদা মাখিতেছে, উন্মাদিনীর মাথায় রুক্ষকেশ, পরিধান একখানি শতগ্রন্থি মলিন বাস, অতি কষ্টেও গাত্র বেষ্টন সঙ্কুলান হয় না। "আর কতকাল খুঁজিব, কতকাল বুকের আগুণে জলিয়া পুড়িয়া মরিব, এইত কতদিন কত মাস অতিবাহিত হইয়াছে, ক্রমে দুইটী বৎসরও অতীত সময়গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, তবু তাহাকেও খুজিয়া পাইলাম না, বুকের আগুণও নিবাইতে পারিলাম না, তবে কি এই ভাবে জীবন কাটিবে, আশা অপূর্ণ থাকিবে, না নিশ্চয়ই সবগুলা পূর্ণ করিব, আজীবন ধরিয়া সমগ্র সংসার খুজিব, যদি না পাই, মৃত্যুর অভ্রভেদী সিংহদ্বার পর্য্যন্ত গিয়া তাহাকে বাহির করিয়া আনিব, তাহার পর তাহাকে লইয়া আমার মনের বাসনা পূর্ণ করিব"। কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া উন্মাদিনীর কথা শুনিতেছিল, এমন সময়ে একটী ভদ্রলোক তাহার সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। উন্মাদিনী সহসা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল— "শিকার মিলিয়াছে, ইহার জন্য আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, সয়তান! আমার অমূল্য জিনিষ লইয়া আমায় ফাঁকি?" ভদ্রলোকটী ধীরস্বরে উত্তর করিল, "কে তোর কি অমূল্য জিনিষ লইয়া ফাঁকি দিয়েছে।"

এ কথায় উন্মাদিনী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এ হাসি যেন তাঁহার প্রত্যেক ধমনীর ভিতর কি এক তীব্র মদিরাস্রোত ছুটাইয়া দিল, বলিল "নূতন প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সব ভুলিয়াছ মনে কর আমাদের সেই গ্রামের কথা, তাহার পর কলিকাতার কথা, ভদ্রলোকটি উন্মাদিনীকে আর একটী মাত্র কথা বলিবার অবসর দিলেন না, আরক্ত-নয়নে একবার তাহার মুখ পানে চাহিয়া সবলে এক পদাঘাত করিলেন, উন্মাদিনী গড়াইয়া পড়িল, ভদ্রলোকটী সেদিকে আর দৃক্‌পাত না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

(৩)

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী একখানি গ্রামে হরমোহন চক্রবর্ত্তীর বাস, ইহার অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল কিম্বা দৈন্যভাবাপন্ন ছিলনা, মোটামুটি ভাবে দিন চলিয়া যাইত। তাঁহার মোহিনী নাম্নী এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। মোহিনীর বয়স যখন নয় বৎসর, সেই সময়ে হরমোহন অর্থ প্রত্যাশায় কন্যাকে একটী জরাজীর্ণ পলিত কেশ স্থবিরের করে সম্প্রদান করেন। স্বার্থপর সংসারে সকলেই স্বার্থের জন্য লালায়িত, তাঁহার উপর আবার পাশ্চাত্য সভ্যতালোকে সুন্দরী কন্যার বাজার কিছু চড়া হইয়াছে, তাই তিনি আড়াই শত রৌপ্য মুদ্রা বিনিময়ে সংসারানভিজ্ঞ দুহিতাকে একটী অশীতিপর বৃদ্ধের করে সমর্পণ করেন, অকৃতজ্ঞ স্বার্থান্ধ হরমোহন কন্যার ভাবী অবস্থারদিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পাইলেন না। হায়! সংসারে এরূপ কয়জন দেখেন?

এই বিবাহের পর মোহিনীর বৃদ্ধ স্বামী যখন সংসারের নিকট হইতে অনন্ত দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন মোহিনীর বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র।

মোহিনীর হাতের শাখা খসিল সীমন্তের সিন্দুর মুছিল, মোহিনী বিধবা সাজিল, মোহি-

নীর হাসি গেল, কান্না আসিল, শান্তি ঘুচিল, অশান্তি আসিয়া হৃদয় ছাইল, আনন্দ গেল, নিরানন্দ আসিয়া বসিল।

মা, কন্যার মলিনবেশ দেখিতে না পারিয়া যখন মোহিনীকে জোর করিয়া দুই একখানি অলঙ্কার পরাইয়া দিতেন, রুক্ষকেশগুলি তৈল-সিক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিতেন; তখন মোহিনী বলিত—কাহার জন্য সৌন্দর্য্যের আয়োজন মা, ইহা মায়ের মর্ম্মকোষের উপর কিরূপ আঘাত করিত—তাহা জননী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, মোহিনী শোক দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিয়া নীরবে আপনার সুদীর্ঘ নীরস দিন-গুলি অতিবাহিত করিতে লাগিল।

বর্ষা যায়, শরৎ আইসে, প্রকৃতি অভিনব সৌন্দর্য্য ভূষিতা হয়; মেঘমুক্ত নির্ম্মলাকাশে চাঁদ হাসিয়া উঠে, তাহার কিরণে জগৎমুগ্ধ হয়, মোহিনীর বাল্য জীবন কাটিল, যৌবন আসিয়া দেহরাজ্যে একাধিপত্য করিয়া বসিল, মনের অশান্তি তিরোহিত হইল, বালিকার এ হাসিতে অন্য কেহ সুখী হইল কি না বলিতে পারিনা, কিন্তু পিতামাতার দগ্ধ হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া কেমন একটী গভীর নীরব নিশ্বাস বহিয়া গেল।

ইহার পর আরও দুইটী বৎসর মানুষের অজস্র হাসিকান্না সঙ্গে লইয়া অতীতের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল, মোহিনীর অবস্থাও ফিরিয়া গেল। মোহিনীর আর সে মলিন ভাব নাই, তাহার মতিগতি এখন স্বতন্ত্র পথে গিয়াছে, সে এখন চওড়া কালাপেড়ে কাপড় পরে, প্রত্যেক দিন চুল বাঁধে, দেহের প্রতি সমধিক যত্ন করে, নূতন নূতন অলঙ্কারে আপন শরীর অলঙ্কৃত করে, আর ঘন ঘন তাম্বুল রাগে ওষ্ঠদ্বয় রঞ্জিত করে।

মোহিনী এখন ষোড়শী, ভাদ্রের ভরা গঙ্গার ন্যায় তাহার কোমল অঙ্গে রূপের তরঙ্গ উছলিয়া উঠিতে লাগিল, ভাগ্য-বিধাতা উপেন্দ্রকে সেই তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে ঈঙ্গিত করিলেন, উপেন্দ্র ভাসিয়া গেল।

মোহিনীর এত উন্নতি, এ উন্নতির পথ-প্রদ-শক কে—উপেন্দ্র? উপেন্দ্র জনৈক সম্ভ্রান্ত প্রতি-বেশী ব্রহ্মাণ সন্তান, পূর্ব্ব হইতে মোহিনীর উপর উপেন্দ্রের তীব্র দৃষ্টি পড়িয়াছিল, সেই জন্য সে মোহিনীকে নানা প্রলোভন দেখাইত, কখনও মোহিনীকে দেখিয়া হীরক খচিত স্বর্ণালঙ্কার ও রৌপ্যমুদ্রাপূর্ণ বাক্স খুলিয়া অযত্নে ইতস্ততঃ নাড়িতে থাকিত, কখন বা সেগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে আপন শয্যার উপর ফেলিয়া রাখিত—তাহা দেখিয়া মোহিনী মনে করিত, বড়লোক-দের বুঝি এইরূপই পড়িয়া থাকে। উপেন্দ্র তাহা-রই দুই একখানি অলঙ্কার লইয়া তাহার হস্তে অর্পণ করিত, ইহা ভিন্ন যে অর্থ প্রদান না করিত—এমন নহে। মোহিনী সহজে লইত না, ক্রমে ইহার যেন কি একটা সম্মোহিনী শক্তি তাহার ক্ষীণ মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া দিল, তখন তাহা লইতে সে আর কোন আপত্তি করিত না, গতিক ভাল দেখিয়া উপেন্দ্র কল্পনা তুলিতে কত ভবিষ্যতের মনোরম সুখ-চিত্র আঁকিয়া মোহিনীর নয়ন সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া ধরিত, সে দৃশ্যে তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল।

মোহিনী আর আত্মসংযম করিয়া চলিতে

পারিল না, অল্পকাল মধ্যেই কলঙ্কিনী পাপ-সলিলে গা ভাসাইয়া দিল; প্রথমতঃ অতি গোপনে, অতি নির্জ্জনে তাহাদের প্রেমাভিনয় চলিতে লাগিল, কেহ দেখিল না, কেহ জানিতে পারিল না, কিন্তু ধর্ম্মের কল আপনি বাজিয়া উঠিল। প্রথমে পিতামাতা, তাহার পর প্রতিবেশী এইরূপে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, এমন কি বৃদ্ধেরা তাহাদিগকে দেখিলে নাসিকা কুঞ্চিত করে, যুবক যুবতীরা একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়ায়, বালক বালিকারা টপ্পা গাহিতে থাকে, সুতরাং লোকের নিকট তাহাদের মুখ দেখান ভার হইল. পিতামাতা তাহাদিগকে কত তিরস্কার, কত লাঞ্ছনা করিল, তবুও তাহাদের কোন চৈতন্য হইল না, বরং দিন দিন প্রীতির শৃঙ্খলে প্রেমের বাঁধন দৃঢ়তর হইতে লাগিল, পরিশেষে যখন তাহাদের ঘরের বাহির হওয়া দায় হইল, তখন তাহারা একদিন রজনীযোগে যথেষ্ট অর্থ সঙ্গে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

(৪)

কলিকাতা সহর, সেখানে কে কাহার তত্ত্ব রাখে; তাহারা এই জনাকীর্ণ সহরে মনোমত একখানি বাটীভাড়া লইয়া একটী ক্ষুদ্র সংসার পাতাইয়া বসিল। কিছুরই অভাব হইল না, সব মিলিল. আর কেহ তাহাদের প্রেমের কণ্টকও হইল না, নিরাপদে দিন কাটিতে লাগিল।

কলঙ্কিনী উপেন্দ্রকে বড় আদরে রাখিয়া ছিল। তাহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিত দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, সে তাহার সুখের জন্য আত্ম-জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল।

এ সুখ তাহাদের অধিককাল স্থায়ী হইল না, পৃথিবীর বার্ষিক গতি একবার ঘুরিয়া আসিতে না আসিতেই সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইয়া গেল, কিন্তু যৌবনের আশা অপূর্ণ থাকিল, মোহিনী অর্থের জন্য উপেন্দ্রের উপর দাবী করিল না, অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া খরচ যোগাইতে লাগিল। উপেন্দ্র মোহিনীর ঐকান্তিক যত্ন ও বুকভরা প্রেমে জীবনের কয়েকটা মঙ্গল মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিতে ছিল, কিন্তু সৌন্দর্য্যের উপাসক, ইন্দ্রিয়ের দাস, উপেন্দ্র একের প্রণয়ে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারিল না, সে সেই প্রীতির, সেই প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পলাইয়া গেল।

মোহিনীর সব ফুরাইল, জীবনের শেষ আশা-ভরসা সব ঘুচিয়া গেল। আশা-মুকুলিত মানসোদ্যান উষরক্ষেত্রে পরিণত হইল, কল্পনার সুদৃশ্য সৌধ-মালা নিরাশার এক ফুৎকারে চুরমার হইয়া গেল।

বিপদের উপর বিপদ ঘটিল, দিনে দিনে মোহিনীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

উপেন্দ্র গিয়াছে, সেই সঙ্গে অলঙ্কারের বাক্স অন্তর্হিত হইয়াছে। উপেন্দ্র মোহিনীকে যথেষ্ট অলঙ্কার দিয়াছিল, কিন্তু তাহাত আর নাই। কি প্রকারে আহার যোগাইবে, তাহার উপর জমীদার বাটী ভাড়ার জন্য ঘন ঘন তাগাদা করিতেছে, কি করে—কোথায় যায়, কূলে ফিরিবার পন্থা নাই। উদ্দাম প্রবৃত্তির তাড়নায় ও লম্পটের কুহকে ভুলিয়া, কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়া সকলের নিকট হইতে বাহির হইয়াছে; আর কোন মুখে কূলে ফিরিবে। যাহা হউক অঙ্গে যে কয়েকখানি অলঙ্কার ছিল, তাহাই বিক্রয় করতঃ অনু-

তাপাশ্রুনীরে অভিষিক্ত শীর্ণ দেহখানি লইয়া সে অতিকষ্টে দিন কাটাইতে লাগিল।

যথা সময়ে একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। শিশুটী দুই মাসের হইলে কলঙ্কিনী কলিকাতা সহর ছাড়িয়া গোপালনগর ও মহম্মদপুরের মধ্যবর্ত্তী প্রান্তরে যে কাণ্ড করিয়াছিল, তাহা প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পর সুলতানপুর বাজারে যে উন্মাদিনীর কথা বলা হইয়াছে। এ সেই মোহিনী এবং যে ভদ্রলোকটী উন্মাদিনীকে পদাঘাত করিয়াছিল—এ সেই উপেন্দ্র। উপেন্দ্র মোহিনীকে চিনিতে পারিয়া স্থানকাল পাত্রভেদে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল।

(৫)

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদা গভীরা যামিনীতে পরিদৃষ্ট হইল—সুলতানপুর বাজারে উপেন্দ্রের ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সকলে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতেছে, আর সেই উন্মাদিনী রমণী নাচিয়া বিকট হাস্যে বলিতেছে—"হো হো, প্রতিহিংসার আগুন কখনই নিভিবে না, আমি স্বহস্তে জ্বালাইয়া দিয়াছি এবং এই সঙ্গে একটী-কেও আহুতি দিয়াছি, এতদিনে আমার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত হইল, আর কেন, এইবার যাই," উন্মাদিনী আর সেখানে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিল না, আনন্দে হাততালি দিয়া দ্রুতবেগে গভীর অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

তাহার পর সকলে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দেখিল—ঘরের ভিতর উপেন্দ্রের জীবন শূন্য অর্দ্ধ-দগ্ধ বিকৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

পরদিন প্রভাতে পরিদৃষ্ট হইল—প্রকাশ্য রাজপথ পার্শ্বে একটী বৃক্ষশাখায় উন্মাদিনীর মৃতদেহ ঝুলিতেছে, উন্মাদিনী উদ্বন্ধনে আত্ম-হত্যা করিয়া সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা শেষ করিয়াছে।

সুরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক

বা

ওয়ার্টারের বিষাদ-কাহিনী।

প্রথম পত্র।

শুভক্ষণে প্রবাসে আসিয়াছি। তুমি আমার বাল্যের প্রিয় সহচর; তুমি আশা ও আকাঙ্ক্ষায় চিত্ত ও চরিত্রগুণে আমার চির অনুরূপ, আজিও তুমি আমার প্রাণের সমান প্রিয়;—তোমার বিরহ ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া কেমনে এই প্রবাসে আসিতে সমর্থ হইলাম, ভাবিলে বিস্মিত হই! কি দুর্ব্বোধ মানব-হৃদয়! চিত্তবিনোদের আশায়, যথায় চিত্তবিনোদনের কোনও উপায় নাই, সেই দিকে ধাবিত হয়। আমি জানি তুমি আমাকে সখাই বিবেচনা করিবে। হায়! নিষ্ঠুর দৈব! আমি সুধামৃতের প্রত্যাশী হইয়া যে প্রয়াস করিলাম তাহাতে সকলই গরল প্রসব করিল। হতভাগিনী লিনোরা। আমার মুখে তোমার ভগিনীর প্রশংসা শুনিয়া কেন তোমার ও কোমল হৃদয়ে অনুরাগের বীজ বপন করিয়াছিলে? কিন্তু যদি ভাবিয়া দেখি, ইহাতে কি আমার কোনও দোষ নাই? কেন তাহার অনুরাগের লাজ-বিজড়িত ভাষায় আমার হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিত? অথবা কেন আমি

সে আনন্দ প্রচ্ছন্ন রাখিতাম্ না? আমার এরূপ ব্যবহারে কি তাহার হৃদয়-দাহিনী অনুরাগ-শিখা উদ্দীপিত করিত না? মানব! অনর্থের কল্পনা করিয়া আপনাকে উদ্বিগ্ন করিতে তোমার এত প্রয়াস কেন? সখা! শঙ্কিত হইও না। আমার এ হৃদয়ের অবসাদ দূরীভূত করিব, স্থির করিয়াছি। অতীতের উদ্বেগকর চিত্রে আর দৃষ্টি সঞ্চালিত না করিয়া, জীবনের অগ্রযাত্রী অনর্থে আর বিমোহিত না হইয়া, বিস্মৃতিকে অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষণিক সুখের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিব। বন্ধু, ইহা তোমারই উপদেশ, এ উপদেশের যথার্থতা আমি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। বাস্তবিকই সাধারণ মানব অতীতের বিষাদময়ী কাহিনী হৃদয়ে জাগরিত রাখিয়া স্ব স্ব জীবনকে দ্বিগুণতর বিষাদময় করিয়া তুলে।

আমার মাকে বলিও যে তাঁহার কার্য্যের দায়িত্ব হস্তে লইয়া আমি উদাসীন রহিব না। সত্বর তাঁহাকে এ সম্বন্ধে সকল কথা লিখিব। কাকীমা একান্ত স্বার্থান্ধ—এই যে জনরব শুনিলাম, তাঁহার সহিত কথোপকথনে তাহা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া ধারণা হইয়াছে। স্বভাবতঃ কোমলভাবাপন্না না হইলেও তিনি হৃদয় হীনা নহেন। যে বৈষয়িক সম্পত্তি হইতে মাতা এতদিন বঞ্চিত আছেন, সে সম্বন্ধে কাকীমা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে দোষ হইতে স্খালিত করিয়াছেন এবং তাহার কয়েকটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইলে, মাতার প্রাপ্য হইতেও অতিরিক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অধিক কি এই বৈষয়িক গোলযোগ যে মাতার অভিপ্রায়ের অনুরূপেই মিমাংসিত হইবে, এরূপ আশ্বাস দিতে আমি কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেছি না. এই বৈষয়িক ঘটনা হইতে আমি একটী শিক্ষা লাভ করিয়াছি।

লোক-চরিত্রের অনভিজ্ঞতা হইতে সমাজে যেরূপ অনর্থের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি হইয়া থাকে, মানুষের প্রকৃতিগত কুটিলতা কিম্বা বিদ্বেষ বুদ্ধি হইতে সেরূপ অনর্থ উৎপন্ন কিম্বা বিস্তৃত হয় না।

প্রকৃতই এ অতি রমনীয় স্থান। এই ভূস্বর্গে এই নিভৃতি নিবাসে আমার ক্ষত হৃদয়ে অমৃত লেপের অনুসন্ধান লাভ করিয়াছি। নিভৃত নিবাস! তুমিই হতভাগ্য জীবনের আনন্দ-নিকেতন। মধুঋতুর আনন্দোৎসবে হৃদয় উৎসাহিত ও শরীর উত্তেজিত হইতেছে। বৃক্ষের পত্রে পত্রে, শ্যাম শস্যক্ষেত্রে প্রকৃতির আনন্দোচ্ছ্বাস দৃষ্টি হইতেছে। পবন-বাহনে সুরভি-প্রসূন পরিমল উত্থিত হইতেছে। সুকণ্ঠ পক্ষীগণের কলনাদে উষাদেবীর আগমনী এবং পাপিয়ার তানে অস্তাচল যাত্রী নিশামণির বিদায়-সঙ্গীত কূজিত হইতেছে।

নগর ও পল্লীচিত্রে কত ব্যবধান! নগর আমার চক্ষে নিরানন্দময়; কিন্তু এই স্থানে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিনা কেন, সেই দিকে মনোহারিণী প্রকৃতির অতুল সৌন্দর্য্য নয়নগোচর করি। পার্ব্বতাদৃশ্য পল্লীচিত্রের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া এই স্থানের সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধিত করিতেছে। একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতশৃঙ্গে কোনও প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীর মনোরম উপবন অবস্থিত, এই উপবনে দৃষ্টিমাত্র প্রতীতি জন্মিবে যে মান বীয় শিল্প হইতে প্রকৃতিদত্ত সৌন্দর্য্যবোধের

উৎকর্ষ কত অধিক! সৌন্দর্য্যের চিরউপাসক ভিন্ন সাধারণ উদ্যানতত্ত্বজ্ঞের হস্তে উদ্যান কখন এরূপ মনোহারিণী শ্রীলাভ করিতে পারে না। এই উদ্যানের একটী নিভৃত ও ধ্বংসোন্মুখ কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া মৃত উদ্যান স্বামীর উদ্দেশ্যে কয়েক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম। যে কুঞ্জ এক-দিন তাঁহার নিভৃতের প্রিয় সহচর ছিল, আজ তাহা আমার সাহচর্য্য করিতেছে—হয়ত, কিছু-দিন পরে, আমার অধিকারভুক্তও হইবে। এই উদ্যান রক্ষকের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছি, সাধ্যানুসারে ইহার সহিত সৌহার্দ্দ অক্ষুণ্ণ রাখিব।

দ্বিতীয় পত্র।

শান্ত, স্নিগ্ধ, বাসন্তী প্রভাতের মত আমার মনোমাঝে কি অপূর্ব্ব শান্তি বিরাজ করিতেছে। চিত্তহারী সেই শান্তিরসে এই নিভৃত নিবাসে কি আনন্দেরই ধারা ঢালিয়া দিতেছে। আমার চিত্তের অভিমতে এই স্থানে আবাসের সূত্রপাত করিয়াছি। এই নির্জ্জনে প্রকৃতি আমার চিত্তের তুষ্টি সাধনার্থ কতবিধ উপহার লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই স্থান কর্ম্মের উদ্দীপনা হইতে নিষ্ক্রিয়, অলস জীবনেরই অধিকতর উপভোগ্য বলিয়া বোধ হয়। আমি এখন হৃদয়ে অধ্যয়নের স্পৃহা পোষণ করিনা, পূর্ব্বতন চিত্তবিনোদের প্রণালীও পরিত্যাগ করিয়াছি। তুলিকাধারে চিত্রতুলি নিক্ষেপ করিয়াছি, তথাপি আমার চিত্রাঙ্কণ-প্রতিভা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে। যখন কুহেলিকা উপত্যকার বৃক্ষশাখাগুলি সলিলময় মুক্তা দামে সজ্জিত করিয়া রাখে, যখন চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণী মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ অন্তরাল করিয়া রাখে, তখন কচিৎ বৃক্ষপত্রাভ্যন্তরলম্বিনী সৌরকর রেখার উজ্জ্বল শ্রীনেত্রগোচর করিয়া আমি চিন্তাসূত্রের অনুসরণ করতঃ ছায়াবহুল অভীষ্টতম স্নিগ্ধ কুঞ্জ পথে বিচ-রণ করি। কখনও বা তথা হইতে নিঃসৃত হইয়া ক্ষুদ্রকায়া কুলুকুলু নাদিনী স্রোতস্বিনীর তীরবর্ত্তী উচ্চ তৃণগুচ্ছ সমাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডে দেহযষ্টি ঋজুভাবে প্রসারিত করিয়া বিভিন্ন নৈসর্গিক শোভার অনুধ্যানে পুলকিত হইতে থাকি। তখন যাহাদিগকে অবজ্ঞাভরেই দৃষ্টি করিতাম, এরূপ সহস্র জাতীয় গুল্ম ও তদাশ্রয়ীভূত সহস্র জাতীয় জীব আমার আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে ও সেই আলোচনা করিতে করিতে বিশ্ব-স্রষ্টার সৃষ্টি এবং স্থিতিবিধায়িনী অক্ষয় ও নিত্য-শক্তি অনুভব করিতে থাকি। আবার যখন প্রাকৃতিক দৃশ্যপট অন্ধকারগর্ভে বিলীন হয়, তখন যে সকল বিশ্ববৈচিত্র্য পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলাম, তাহাই কল্পনা নয়নে উপস্থাপিত করি! সেই প্রতিচ্ছবি, স্মৃতিপথে উদ্ভাসিত প্রিয়তমার মূর্ত্তির ন্যায় হৃদয় পুলকিত করে এবং ক্রমশঃ বিস্ময় সূচক অপরিস্ফুট বাক্যে হৃদয়ের সেই আনন্দোচ্ছ্বাস ব্যক্ত হইয়া পড়ে। হৃদয়ে অনু-ভূত সেই ভাবনিচয় লেখনীমুখে ব্যক্ত করিতে পারিতাম না! সখা! বৃথা এ সাধ। সেই মহান ভাব ব্যক্ত করিতে পারে, শব্দের এমন শক্তি নাই, তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও গাম্ভীর্য্য, বিস্মিত ও বিমোহিতের ন্যায়, ভাষা সেখানে নীরব হইয়া থাকে।

তৃতীয় পত্র।

কোনও প্রচ্ছন্ন ঐন্দ্রজালিক শক্তি অথবা আমার কোমল হৃদয়বৃত্তি এই স্থানকে নন্দন-কাননের স্বর্গীয় শোভায় সুশোভিত করিয়াছে। এই প্রদেশের একস্থানে স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী গিরিগাত্র হইতে স্খলিত হইয়া নিম্নে বিংশ হস্ত দূরে গিরিগহ্বরে পতিত হইতেছে। কোনও কুহকিনী শক্তি কর্তৃক অনিবার্য্যরূপে আকৃষ্ট হইয়া আমি ঐ নির্ঝরিণীর পতনশীল জলরাশি দেখিতে থাকি। চতুর্দ্দিকে পাষাণের প্রাচীর উন্নত রহিয়াছে; ঋজুভাবে উত্থিত গগনভেদী দেবদারু বৃক্ষ শ্রেণী ছায়া বিস্তার করিতেছে; ক্লান্তি হরণ করিয়া সমীরণ সঞ্চালিত হইতেছে; জল-প্রপাতের ঝর্-ঝর্ শব্দ ও বৃক্ষশাখাশ্রয়ী পক্ষিকুলের সুস্বর কাকলী উত্থিত হইতেছে। এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ ও শ্রবণ করিয়া কাহার হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক না হয়? এই স্থানে প্রতিদিবস প্রহরার্দ্ধ অতি-বাহিত করি। এই স্থানে গ্রাম্য তরুণীগণ প্রতি-দিন জল সংগ্রহ করিতে আইসে। এইরূপ নির্দ্দোষ ও প্রীতিপদ কার্য্যে নিরত থাকিতে পূর্ব্বকালে রাজকুমারীগণও আনন্দ বোধ করিতেন। একে একে সেই অতীত রীতিনীতি আবার আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। এইরূপ নির্ঝর সন্নিহিত প্রদেশে, মৃত মহাত্মাগণের শুভানু-ধ্যান কর্তৃক চালিত হইয়াই, আমাদের পূর্ব্ব-তন পুরুষগণ পরস্পর সৌহার্দ্দে অথবা সন্ধিসূত্রে গ্রথিত হইতেন, ইহা আমি প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিতেছি। আমি যেন স্পষ্টই দেখিতেছি, কোনও নিদাঘতাপিত পান্থ বিশ্রামার্থী হইয়া ঐ শ্যাম ভূখণ্ডের উপর শায়িত রহিয়াছে, অথবা শরীরের ক্লান্তি অপনোদন করিতে করিতে ঐ স্ফটিক স্বচ্ছ নির্ম্মল প্রবাহে অবগাহন করি-তেছে। সখা, যিনি হৃদয়ে এরূপ ভাব অনুভব করিতে না পারেন, তিনি কখনও নিদাঘের অসহ্য উত্তাপে দীর্ঘ ভ্রমণে অবসন্ন হইয়া হিম-সুশীতল স্নিগ্ধকর সলিল পানের অনুপম বিলাস সুখ উপভোগ করেন নাই।

চতুর্থ পত্র।

গ্রন্থ প্রেরণ করিবে? না,-না, বন্ধু, গ্রন্থ প্রেরণ করিবার আবশ্যকতা নাই। এ সঙ্কল্পে তোমার কোমল হৃদয়েরই পরিচয় পাইলাম, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু আমার অনুরোধ গ্রন্থ পাঠাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর। আমি এতদিন পরভাবের ভাবুক হইয়া কখন কাতর, কখন বা উত্তেজিত হইয়াছি। অধুনা স্বাধীন চিন্তা উপভোগ করিবার লালসা হই-য়াছে। এখন কেবল কবিগুরু হোমরের বীণার করুণ ঝঙ্কারে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, অপর প্রার্থিত কিছুই নাই। আমার চপল প্রকৃতিকে শান্ত করিতে কত যত্ন করিয়াছি, আমার উদ্দাম প্রবৃত্তি সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিতে কত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছি—বৃথা সে যত্ন, বৃথা সে ক্লেশ! কিন্তু তোমাকে ইহা জানাইবার অপেক্ষা করে না। তুমি আমার সর্ব্ববিধ মানসিক চপলতা অবগত আছ। তুমি আমাকে এইক্ষণে চিন্তায় ম্রিয়মাণ দেখিয়া পরক্ষণে আনন্দে উন্মত্ত হইতে দেখিয়াছ, এইক্ষণে অবসাদ গ্রস্ত দেখিয়া পরক্ষণে উত্তেজিত হইতে দেখিয়াছ। প্রত্যুত আমার

হৃদয় পীড়িত শিশুরই অনুরূপ। বলপূর্ব্বক ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা অসম্ভব। কিন্তু জগতের নিকট ইহার পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। লোকে এরূপ দুর্ব্বল হৃদয়ের নিন্দাবাদই করিয়া থাকে। যিনি প্রবৃত্তির স্রোতে আপনাকে বিসর্জ্জন দেন, তিনি জনসমাজে গঞ্জনাই অর্জ্জন করিয়া থাকেন।

পঞ্চম পত্র।

ইতিমধ্যে আমি অধিবাসিগণের, বিশেষতঃ বালকগণের, প্রিয় ও বিশ্বাস ভাজন হইয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন ইহাঁদের সহিত আমি প্রথমালাপে প্রবৃত্ত হই, তখন কেহ কেহ আমার প্রতি সন্দিগ্ধবৎ আচরণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে আমি কিঞ্চিন্মাত্র আত্মাভিমান বোধ না করিয়া ইহাঁদের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপনেরই প্রয়াসী হইয়াছিলাম। সচরাচর দৃষ্ট হইয়া হইয়া থাকে যে সমাজে ভদ্রবোধবিশিষ্ট বা ভদ্রগণ সাধারণের সংসর্গে লিপ্ত হইতে চাহেন না — যেন সেই সংসর্গে তাহাদের পদ গৌরবের হানি হইতে পারে। ইহা হইতে দাম্ভিকতা ও অজ্ঞতার বিশিষ্টতর নিদর্শন আর কি হইতে পারে? যে ভদ্রনামধারী ব্যক্তি কার্য্য প্রসঙ্গে সাধারণের সহিত সৌজন্য পূর্ণ ব্যবহারে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না, তিনিই আবার সময়ান্তরে তাহাদের প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞার দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া থাকেন। জন-সমাজে বিভিন্নতা চির বিরাজিত রহিবে। কিন্তু যিনি সাধারণের সংশ্রব হইতে দূরে রহিয়া নিজের গৌরব রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহার আচরণ শত্রুভয়ভীত, রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী কাপুরুষেরই ন্যায় নিন্দনীয়।

একদিন ভ্রমণে বহির্গত হইয়া জলসং গ্রহার্থিনী কোনও তরুণীকে প্রস্রবণের নিম্নতম সোপানে নেত্র গোচর করিলাম। সোপানের উপর জলপূর্ণ কলস রক্ষা করিয়া তরুণী সতৃষ্ণ নয়নে কোনও সঙ্গিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তদ্দৃষ্টে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলাম,—"আপনি যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন,তাহা হইলে, আমি এই কলসটী তুলিয়া দিই।" তরুণী লজ্জারুণবদনী হইলেন, এবং বিনয়াতিশয্যহেতুই প্রতিশ্রুত সাহায্য স্বীকারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমি আর কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা বোধ না করিয়া জল কলস তাঁহার মস্তকে উত্তোলিত করিয়া দিলাম। তরুণী স্মিতমুখে আমার ধন্যবাদ করিলেন। আমি আনন্দানুভবে পরম পুরস্কৃত বোধ করিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রী—

প্রকৃতি ও বিদ্যা।

একদা একটী সুন্দর বৃক্ষবাটীকা মধ্যে কোমল শরীরা, পীবরারোহা, পীনপয়োধরা ও অপরূপরূপা দুইটি রমনী বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একটী প্রকৃতি অপরটি বিদ্যা।

প্রকৃতির আস্য হাস্য পূর্ণ, নয়ন চঞ্চল অথচ উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহার ঘনকৃষ্ণ কেশ কলাপে কত নক্ষত্রবৎ অলঙ্কার রাশি, মস্তকে মনোহর কুসুমকিরীট, কর্ণদ্বয়ে চন্দ্র

সূর্য্যবৎ দুই কুণ্ডল দোদুল্যমান, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য এবং হস্ত প্রভৃতি প্রত্যঙ্গে ফলময় আভরণ; বসনাঞ্চলে লতা পাতা, বৃক্ষ, সরিৎ, ভূধর প্রভৃতি কত কি অঙ্কিত রহিয়াছে।

বিদ্যার বদন হাস্যদীপ্ত অথচ গম্ভীর, নয়ন উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় ও স্থির দৃষ্টিবদ্ধ,—কিন্তু বিনীত ও দয়ার্দ্র। তাঁহারও মস্তকে মণি-মাণিক্য খচিত কীর্ত্তিকিরীট এবং তদুপরি একটী মাত্র বিহঙ্গ-পক্ষ। তাঁহার কণ্ঠে যশোমাল্য এবং অপরাপর প্রত্যঙ্গে নানাবিধ ভূষণ শোভিত।

যে বৃক্ষবাটিকার মধ্যে তাঁহারা বিচরণ করিতেছিলেন, তাহারই পার্শ্বে একটী স্রোতঃস্বতী মৃদুল রবে 'হুলুই' দিয়া তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিতেছিল।

বিচরণ করিতে করিতে প্রকৃতি তদীয় ভগিনী বিদ্যাকে কহিলেন, "ভগিনি! দেখ দেখি আমি সযত্নে একটী গুটিকা হইতে কেমন একটী সুন্দর প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছি। মরি কি সুন্দর পাখাখানি দুলাইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে! আমারই বুকে ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়, নরলোকের ত কথাই নাই। হায়, তোমার শিষ্যগণ ঐ সমস্ত গুটি হরণ করিয়া অকাতরে সুন্দর জীবগুলিকে বধ করে;—তাহারা কি নৃশংস!"

বিদ্যা কহিলেন, "যদ্যপি আমার শিষ্যগণ ঐরূপ না করিত, তাহা হইলে মানবগণ সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও পরিচ্ছদ পরিধান করিতে পাইত না। তাহার ফলে ক্রমে সভ্যতার পথ অবরুদ্ধ হইয়া চিরকাল জীবন স্রোত এক ভাবে প্রবাহিত হইত।"

প্রকৃতি।—কেন, প্রাচীনকালের তপোধনগণ বৃক্ষত্বক্ পরিহিত হইয়া আমার অর্চ্চনা করিতেন; কখনও প্রজাপতিবধ করেন নাই, রেশমী বস্ত্রও পরিধান করেন নাই, তাই বলিয়া কি তাঁহারা সভ্য ছিলেন না?

এইবার বিদ্যা সদর্পে বলিলেন, তাঁহারা কি আমরাও অর্চ্চনা করেন নাই? তাঁহাদের মত আমার অর্চ্চনা করিতে এ পর্য্যন্ত কেহই সমর্থ হয় নাই।—সেই জন্যই তাহারা সভ্য ছিলেন।

প্রকৃতি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—তথায় আমার অধিষ্ঠান ছিল বলিয়া তুমি তাঁহাদিগকে ওরূপ কুমন্ত্রণা দিয়া নিষ্ঠুর-হৃদয় করিতে পার নাই।"

এইবার বিদ্যা কিঞ্চিৎ অহঙ্কৃত ও কিঞ্চিৎ কুপিত ভাবে বলিলেন,—কি আমাপেক্ষা তুমি কি অধিকতর ক্ষমতাপন্ন?"

প্রকৃতি দেবীও কথঞ্চিৎ দম্ভভরে কহিলেন অবশ্য!—তোমা হইতে আমি বয়োজ্যেষ্ঠ; আরও তোমার ক্ষমতা সসীম, আমার ক্ষমতা অসীম। তোমাতে আমাতে কোন ক্রমেই তুল্য হইতে পারে না।"

এইরূপে ক্রমান্বয়ে উভয়ে উগ্রতর বিতণ্ডা হইতে লাগিল। পরে স্থির হইল যে ফলেন গুননির্ণয়। পরস্পর পরস্পরের বল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রকৃতি কহিলেন—আমি বল প্রকাশে ঐ রসাল বৃক্ষটিকে ভূপতিত করিতে প্রয়াস পাইব, আর তুমি ইহাকে রক্ষা করিতে যত্নবতী হইবে। যে কৃতকার্য্য হইবে সেই অধিকতর বলবতী প্রতিপন্ন হইবে।"

বিদ্যা বলিল,—"তাহাই হউক।"

এই বলিয়া প্রকৃতিদেবী অতীব ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিল; অসম্বদ্ধ কেশজাল উর্দ্ধে উত্থিত হইল; লোম সমূহ কণ্টকবৎ হইয়া উঠিল; নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল ও প্রচণ্ডবেগে উষ্ণ শ্বাস বহির্গত হইয়া প্রলয়ঙ্করী ঝটিকাকারে পরিণত হইল। সেই বাত্যাঘাতে রসাল ভীমবেগে দুলিতে লাগিল।

বিদ্যাদেবীও তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা ও কৌশল প্রয়োগ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। এই রসাল পড়ে পড়ে আবার বিদ্যার কৌশলে রক্ষা হয়। এইরূপে বহুবার পতনোন্মুখ রসাল বিদ্যার যত্নে রক্ষা পাইল। কিন্তু আর হইল না;—পরিশেষে প্রকৃতির জয় হইল। রসাল উৎপাটিত মূল হইয়া ভীষণ শব্দে ভূমিসাৎ হইল।

প্রকৃতি ও বিদ্যা শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; উভয়ের মধ্যে পুনর্ব্বার মিলন সঙ্ঘটিত হইল। তখন প্রকৃতি বিদ্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"প্রিয় ভগিনি! তোমার ক্ষমতা প্রশংসার্হ বটে; যেহেতু তুমি কৌশল প্রকাশে আমার চেষ্টাকে বহুবার ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছ।"

বিদ্যাও জ্যেষ্ঠাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "ধন্য ভগিনী—তোমার ক্ষমতা! আজ জানিলাম, তোমার ক্ষমতা অদম্য। বস্তুতঃ, তোমার অসীম ক্ষমতার নিকট আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা অতি সামান্য।"

শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাবিত্রী-চরিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সাবিত্রী-চরিত্র কথা মধুর আধার,
স্মরিলে অমিয় ক্ষরে হৃদে অনিবার।

সে দিন কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি। নিবিড় অন্ধকারে ঘন-পল্লব বৃক্ষরাজি বেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ বনভূমের সঙ্কীর্ণ পথগুলিকে আপনার বিশাল কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছে! অনন্ত নীলিমাময় আকাশে দুই একটী ক্ষুদ্র নক্ষত্র বিশাল স্থির সমুদ্র বক্ষে বীচিমালাবৎ বিকশিত ছিল। তাহাদের ক্ষীণ আলোক সে অন্ধকার ভেদ করিতে পারিতেছে না। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে দুই একটা শিয়াল ও বন্য বরাহ এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। সেই ভীষণ বনে সাবিত্রী একাকিনী। সম্মুখে উরু-উপাধানে স্বামীর স্পন্দহীন দেহলতা। জন-মানবের সাড়া শব্দ নাই। সহসা রক্তিম-বসন-পরিহিত, কনক-কীরিট-ভূষিত, হস্তে কাল দণ্ডধৃত সুবিশাল দেহ এক দিব্য পুরুষ তথায় উপস্থিত হইলেন।

ধীরে অতি ধীরে সাবিত্রী স্বামীর মস্তক ভূতলে রক্ষা করিয়া, দাড়াইয়া সেই দিব্য পুরুষকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন,—"দেব! আপনি কে, কি জন্য এখানে আসিয়াছেন?" দেব পুরুষ বলিলেন,—"আমি যম, তোমার স্বামীর কাল পূর্ণ হইয়াছে; তাই তাকে লইতে আসিয়াছি।"

এই বলিয়া যম সত্যবানের দেহ বিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম প্রাণ-শরীরকে লইয়া চলিলেন। তখন

সাবিত্রী অশ্রু মোচন করিতে করিতে ধর্ম্ম-রাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। যম তাঁহাকে পশ্চাৎ গমনে নিষেধ করিলে সাবিত্রী বলিলেন,—"দেব! আমার স্বামীকে যেখানে লইয়া যাইবেন, আমিও তথায় যাইব। স্বামীই স্ত্রীর সর্ব্বস্ব ধন—স্বামী সহবাসই রমণীর পরম ধর্ম্ম ও একমাত্র শান্তি নিকেতন। আপনি স্বয়ং ধর্ম্ম হইয়া আমাকে সেই পরম ধর্ম্মানুষ্ঠানে বঞ্চিত করিবেন না। স্বামীই স্ত্রীলোকের গৃহ-ধর্ম্মের একমাত্র বিগ্রহ—মূর্ত্তিমান দেবতা। আপনি আমার সেই পরমারাধ্য দেবতাকে লইয়া যাইতেছেন, তাই আমি আপনার অনুগমন করিতেছি।"

যম। "মা! তোমার ধর্ম্মজ্ঞান ও যুক্তি-পূর্ণ মধুর বাক্য শ্রবণে আমি পরম প্রীতিলাভ করিলাম। তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতীত যে কোনও বর ইচ্ছা প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী। "আমার রাজ্যচ্যুত বনবাস-ক্লিষ্ট অন্ধ শ্বশুর দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ও সূর্য্যাগ্নি সদৃশ দীপ্তিশালী হউন।

যম। "তথাস্তু" বলিয়া স্বস্থানে চলিলেন। তথাপি সাবিত্রী তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। যম বলিলেন, "তোমার বাসনা-স্বরূপ বর প্রদান করিলাম, আবার কেন সঙ্গে আসিতেছ মা? তুমি সুদীর্ঘ পথ পর্য্যটনে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছ, আর অগ্রসর হইও না।"

সাবিত্রী। "প্রভো! পতির সঙ্গে থাকিতে সতীর আবার ক্লান্তি বোধ কি? পতিই সতীর একমাত্র দেবতা ও গতি; অতএব আমার পতিকে যেখানে লইয়া যাইতেছেন, আমিও তথায় যাইব। বহু পুণ্য ফলে লোকে দেব-দর্শন ও সাধুসঙ্গ লাভে সমর্থ হয়; আমি ভাগ্যগুণে আপনার দর্শন পাইয়াছি, সম্মুখে পাইয়া কে কবে ধর্ম্ম সঙ্গ ত্যাগ করিয়া থাকে?

যম। মা! তোমার অমিয়-মধুর বাক্য শ্রবণে আমি যারপরনাই প্রীতিলাভ করিয়াছি; তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। আমার শ্বশুর তাঁহার হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হউন।

যম। তাহাই হইবে; যাও মা! এখন তুমি গৃহে ফিরে যাও।

সাবিত্রী। প্রভো! আপনি দেবশ্রেষ্ঠ স্বয়ং ধর্ম্মরাজ। দেবতারা চিরকাল ভক্তবৎসল, ভক্তের প্রতি তাঁহাদের স্নেহানুগ্রহ নিত্য। আমি ভক্তিতে আপনার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইব, এই আশাতেই আপনার অনুগমন করিতেছি।

যম। মা! তৃষ্ণার্ত্ত জনের শীতল জল লাভে পরিতৃপ্তির ন্যায় আমি তোমার মধুর বাক্যে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, এখন তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে কোনও বর ইচ্ছা—প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। দেব! আমার অপুত্রক পিতার শত পুত্র হউক।

যম। "তথাস্তু" বলিয়া গমন করিতে লাগিলেন, তথাপি সাবিত্রী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

যম। আবার কেন আসিতেছ মা? তুমি অনেক দূর আসিয়াছ, এখনও গৃহে ফিরিয়া যাও।

সাবিত্রী। যেখানে পতি, সেইখানেই পত্নীর গৃহ; স্বামীর সঙ্গ সুখ ভোগে স্ত্রীর দূরত্ব বোধ থাকে না। তার পর আপনি স্বয়ং ধর্ম্ম; ধর্ম্মের আশ্রয় পাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিব কেন?

যম। মা! তুমি অমৃতভাষিণী। তোমার কথায় আমি বড় প্রীতিলাভ করিয়াছি, এখন তুমি সত্যবানের প্রাণ ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। সত্যবানের ঔরসে প্রতি পঞ্চম বর্ষে একটী করিয়া, আমার শত পুত্র হউক।

যম। "তথাস্তু" বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি সাবিত্রী তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না।

যম। মা! তুমি যতবার বর প্রার্থনা করিলে, আমি সবই তোমায় প্রদান করিলাম, এখন আর আমার সঙ্গে আসিতেছ কেন? যাও মা স্বগৃহে ফিরিয়া যাও। এই বলিয়া যম সাবিত্রীকে পুনরায় বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। কিন্তু এবার আর "সত্যবানের জীবন ব্যতীত যে কোনও বর প্রার্থনা কর" না বলিয়াই, সাবিত্রীকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সাবিত্রী এই সুযোগে সত্যবানের জীবন বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—"প্রভো! আপনিত ইতিপূর্ব্বে সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে শত পুত্র হইবার বর প্রদান করিয়াছেন, এখন তাঁহার জীবন দান করিয়া আপনার বাক্য সফল করুন; ধার্ম্মিকের কথা—ধর্ম্মরাজের বাক্য কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। অতএব আপনার বাক্য সফল হউক।

যম। মা! সার্থক তোমার পতিব্রতাধর্ম্ম—সার্থক তোমার নারীজন্ম। তুমি সতীকুল-বরেণ্য ও জগজ্জন স্মরণ্য সতীরূপে বিশ্ব-বিখ্যাত হইয়া থাকিবে। এখন যাও মা তুমি তোমার ভূতলশায়ী স্বামীর প্রাণহীন দেহের নিকট ফিরিয়া যাও। এই বলিয়া যম সত্যবানের সূক্ষ্ম-প্রাণশরীর ফিরিয়া দিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। সত্যবান পুনর্জ্জীবিত হইলেন। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে, সাবিত্রী স্বামীসহ কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

বর প্রভাবে অচিরে বৃদ্ধ রাজা দ্যুমৎসেনের অন্ধত্ব মোচন ও রাজ্য লাভ হইল। যথাসময়ে রাজা অশ্বপতি অপত্য মুখ সন্দর্শন করিয়া সুখী হইলেন। ক্রমশঃ সাবিত্রী মহাবলশালী শত পুত্র লাভে কৃতার্থ হইলেন। পুত্রগণের প্রভাবে সাবিত্রী সত্যবানের সুখসমৃদ্ধির অবধি রহিল না। পতিভক্তিমতি সাবিত্রী পতিপুত্র সহ সুদীর্ঘ কাল সংসার সুখ ভোগ করিয়া অন্তে স্বর্গবাসিনী হইলেন।*

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড—শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন বাগচি প্রণীত, একখানি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, মূল্য ১৲ টাকা। পুস্তকখানি অপরাপর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের ন্যায় অসার নহে। ঘটনা

* এ ঘটনা স্মরণার্থ সাবিত্রী আজীবন উক্ত চতুর্দ্দশী তিথিতে ব্রতানুষ্ঠান করিতেন। এ দেশের মহিলাগণ এখনও সাবিত্রী চতুর্দ্দশী নামে উক্ত ব্রত করিয়া থাকেন।

বৈচিত্র্যে পুস্তকখানি এরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে যে, ইহা পাঠে সকলেই উপন্যাস পাঠের বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন। গ্রন্থকার চরিত্র চিত্রনে বেশ গুণপনা দেখাইয়াছেন। তিনি এ কার্য্যে নূতন ব্রতী হইলেও পুস্তক রচনা বিষয়ে বিশেষ বুদ্ধিমত্তায় পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই পুস্তক পাঠে বিশেষ সুখী হইয়াছি। এরূপ উপন্যাসের আদর বাঞ্ছনীয়। ১৬ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট পি, এম, বাগচী এণ্ড কোং নিকট ইহা পাওয়া যায়।

চিকিৎসা-পদ্ধতি—সীতানাথ শর্ম্মা কবিরঞ্জন প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। কবিরাজ মহাশয় দেশবাসীর নিকট সুপরিচিত, স্ত্রী-চিকিৎসায় তিনি পারদর্শী। সম্প্রতি তিনি অবধৌতিক মতে এই চিকিৎসা পুস্তক প্রকাশ করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ইহাতে অবধৌতিক মতে চিকিৎসা প্রণালী, গ্রহ নক্ষত্রাদির কুদৃষ্টিতে কখন কিরূপ রোগের উৎপত্তি হয় এবং কিরূপে সেই গ্রহের শান্তি এবং রোগের প্রতিকার করিতে হয়, তাহা বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার একখানি গৃহে রাখিলে সময়ে অনেক উপকার হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

শ্রমজীবী সমবায় লিমিটেড্—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশে অনেক স্বদেশী কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু একে একে প্রায় সমস্তই উঠিয়া গিয়াছে। যাহা আছে তাহাও স্বদেশী বিদেশীতে মিশিয়া একপ্রকার অচলভাবে আছে, চলিতেছে না আর উঠিয়াও যায় নাই। কিন্তু শ্রমজীবী সমবায় লিমিটেড ৯০।২ নম্বর হ্যারিসন রোড—কলিকাতায়, আজ কয়েক বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ এই কারবারটীকে আদর্শ স্বদেশী কারবার রূপে দাঁড় করাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টাও অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। আমরা তাহাদের নিকট হইতে অনেক প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া দেখিয়াছি—তাহাদের নিকট প্রতারণা নাই। দ্রব্যাদিও খাঁটি। যাহার যাহা ইচ্ছা খরিদ করিবার জন্য এই স্বদেশী পণ্য ভাণ্ডার "শ্রমজীবী সমবায়ে" আসিলে আর মফঃস্বলের নিরীহ ভদ্রলোকগণকে কলিকাতার জুয়াচোরের হস্তে পড়িয়া ঠকিতে হইবে না। মহাপূজার জন্য বিশেষ আয়োজন হইয়াছে। সকল প্রকার স্বদেশী বিলাসিতার জিনিস, কাপড়, জামা, চাদর প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য সমূহ এখানে ঠিক দরে পাওয়া যায়। এই পূজার বাজারে আমরা সকলকে এই আদর্শ পরিচ্ছদাগারে একবার পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

—•—

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নাম উল্লেখ করিবেন।

আমেরিকার খ্যাতনামা চিকিৎসক "এ রবিন" সাহেব বহু গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা আদি যে সকল উপাদানে মানব দেহ গঠিত, তন্মধ্যে রক্তই মনুষ্যের জীবনীশক্তি। আবার তাড়িতশক্তির মূল রক্তকণিকা হইতেই শুক্রনিকর পুষ্টি হয়, সুতরাং শুক্র মধ্যেই তাড়িৎ শক্তির সম্পূর্ণ অধিকার, বাল্যের উচ্ছৃঙ্খলতায় শুক্রের অতিরিক্ত অপব্যয় জন্য তাড়িৎ শক্তির হ্রাস হইয়া সাধারণতঃ শুক্র সম্বন্ধীয় পীড়ার উৎপত্তি হয়। এজন্য উপরোক্ত রবিন সাহেব বিজ্ঞান ও রসায়ন বলে কয়েকটী বীর্য্যবান ভেষজ পদার্থের সহিত ইহাকে অলৌকিক উপায়ে তাড়িৎশক্তি সঞ্চারিত করিয়া মূত্রযন্ত্র ও জরায়ু সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়ার আরোগ্য কল্পে জগতে এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া দিয়েছেন। ইহার তাড়িত সঞ্চারিত হওয়াও অলৌকিকত্ব ও বিশেষত্ব, যাহা কোন ঔষধে নাই, ডাক্তার সাহেব আজ তাহাই লোক সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন। চিকিৎসা জগত আজ স্তম্ভিত, ইহা সেবন মাত্রেই মনে হয়-শরীরাভ্যন্তরে কোন বৈদ্যুতিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, ধাতুক্ষীণ, শুক্রের তরলতা, অল্প উত্তেজনায় রেতঃপাত, স্ত্রীসহবাসে অক্ষমতা, সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রমেহ, প্রস্রাবের সহিত অলক্ষে শুক্র ক্ষরণ, মলের বেগে বীর্য্যপতন, স্বপ্নদোষ, শিরঘূর্ণন, স্মরণ শক্তি হ্রাস, কোষ্ঠ কাঠিন্য, অজীর্ণ, অম্লশূল- উদরাময় ও বাত প্রভৃতিতে মন্ত্রশক্তির ন্যায় ফলপ্রদ। শিথিল ইন্দ্রিয়ের দৃঢ়কারিতায় এবং অধিকক্ষণ বীর্য্যধারণায় সমর্থ কল্পে ইহা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। ইহা স্ত্রীরোগেও ফলপ্রদ। দেড়মাসোপযোগী ১ শিশির মূল্য মায় মাশুল ১।৶০ একটাকা ছয় আনা।

সোল এজেন্ট—মেসার্স এইচ, দে এণ্ড কোং।

২০২।১৪ নং দর্মাহাটা ষ্ট্রীট, পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা।

বঙ্গের রাজন্য ও জমীদার বর্গের পৃষ্ঠপোষিত

টেলার্স, মেসার্স কালিকা এণ্ড কোম্পানী।

১০৯ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

আমরা সুন্দর সুন্দর নূতন ফ্যাসনের শীত ও গ্রীষ্ম উপযোগী সকল প্রকার কাপড়ের যথা— লংক্লথ, নয়ানসুক, সুইজ, আদ্দি, ছিট, জিন, সাটীনজিন, ড্রিল বাপ্তা, আলপাকা, প্যারামিটার, গরদ, কুটক্লথ, ফ্ল্যানেল, এংগোলা, কাশ্মীরার, সার্জ্জ, বনাত, মেরুণো, সিল্ক সাটীন, প্রভৃতি কাপড়ের কামিজ, সার্ট, পিরান, পাঞ্জাবী, কোট, ওয়েষ্টকোট, চাপকান, চোগা, পেণ্টুলন অলেষ্টার, লংকোট চেষ্টারফিল্ড কোট, জ্যাকেট বডী, ফ্রগ, পেনকোট, সলুকা পেশোয়াজ, সাচ্চা সলমা চুমকী কাজ করা জ্যাকেট, কোট পাঞ্জাবী পেজিফ্রগ, মোজা নানারকম রুমাল আলোয়ান, র‍্যাফার সাল প্রভৃতি যাবতীয় পোষাক বাজার দর অপেক্ষা অনেক সুলভ মূল্যে এবং পছন্দমত দ্রব্যাদি ডাকে পাঠাইয়া থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

গায়ের মাপ পাঠাইলে অল্পদিনের মধ্যে অর্ডার মত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া থাকি। অর্ডারের সহিত কিছু অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

আলোচনা।

শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

Paragon Press

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্তুতে॥

পাগলের মাতৃপূজা।

অবিরাম বারিবর্ষণ, অশনি গর্জ্জন অতিক্রম করিয়া, কর্দ্দমসিক্ত মলিন বেশ পরিত্যাগ করতঃ বর্ষার পর প্রকৃতি দেবী যখন শারদীয় শুক্লপক্ষে জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া, সুচিকণ শ্যাম সীমন্তে সুন্দর সিন্দুর বিন্দু ধারণ করিয়া বিশ্বমোহিনী মূর্ত্তিতে জগজ্জীবের প্রাণমন পুলকিত করেন, চারিদিকে পীতাভ শস্যরাশি পরিপূর্ণা বসুন্ধরা যখন মূর্ত্তিমতী লক্ষীরূপে বিরাজ করিয়া প্রাণীবর্গের হৃদয় আশা ও আনন্দ তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত করেন, দিনমণি যখন বক্র গতি পরিত্যাগ করিয়া পূরব দিগন্তে তরুণ অরুণিমা বিস্তার করিয়া জীব জগতের এ এক অপূর্ব্ব অব্যক্ত প্রীতিরসে আপ্লুত করে সমীরণ যখন প্রলয় মূরতি ছাড়িয়া, ভীষণ শন্ গর্জ্জন ভুলিয়া গিয়া মন্দ মন্দ মধুর হিল্লো পল্লবরাজির সঙ্গে সমতালে মানব নাচাইতে থাকেন, নিবীড়-নিরদ জাল করিয়া সুধাংশু যখন সুনীল স্বচ্ছ অম্বর অসীম উজ্জ্বল রূপরাশি ঢালিয়া দিয়া সৌন্দর্য্য প্লাবনে সমগ্র জগতকে ভাসা নিজে হাসিতে হাসিতে ভাসিতে থাকেন, শুভক্ষণে চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অভি

অনির্ব্বচনীয় সুন্দর ও সুমধুর ভাব ধারণ করিয়া মানব মনকে স্বতঃই পবিত্র প্রেমোন্মাদে মাতাইয়া তুলে, সে সময়কে যদি ভাই! অকাল বল ত মাতৃ পূজার প্রকৃত উপযোগী সময় আর কবে পাইবে?

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা সূর্য্যের দক্ষিণায়নকে অকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভাই! যে জ্যোতির্ম্ময়ী জগজ্জননীর চরণপ্রান্তে আঁখির পলকে কত অসংখ্য কোটী সূর্য্য লুণ্ঠিত, ঘূর্ণিত ও বিচূর্ণিত হইতেছে, তাহার পূজার আবার কালাকাল নির্ণয় কি সূর্য্যের গতাগতির উপর নির্ভর করে? যাঁহার স্মিতাভাষের ক্ষণিক বিকাশে কোটী তড়িল্লেখা চমকিত হইয়া অনন্ত কোটীকল্প সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত, পুলকিত ও প্রফুল্লিত করে, তাঁহার পূজার আবার কালাকাল কি ভাই? সুখে দুঃখে সর্ব্বকালে যাহাকে না ডাকিলে, না দেখিলে প্রাণ অস্থির হয়, সেই মাকে ডাকিবার আবার দিনক্ষণ কি চাই? প্রাণে যখন জ্বালা ধরে, ভয়ে যখন হৃদয় কাঁপিতে থাকে, আনন্দে যখন প্রাণ উন্মত্ত হয়, [illegible] যখন মন বিভোর হয়, তখনই অজ্ঞাতসারে মানব মন মায়ের চরণপ্রান্তে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র হয়। সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে, হর্ষে বিষাদে, শোকে সন্তাপে, প্রেমে বিচ্ছেদে, জ্ঞানে অজ্ঞানে, জাগ্রতে, স্বপনে, সকল সময় সকল অবস্থাতেই সকলের নিকট মা আসিয়া পূজাগ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহাকে ডাক আর না ডাক, তিনি তোমার নিকট সন্নিহিত। তিনি তোমাকে ছাড়িয়া একদণ্ডও থাকিতে পারেন না, তোমার তিলেক অদর্শনে তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠেন, তুমি ঘুমাইয়া থাকিলে তিনি তোমার মাথার শিয়রে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকেন, তুমি প্রবাসে গমন করিলে তিনি তোমার মস্তকের উপরে অন্তরীক্ষে অভয় দিতে দিতে অগ্রে অগ্রে অগ্রসর হন, তুমি পথে চলিলে তিনি তোমার অলক্ষ্যে পথের কাঁটা কাঁকর সরাইয়া দেন, তোমার ক্ষুধা পাইলে স্বর্গের সুধা আনিয়া তোমার ভোজ্য পাত্রের সহিত মিলিত করিয়া দেন, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিয়া দেহে সঞ্জীবনী রস সঞ্চারিত করিয়া তাহার মধ্যে জীবনীশক্তি রূপে সতত বিরাজ করেন। এমন মঙ্গলময়ী জননীর পূজার আবার সময় অসময় ভাবিতে হয় কি?

শাস্ত্রকার বলেন—দেবতারা এ কয় মাস নিদ্রা যান, তাই এসময় কোন দেবতার পূজা করিতে হইলে, তাঁহার উদ্বোধন করিতে হয়। অর্থাৎ জাগাইতে হয়। আচ্ছা, বল দেখি ভাই! নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র জননীর ঘুমাইবার অবকাশ কোথায়? যিনি জগজ্জীব সমূহকে ঘুম পাড়াইয়া নিজের কার্য্য সারিয়া লন, তিনি কি কখন ঘুমাইতে পারেন? দেবতারা নিদ্রা যাইতে পারেন, পরন্তু আব্রহ্ম স্তম্ভ, কৃমিকীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলের জননী স্বয়ং যোগনিদ্রায়—তাঁহার আবার নিদ্রা কি? যাহার প্রভাবে দেবাদিদেব সদাই অঘোর অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছেন, আঁখি মেলিয়া চাহিতে পারেন, না সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ঘুম ঘোরে অচেতন ও বিভোর হইয়া থাকেন, নিদ্রা কি

কখন তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে? তিনি নিদ্রিত হইলে যে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড যুগপৎ প্রলয়ের অতল জলে বিলীন হইবে, তিনি কি নিদ্রা যাইতে পারেন। তাই বলি ভাই! তাঁহার আর উদ্বোধন করিতে হইবে না, তুমি নিজে জাগ্রত হও, মায়া নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ে যোগমায়াকে দর্শন কর। একবার শুধু আঁখি মেলিয়া দেখ, তিনি তোমার হৃদয় মন্দিরকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন। কে তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন, কে তোমার বিপদ্ভীতি বিনাশ করিতে দশ হাত বাহির করিয়া দশদিক রক্ষা করিতেছেন, কে তোমার অজ্ঞাতসারে প্রবিষ্ট হৃদয়ের সর্ব্বস্বাপহারক দস্যুকে পদদলিত করিয়া মহিষমর্দ্দিনীরূপে দাঁড়াইয়া মৃদু মন্দ হাস্য করিতেছেন, একবার চক্ষুমেলিয়া দেখ আর কিছু করিতে হইবে না। পূজার আয়োজন তিনি সমস্তই নিজে করিয়া লইবেন। তুমি ভাই! একবার প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাক, তাহা হইলেই তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত সম্পূর্ণ পূজা করা হইবে, তোমার মুখে মধুর মা বলা শুনিবার জন্য মা আমার কাণ পাতিয়া বসিয়া আছেন। সরল ব্যাকুলান্তরে একবার প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাক; তাহা হইলেই তোমার দুর্গোৎসব হইবে। ভক্তের সরল প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে যে অমিয় মাখা 'মা' নিসৃত হয়, তাহা সপ্তলোক ভেদ করিয়া অনন্ত গগণে অনন্তকাল গম্ভীর নাদে নিনাদিত হইতে থাকে। প্রাণে—কর্ণে যিনি তাহা একবার শুনিয়াছেন তিনিই পাগল হইয়াছেন। তাই বলি ভাই! সকল ছাড়িয়া, সকল ভুলিয়া "মা মা" করিয়া কেবল জগতকে মাতাইয়া তোল। মাতৃনাম মহামন্ত্রের মনোমোহন শক্তি তোমায় এই ভবের মায়াবন্ধন শিথিল করিতে শক্তিশালী করিবে, তুমি অনায়াসে ত্রিতাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া মুক্তি পথের পথিক হইতে পারিবে। মাতৃনামে যত আনন্দ, এ নামের যত সম্মোহনী শক্তি, এত আর কিছুতে নাই। এই সুখের শরতে স্বতঃই মনে আনন্দের উন্মেষ হয় বলিয়া, প্রকৃতির কোলে এত আনন্দের ছড়াছড়ি হয় বলিয়া আনন্দময়ী মা আমার সেই আনন্দকে ভক্ত-হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিবার জন্য এই সময় আবির্ভূতা হন, মা আসিবেন বলিয়াই শরতের শশী হাসিয়া হাসিয়া গগন গাত্রে ভাসিয়া বেড়ান, মা আসিবেন বলিয়া শ্যামশষ্প সমন্বিতা প্রকৃতি সুন্দরী স্বর্ণমুকুট মাথায় দিয়া হাসির তরঙ্গে ভাসিতে থাকেন। দারুণ বর্ষার পর সুখের শরতে আনন্দের উৎস খুলিয়া দিবার জন্য মায়ের আগমন। মন! এ সময় নিরানন্দে থেকো না; আনন্দময়ীর সেবা হইবে না; সারা বৎসর জীবনে কত কষ্ট, কত ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়াছ, জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত বিধ্বস্ত হইয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছ; আজ একবার সেই সকল দুঃখ-কাহিনী মায়ের নিকট প্রাণ খুলিয়া ব্যক্ত কর "সংগ্রামে বিজয়ং দেহি" বলিয়া জীবন-সংগ্রামে বিজয়ের প্রার্থনা কর, তোমার অবসাদ-গ্রস্ত দেহ আবার নবভাবে ভরিয়া যাইবে। অবসন্নতা আর তোমাকে আশ্রয় করিতে [illegible] না, তুমি পাগল হইয়া যাইবে। পাগলের অবসন্নতা নাই—সে সদাই আনন্দময়। আনন্দময়ীর

প্রেমানন্দ লাভ করিতে হইলে তাঁহার নামে পাগল হইতে হইবে, পাগলের সরল প্রাণের তরল উচ্ছ্বাস তাহা হইলেই ভগবতীকে দৃঢ়-রূপে বাঁধিতে পারিবে।

তোমার দেহোদ্যানে পদ্মের অভাব নাই; পদ্মাসনা মাকে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেমাশ্রুনীরে অভিষেক কর, প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিয়া তাঁহার ভবারাধ্য চরণে স্মরণ গ্রহণ কর, তোমার প্রতিবিধান হইবে। ত্রেতাবতারে রাজীবলোচন ভগবান রামচন্দ্রও মায়ামোহরূপ রাবণ কুম্ভকর্ণ সমরে যখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, যখন উন্মাদের ন্যায় ভক্তি-বিচলিত হইয়া আঁখি-পদ্ম উৎপাটনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, যখনই আত্মসমর্পণ করিয়া তন্ময় হইতে পারিলেন; রত্নের সার চক্ষুরত্ন দানেও যখন কুণ্ঠাবোধ করিলেন না, তখনই ভগবতী অভয়া মূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া রাম-চন্দ্রকে সে দুঃসময়ে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভাই! নররূপী নারায়ণের যখন এই দশা, তখন তুমি হীনমতী মানব তোমার পক্ষে আর কি কথা আছে! তুমি ত সংসার সংগ্রামে মুহ্যমান, উদ্ধারের আশা নাই, তুমি পাগল হইয়া আত্ম-সমর্পণ না করিলে, মা মুখ তুলিয়া চাহিবেন কেন? মায়ের পাগলেরই ঘরকন্না. মা! আপনি পাগল, পতিও পাগল—তাই পাগলকে তিনি অতিশয় ভালবাসেন।

লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, এই তিন থাকিলে মহা-মায়ার দর্শন পাওয়া যায় না; পাগলের এসকল নাই বলিয়া সে শীঘ্র মায়ের দর্শন লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারে। তবে প্রেমোন্মাদ হওয়া চাই নতুবা সাধারণ পাগল হইলে কেবল কাদা ঘাঁটাই সার হইবে, মাছ ধরা হইবে না।

মানব-হৃদয়ে ভক্তি প্রাবল্যের উৎস উচ্ছ্ব-সিত করিবার জন্যই মায়ের সাকার মূর্তির কল্পনা। ভক্তি-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া পাগল হইতে পারিলেই জগতের বিষম বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। তাই মা আমার সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য সাকার রূপে সপ্রকাশ। হিন্দু যখন সাকার মূর্তি গড়িয়া তাহাতে বিশ্বরূপ জননীকে সপ্রকাশ দেখে, তখন আর তাহাদের মৃন্ময়ী প্রতিমা বলিয়া মনে থাকে না, তাই পাগল ভক্ত, নয়ননীরে ভাসিয়া সেই প্রতিমার মধ্য হইতে চিদানন্দময়ীকে মূর্তিমতিরূপে দেখিতে পায়।

সাকার মূর্তির বাহ্যিক পূজার নাকি সাধক সত্বর ভাবসাগরে ডুবিতে পারে এই জন্যই মা আমার প্রতিমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। আজ অতীন্দ্রিয় ফল দায়িনী ব্রহ্মময়ী তাই কৈলাশের মণিমন্দির পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত, ভাই! এমন দিন আর হইবে না, ভবের সম্পদ সেই ভববারিনীর মোক্ষমূলাধার পদ লাভ করি-বার এমন সুবর্ণ সুযোগ আর হইবে না। এস ভাই! ভক্তিহ্রদে অবগাহন করিয়া শুদ্ধচিত্তে তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করি। মাতৃ প্রেমে পাগল হইয়া সেই পাগল গৃহিনীর প্রসন্নতা সম্পা-দনে আত্মোৎসর্গ করি। ভাই! কালাকাল বিচার করিও না, সময় অসময় ইহাতে নাই ভবরোগগ্রস্ত পুত্র মায়ের পদাশ্রয়ে আশ্রয় লইবে তাহাতে আবার সময় অসময় কি।

যাহারাই পাগল হইতে পারিয়াছে, তাহারাই অনায়াসে সেই ভবারাধ্য অভয় পদে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছে!

আজ মূর্ত্তিমতী মা আমার ভক্তের পবিত্র অঙ্গনে ঐ দেখ অভয়ামূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াছেন, মা যেন বলিতেছেন—রে ত্রিতাপতপ্ত ভবযন্ত্রণাগ্রস্ত জীব! আর তোমার ভাবনা নাই। তোমাদের উদ্ধার করিতে, তোমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল-সাধন করিতে আমি আসিয়াছি; তুমি আপনহারা হইয়া এস, তোমাকে নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করি। ভক্ত সাধক! মায়ের এ আহ্বান-বাণী উপেক্ষা করিয়া আর আত্মনাশ করিও না; অগ্রসর হও, শুভ মুহূর্ত্ত চলিয়া যায়, আজ কাল করিয়া চিরকাল আর এরূপভাবে কয়টা গণা-দিনের অপব্যয় করিও না। যদি ধন্য হইতে চাও, হৃদয়ের কপাট খুলিয়া অকপট অনুরাগ ভরে এস, যুগ্মকরে গলবস্ত্র হইয়া মাতৃচরণে স্মরণ গ্রহণ করি, মায়ের ছেলে মায়ের কাছে গিয়া তপ্ত মনপ্রাণ সুশীতল করি। শরণাগত পতিত পুত্রের প্রতি মায়ের করুণা সমধিক, পতিতকে উদ্ধার করাই তাঁহার কাজ; তিনি তোমার সকল অভাব মোচন করিয়া প্রাণে অপার শান্তি প্রদান করিবেন, তুমি একবার পাগল হইয়া মাকে ডাক দেখি—তোমার উদ্ধারের পথ প্রশস্ত হয় কি না? ঐ মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া পাগলের ন্যায় আত্মহারা হইয়া কাঁদ দেখি, ভগবতী তোমার প্রতি প্রসন্ন হন কি না? মা ত্রিতাপনাশিনী তোমাকে অভয় দিতে, তোমার দ্বারে উপস্থিত; তুমি বৃথা মোহে মুগ্ধ হইয়া আর পরকাল নষ্ট করিও না।

শতদল।

ক্ষুদ্র গল্প।

শতদল! শতদল! আহা ঐ নামটীতে আমার হৃদয় সরসীজ কি একটা সুখকর প্লাবনে যেন স্বতঃই ভরিয়া উঠে—তাহার তরঙ্গে আমি যেন আমার আমিত্ব হারাইয়া ফেলি! বুঝিতে পারি না—এখনো বুঝিতে পারি না; সংসারটা স্বার্থময় কিনা? মনে হয় সে শতদল বুঝি একটীই ফুটিয়াছিল, স্বর্গের মন্দার—একবিন্দু স্বর্গ বুঝি স্থানভ্রষ্ট হয়ে এখানে এসে পড়েছিল! নহিলে এই সংসার শ্মশানে, এই শুষ্ক মরীচিকাময় মরুভূমিতে এমন ফুলটী ফুটে কি? এমন স্বার্থ-শূন্যতা, এত কমনীয়তা, সেখানে আশা করা যায় কি? কিন্তু ঠিক তাহাই ছিল, আমি নরকের নিবাসে স্বর্গের ছবি দেখিয়াছিলাম। সে রমনীয় জিনিসটী তো আর নাই, সে বুঝি শান্তিময়ের চরণে আশ্রয় পেয়েছে। এখন আছে কি? যাহা থাকে; আছে কেবল তাহার স্মৃতি। সেই স্মৃতিতে মোহিত হই, পুলকিত হই, বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হই; সেই স্মৃতির সম্মুখে শির আপনিই নামিয়া আসে।

হেরম্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বরঞ্জন চট্টো-পাধ্যায় উদয়পুরের দুইটী বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমার পিতা শ্রীবিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সেকালের জুনি-য়ারী সিনিয়ারী পাশ করিয়া বহুদিন সদরয়ালার কাজ করেন; পরে প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল পূর্ব্ববঙ্গের কোনও পুণ্যশ্লোকা রাণীঠাকুরাণীর জমিদারীর ম্যানেজার ছিলেন। ঐ [illegible]

তিনি বহু অর্থ সঞ্চয় করেন এবং ক্রমে ক্রমে ঐ অঞ্চলে প্রায় আট নয় হাজার টাকার বার্ষিক আয়ের জমিদারী ক্রয় করেন। আজ পাঁচ বৎসর হইল পিতাঠাকুর নিজ জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার পৈত্রিক জীর্ণ কুটীরের স্থলে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন. তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে স্বগ্রামের ও ভিন্ন গ্রামের বহু লোক তাঁহার বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে. তাঁহার বহু বয়সের একমাত্র পুত্র, সংসারের একমাত্র বন্ধন ছিলাম, আমি। আমি বুঝি তাঁহার বড়ই নয়নানন্দকর ছিলাম, তাই আমার নাম রাখিয়াছিলেন—সুধাংশু।

হেরম্ববাবুরও একটী মাত্র শিশু কন্যা সংসারের অবলম্বন ছিল। শতদলও আমার ন্যায় অতি শৈশবে মাতৃহারা। হেরম্ববাবু এই গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের পত্তনীদার, তাঁহার দুই হাজার হইতে আড়াই হাজার টাকা আয় আছে। তাঁহার কাছারীতে খাজনা আদায়ের ভয়ানক শাসন; চার কিস্তিতে আদায় হয়, কিস্তিখেলাপী সুদ পাই পয়সা ছাড়া হয় না। তাঁহার সংসারে চাষা প্রজাদের তো দুঃখের অবধি নাই! প্রথমেই বৃষ্টির অভাব, ভগবানের তো আর দয়া নাই! যদি বা একটু বৃষ্টি হইল, কিছু চাষ হইল, তখন আবার বীজের অভাব পড়িল। গতবর্ষের দারুণ সঞ্চিত বীজ পেটের দায়ে সে যদিও কিছু খাইয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু, তাহার অধিকাংশই মজুত ছিল। কিস্তির খাজনা আদায় করিতে গিয়া জমিদারের পেয়াদা ঐ অন্নক্লিষ্ট গরীব প্রজাটীকে কাছারীতে ধরিয়া লইয়া যায়। সেখানে গিয়া সে করযোড়ে নায়েব মহাশয়কে বলে যে, তাহার হাতে একটীও পয়সা নাই, খাজনা কি করিয়া দিবে; তাদের তিন ভাইয়ের সংসার আছে এবং দুইটী বিধবা ভগ্নী, ছেলেপুলে লইয়া আসিয়া রহিয়াছে, নিত্য একশালি ধান হইলে তবে তাহার চলে—তাহারা আজকাল আধপেটা খাইয়া কাটাইতেছে. এই কিস্তির খাজনা সে যোগাড় করিয়া উঠিতে পারে নাই, আগামী কিস্তিতে সে মায় সুদ তাবৎ খাজনা শোধ করিবে। কিন্তু এই কাতরোক্তিতে নায়েবের মনে দয়া হওয়া দূরে থাক, তিনি পদাঘাতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং অকথ্য ভাষায় তাহাকে গালি দিতে লাগিলেন। স্নানাহারের সময় হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি গোমস্তাকে হুকুম দিয়া গেলেন—শালার কাছে কড়ার না লইয়া ছাড়িয়া দিবে না. ৫০৷৬০ টাকার জোত রাখে; কিন্তু খাজনা দিবার সময় যত বজ্জাতি, পাজি! সয়তান! বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত প্রায় তখনও বেচারা বসিয়া আছে, এখনো একটু জল পর্য্যন্ত খাইতে পায় নাই! তিরস্কার লাঞ্ছনাদি তখনও চলিতেছে। সে তখন নিরুপায় হইয়া তাহার হৃদয়ের শোণিত পরিবারবর্গের ভরসা আগামী বর্ষের একমাত্র সংস্থান সেই বীজের ধানগুলি বিক্রয় করিয়া খাজনা শোধ করিল কাজেই এখন বীজের অভাব পড়িয়াছে। তাই আজ তাহাকে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্বেও জমিদারের গোলা হইতে বীজের ধান "দেড়ি" হিসাবে ধার করিয়া আনিতে হইল এবং নিড়ুনী বাছাই প্রভৃতি খরচ জন্য জমিদারের কর্জ্জা-তহবীল হইতে টাকায় মাসিক চার পয়সা সুদে কয়েক

টাকাও কর্জ্জ করিয়া আনিতে হইল। চাষের ভয়ানক পরিশ্রমে জল বৃষ্টিতে তাহারা সপরিবারে রুগ্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু তখন শরীরের দিকে দৃষ্টি করিলে চলিবে না, তাহারা সেই রুগ্ন শরীরেই কষ্ট করিয়া ফসল ঘরে তুলিল। কিন্তু ভগবান যাহাদের প্রতিকুল তাহাদের নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কোথায় ? ক্রমে ক্রমে জমীদারের মহাজনের সুদ কর্জ্জাটাকার তাগাদা, দেড়ি ধানের তাগাদা, পূণ্যাহের খাজনা, পার্ব্বনী খরচা, ভক্তী মাগন আদায়ের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। পাইক পেয়াদার হাঁকডাকে গ্রামে সোরগোল উঠিল, জমীদারের গোলা ভরিয়া উঠিল, মহাজনের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল, নায়েব গোমস্তার ট্যাঁক ভারি হইল ! কিন্তু কাহার কল্যাণে আজ এই আনন্দস্রোত বহিতেছে ? ঐ কৃশ দুর্ব্বল বিবর্ণ, জ্বরে কম্পিত কৃষকের রক্ত শোষণ করিয়া, তবুও প্রজার "ছড়াছড়ি" জোত জমীদারের বিনানুমতিতে দান বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না ! কি সুন্দর বিচার ! এই রাজত্বের অধীশ্বর হেরম্ব বাবু ! নায়েব গোমস্তা বলে, আমাদের জমীদারের প্রতাপে বাঘে হরিণে একঘাটে জল খায় !

আমার পিতা জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়া স্বগ্রামের অবস্থা দর্শনে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন, যে প্রকারে হউক গ্রামের উন্নতি সাধন করিবেন ! তাঁহার বাল্য সঙ্গিগণের মধ্যে জীবিত ছিল—দুইজন মাত্র ; এক গ্রামের জমীদার হেরম্ববাবু, অন্যটী ওখাকার প্রধান মণ্ডল হিরু বিশ্বাস। আমাদের নূতন বাটীর চারিধারে বর্ষার সময় নূতন নূতন ফল ফুলের গাছ রোপন করা হইতেছিল। সেই সমস্ত পরিদর্শন করিতে করিতে একদিন পিতা, হিরু বিশ্বাসকে বলিলেন,—দেখ হিরু, আমার একটা ছেলে, তাহার সংস্থান আমি যথেষ্ট করিয়াছি। আর কতদিনই বা বাঁচিব, এখন আমি আমার জন্মস্থানের এই ছেলেবেলার ধুলাখেলার জায়গাটার কিছু উন্নতি করবার মনস্থ করেছি। আমি এই কথা বলিবার জন্য হেরম্বকে আজ এখানে ডাকিয়াছিলাম, কিন্তু দেখছি হেরম্ব তো এখনো এলেননা। এদেশের অধিকাংশ গৃহস্থই নিরক্ষর, এই কারণে এবং চিকিৎসার অভাব হেতু দেশের এই দুরাবস্থা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভূতনাথ শিবের মন্দিরের সন্নিকটে আমার যে লাখরাজ ভূমি আছে সেখানে, যে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ হচ্ছে, তাহাতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটী মধ্য প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপন করিব। ইহা ছাড়া গ্রামের কি কি প্রধান অভাব আছে, তোমার নিকট জানিতে পারিলে সে সমস্ত আমার সাধ্যমত পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিব। হিরু বিশ্বাস বলিল,—বাবু আপনার এত দয়া বলিয়াই 'রাণী' ঠাকুরাণী আপনাকে বিদায় দিবার সময় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। দেশের যে দুটি অভাব আপনি ধরিয়াছেন, সে দুটির আবশ্যক আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা আরও কয়েকটি জিনিষের বেশী অভাব আছে। দেখুন লোক মৃত্যুর আগেও অন্নের চিন্তায় ব্যাকুল হয়। চাষা প্রজাদের ঘরে কখনই অর্থ বা অন্ন মজুত থাকে না। আপনি যদি তাহাদিগকে কম লাভে ধানের দাদন এবং কম সুদে টাকা কর্জ্জ

দিবার একটী ব্যবস্থা করেন, তবে আপাততঃ তাহারা মহাজনের অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া যায়। পিতা বলিলেন—"হিরু তুমি বেশ বলেছ, এই সমস্ত কাজে না হয় আমার লাভই কিছু কম হইবে, কিন্তু লোকসানের কোন সম্ভাবনা নাই। আচ্ছা, আমি ইহার ব্যবস্থা করিব।" তখন হিরু বলিল,—"দেখুন, আপনি এই সমস্ত ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে করিয়া দিন, তার পর যদি সুবিধা হয়, আর একটী কাজ আপনাকে করিতে হইবে। আমাদের খাবার জলের বড় কষ্ট, শ্রীকৃষ্ণরায়দেবের পদ্ম পুকুরটা শুধু পচা পানায় ভরিয়া থাকে, তাহাদের নিকট হইতে ঐটী কিনিয়া লইয়া একটী বড় দীঘি কাটাইয়া দিন। সেই দীঘির মাছ হইতে আপনার যথেষ্ট লাভ হইবে, এদিকে আমরাও জলকষ্টের দায় হইতে বাঁচিয়া যাইব।" পিতা, হিরু বিশ্বাসের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"বেশ তুমি ছোটরায়দের নিকট হইতে ওটা আমায় কিনিয়া দাও।

অতঃপর দুই তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে! একদিন একটি বিবাহ ভোজে ভানুঘোষের বাটীর সম্মুখে রাস্তার ধারে চাঁদের আলোয়, দা কাটা তামাক এবং খড়ের আগুনের সহিত গ্রাম্য-রাজনীতির আলোচনা হইতেছিল। অবশ্য প্রধান বক্তা আমাদের হিরু বিশ্বাস। হিরু লোকটা নিতান্ত চাষা নয়, সে বাংলা লেখা পড়া এবং পাটোয়ারী হিসাবাদি বেশ জানিত,ইদানিং জমিমালের কারবারে কিছু পয়সাও করিয়াছে। সে নিজের তেলমাখা হুঁকাটী টানিতে টানিতে বলিতে লাগিল—মুখুয্যে মশায়, দেশে এসে আমাদের কি সুবিধাই করে দিচ্ছেন, টাকায় আধ পয়সা হিসাবে সুদ, ধানের দেড়ির হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া গিয়াছে। আর নায়েবের জুতা বা মহাজনের জুলুমের ভয় নাই। আচ্ছা সাতকড়ে! তুই কোন লজ্জায় সেদিন সুদের চারটে পয়সা মাপ চাচ্ছিলি! মুখুর্য্যে মশায় যত দয়া করছেন, তোদের লোভ ততই বাড়ছে দেখছি। অনেকেই সাতকড়িকে নিন্দা করিল, অতঃপর চক্ষু বুজিয়া সুখটান দিতে দিতে দামু পুনরায় বলিতে লাগিল—চৈত্র বৈশাখমাসে মেয়েছেলেদের তিন চারি ক্রোশ হতে জল আনতে হত, মুখুয্যে মশায় পুরাণো পদ্মপুকুর ঝালিয়ে কি সুন্দর নূতন দীঘি কাটিয়ে দিলেন। আর সরকার পুকুরের ধারে ও ভূতনাথ তলার রাস্তার সমস্ত জোলভরাট করিয়া কাটোয়ার আর বর্দ্ধমানের রাস্তার সঙ্গে যোগ করিয়া গাঁয়ের ভিতর হতে একটা পাকা রাস্তা বাহির করিয়া দিবেন বলিতেছেন, ঠিক এমন সময়ে বাবা ও আমি নূতন দীঘী হইতে বেড়াইয়া আসিতেছি। আমাদের দেখিয়া সকলে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিল। বাবা সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাড়ী ফিরিলেন, জমীদারের ধানের গোলা পূরিল না, মহাজনের মুখেও হাসি দেখা গেল না, চাষার ভাঙ্গাঘরে নূতন চাল উঠিল গ্রামে একটা শান্তির, তৃপ্তির ভাব জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

পিতার সহিত হেরম্ব বাবুর সদ্ভাব ইদানী একেবারেই গিয়াছে। তাঁহার প্রজাদের উপর অন্যে আসিয়া যে এতটা দয়া করে, এটা তাঁহার বড়ই অসহ্য হইতে লাগিল। কর্ত্তাদের বিবাদের সহিত আমাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। শতদল যদিও বয়সে আমার অপেক্ষা অনেক

ছোট, তথাপি সেই আমার খেলার সঙ্গী ছিল। নূতন দীঘির পাড়ে পিতা একটী কুঠারী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সেখানে সকালে বৈকালে তিনি ঈশ্বর আরাধনা করিতেন। একদিন সেই ঘরের বারান্দায় বসিয়া দুজনে এক পয়সা মূল্যের তাস খেলিতেছি, এমন সময়ে দূরে একটা ঘনীভূত চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া শতদল কাঁপিয়া উঠিল, আমিও দাঁড়াইয়া উঠিলাম। তখন দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। আমাদের বাটীর নিকটে আসিয়া দেখি, বিপরীত দিকের রাস্তায় ভীমাকৃতি বহু লোক লাঠি লইয়া একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। তাহাদের সেই ভীষণ চীৎকার এবং ভ্রুকুটীময় দৃষ্টি দেখিয়া শতদল কাঁদিয়া ফেলিল। দেখিলাম আমাদের বাটীতেও গ্রামের বহুলোক জমিয়াছে। ক্রমে আমাদের মাথার উপর দিয়া অস্ত্র সকল যাতায়ত করিতে লাগিল। জীবনের সেই ভীষণ মুহূর্ত্তে ব্যাকুল আবেগে উভয়ে উভয়কে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম।

একটু পরেই যুদ্ধ থামিয়া গেল। তখন ভীড়ের ভিতর হইতে একটা লোক শতদলকে কোলে তুলিয়া লইতে আসিল। শতদল কিন্তু আমাকে একলা ফেলিয়া তাহার সহিত চলিয়া যাইতে চাহিল না। তখন সে আমাদের দুই জনকেই কোলে করিয়া হেরম্ববাবুর বাড়ীতে লইয়া গেল। হেরম্ববাবু উদগ্রীব হইয়াছিলেন, তিনি শতদলকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলিয়া লইলেন এবং শত চুম্বনে আপ্লুত করিয়া বার-বার বলিতে লাগিলেন,—"মা তুই আজ ওখানে কেন গেলি, তোর গায়ে অস্ত্র লাগবে বলে যে আমি কিছু করিতে পারিলাম না, নইলে দুষ্টকে আজ রীতিমত সাজা দিতাম।" কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমি শতদলকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দল, আমি বাড়ী যাই?" সে ছোট করিয়া একবার ঘাড় নাড়িল। রাস্তায় বাহির হইয়া দেখি দামুকাকা একগাছা লাঠি হাতে করিয়া উন্মাদের মত ছুটিয়া অগ্রসর হইতেছে, আমাকে রাস্তায় দেখিবামাত্র কোলে করিয়া বাবার নিকট গিয়া পৌঁছিল।

পিতাকে বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যে আমাদের এই গ্রামের প্রায় সমস্ত জমীই লাখরাজ, এজন্য হেরম্ববাবুর মনে মনে আমাদের উপর রাগ থাকিলেও বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। তিনি সেই লাখরাজ বাজাপ্তির এক মিথ্যা মকর্দ্দমা করিয়া শমন লুকাইয়া আজ বাঁশগাড়ি করিতে আসিয়াছিলেন। যাহা হউক আপীলে হেরম্ববাবু হারিলেন এবং আমাদের লাখরাজ বজায় থাকিল।

বহুদিন হইয়া গেল দেশে যাই নাই, কাহার কাছেই বা যাইব, বাবা আমায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া দেওঘরে চলিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি সেখানে আমাদের একখানি বাংলা তৈয়ারী হইয়াছে। পিতার শরীর খারাপ, এখন দেশে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। কলিকাতায় মেসে না থাকিয়া আমি নিজেই একটী ছোট বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতাম। কলেজের অধ্যাপক মহাশয়ের অনুরোধে সহপাঠী নলিনকে আমার বাসায় থাকিতে লইয়াছিলাম।

তাহার কারণ নলিন বড়ই গরীবের ছেলে কিন্তু একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র. আমার নিকট থাকিলে তাহার খরচ লাগিবে না ; এদিকে আমিও একলা থাকি, তাহার মত সঙ্গী পাইলে আমার খুব সুবিধা হইবে। এবার দুজনেই এল-এ, পরীক্ষা দিয়াছি, পরীক্ষার পর কয়দিন আমোদ আহ্লাদে কাটিতেছে। নলিন বলিল—তাহার খুব শীঘ্রই বিবাহ হইবে, সেজন্য সে শীঘ্রই বাড়ী যাইবে এবং বিবাহে আমায় বরযাত্র যাইতে হইবে। রাস্তায় বিজ্ঞাপন দেখিলাম আজ ষ্টারে চন্দ্রশেখর হইবে। দুই বন্ধুতে সেদিন ষ্টার হইতে প্রায় দুইটা রাত্রে বাড়ী ফিরিলাম। ফিরিবার সময় গাড়ীতেই নলীন বলিল তার পেট কামড়াইতেছে, বাসায় আসিয়া বার দুই ভেদ ও বমি হইতেই, তাহার চোখ বসিয়া গেল। আমি প্রমাদ গণিলাম, ডাক্তারের পর আর বাড়ী করিয়া সমস্ত রাত জাগিয়া কাটাইলাম। রোগের ভয়ে বামুন চাকর পলাইল, সাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয় করিয়া নলিনকে বাঁচাইলাম। নলিনের পিতাকে টেলিগ্রাফ করিয়া আনাইয়াছিলাম! নলিনকে বাটী লইয়া যাইবার সময় নলিনের পিতা ও নলিন নিজে আমার নিকট অনেক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিবাহে যাইবার অনুরোধ জানাইলেন। নলিনের পিতা বলিলেন—বাবা, বিবাহ তোমাদের, দেশেই হেরম্ববাবুর কন্যার সহিত। হেরম্ব বাবু নলিনের মত একটী বিদ্বান অথচ গরীবের ছেলে চাহিতেছিলেন, তাঁহার একটী মেয়ে কিনা, জামাইকে ঘরে রাখিয়া মানুষ করিয়া দিবেন এই ইচ্ছা। তা বাবা তুমি নলীনের জীবনদাতা ও বন্ধু, তুমি না গেলে তো বিবাহে আনন্দ হবে না।" আমি বলিলাম আচ্ছা, আমি বাবাকে লিখিব। প্রাণের মধ্যে একটা তাড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল। শতদলের সহিত নলীনের বিবাহ।

পিতার অনুমতি পাইতে বিলম্ব হইল, আর আমারও কেমন একটা ইচ্ছা হইল না—বিবাহে গেলাম না।

নলিন ডাক্তারী লাইনে গেল। তাহার শ্বশুর সমস্ত খরচ দিবেন। যাতায়াতের সুবিধা হইবে বলিয়া সে মেডিকেল কলেজের নিকটে একটী মেসে উঠিয়া গেল। উভয় বন্ধুতে বিচ্ছেদ ঘটিল।

আমি বি, এল পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত পাশ হইয়া হাইকোর্টে বাহির হইতেছি। নলীনও এবারে এল, এম, এস, পরীক্ষায় উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়াছে। সে আমাদের দেশেই বসিবে শুনিলাম। আমি ভাবিলাম ভালই হইল, দেশে সুচিকিৎসকের অভাব ঘুচিল।

বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়াছি! বাবা এখনো দেওঘরে, তাঁহার ইচ্ছা আমার পাশ হওয়া উপলক্ষে দেশের ভদ্র ইতর সকলকে একদিন পরিতোষ করিয়া খাওয়াইতে হইবে। আজ সেই খাওয়ানর দিন, নলিনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শতকাজের মধ্যে কেবল নলিনের অপেক্ষা করিতেছি, রাত্রি দশটার সময় পত্র পাইলাম— "আজ সমস্ত দিন শরীরটা ভাল নাই, মাথা ধরিয়া আছে, সেজন্য তোমাদের বাটীতে

যাইতে পারিলাম না। আশা করি কিছু মনে করিবে না। ইতি—

তোমাদের নলিনাক্ষ।"

পত্র পড়িয়া আশ্চর্য্য হইলাম, ভাবিলাম এই কি সেই নলিন? হিরু বিশ্বাসকে ডাকিয়া তাহাকে নলিনের পত্রের কথা বলিলাম। হিরু বলিল, "বাবু, শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া উহার মাথা খুব গরম হইয়া গিয়াছে। আমাদের উপর অত্যাচার করিতে তিনি হেরম্ববাবুকে ছাড়াইয়া যান্। আর যাহারা আপনার পিতার গোলা হতে ধান 'বাড়ি' লয় বা কম সুদে টাকা কর্জ্জ লয় তাদের উপর ভারি রাগ, কিন্তু সকলের অপেক্ষা অত্যাচার হইতেছে আপনাদের দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাহারা ঔষধ লয় তাদের উপর। তিনি বলেন, ইহাতে তাঁহার পশারের ক্ষতি হচ্ছে—প্রজার যে সমর্থ নেই তা তিনি বোঝেন না। ভাবিলাম কি পরিবর্ত্তন!

সে দিন একটা মকর্দ্দমার কাগজ পত্র লইয়া সকাল বেলায় মাথা ঘামাইতেছি, এমন সময় চাকরটা একখানি পত্র দিয়া গেল। পিতার পত্র দেখিয়া তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—আমার বাটী যাওয়া স্থগিদ থাকিল! হিরুর মকদ্দমা না মিটিলে যাইব না। তুমি পত্র পাঠ দেশে চলিয়া যাইবে। হিরু এইরূপ লিখিতেছে.—"দাতব্য চিকিৎসালয়ের রোগীদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার, আমার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল, আমি সেদিন নলিনাক্ষ বাবুর মুখের উপর স্পষ্টই বলিয়াছিলাম যে—'প্রজার ঘরে অর্থ নাই,—তারা অন্যের দয়ায় বিনা খরচে যদি সারিয়া উঠে, তাহাও কি জমীদারের সহ্য হইবে না? আমার মাত্র এই দোষ। এই অপরাধে জমীদারের গোমস্তা বরকন্দাজ আনিয়া কলারাত্রে আমার ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া আমার যথা সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে।

দুই পক্ষেরই বিশেষ তদ্বির হইল কিন্তু পরিশেষে জমীদারের দুই জন বরকন্দাজের ৬ মাস করিয়া এবং হুকুম দেওয়া জন্য গোমস্তার এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

বহুদিন পরে পিতা বাড়ী আসিবেন। বাড়ী ঘরদোর পরিষ্কার করাইবার জন্য কদিন এখানে আটকাইয়া আছি, কল্য কলিকাতা যাইব মনস্থ করিয়াছি। বৈকালবেলায় আমি ও হিরু বিশ্বাস নূতন দীঘির ধারে, বাগানে বেড়াইতেছি, সন্ধ্যা হইল দেখিয়া হিরু চলিয়া গেল। আমি আমার সেই বাল্যের খেলিবার স্থলে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতেছি, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে উপর্য্যুপরি দুইবার আমার মাথায় লাঠির আঘাত করিল। আমি চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তিন দিন সংজ্ঞা ছিল না, চতুর্থ দিনে চৈতন্য হইলে দেখিলাম শিয়রে বসিয়া আমাদের সেই চিরভক্ত হিরু বিশ্বাস; আমার চৈতন্য হইতে দেখিয়া সে আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িল। তারপর উহার নিকট আমার চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, নলিন স্বয়ং আমার চিকিৎসা করিতেছে! তৎপরে জানিতে পারিলাম যে আমি আহত হওয়ার

কয়েক ঘণ্টা পরে রাত্রি অধিক হইলে, শতদল ও নলিন আমায় দেখিতে আসে, তাহাদের সঙ্গে কেহ ছিল না। আমার অবস্থা দেখিয়া শতদল বালিকার ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। হিরুর সাহায্যে নলিন নিজে যে সমস্ত ঔষধ তাহার সহিত আনিয়াছিল, সে সমুদয় দিয়া আমার ক্ষতস্থান সমূহে পটী জড়াইয়া দেয়। তাহারা নিত্য ঐ সময়ে আসে এবং ভোরের সময় চলিয়া যায়। শতদল সমস্ত রাত্রি মাতার ন্যায় আমার সেবা করে। নলিন এবং শতদল সেদিনও অধিক রাত্রে আসিয়াছে। আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, গোলমালে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিলাম শতদল বসিয়া বাতাস করিতেছে। আমায় জাগিতে দেখিয়া সে আমার মুখে আস্তে আস্তে একটু একটু করিয়া গরম দুধ ঢালিয়া দিতে লাগিল। দুধ খাওয়াইয়া সে আবার পাখা লইয়া বসিল। সেই সরল বালিকার আজ এই মাতৃরূপ দেখিয়া একান্ত বিস্মিত হইলাম। তারপর অতি সহজ ভাষায় সে বলিতে লাগিল.—"আমরা তোমার নিকট শত সহস্র অপরাধে অপরাধী, তুমি আমাদের সব দোষ ভুলে গিয়ে আমাদের ক্ষমা কর দাদা—"বুঝিলাম, কাহার জন্য শতদলের এই কাতর অনুরোধ। তখনি জানলার নিকট কে একজন উন্মাদ-আবেগে কাঁদিয়া উঠিল—নলিনের কণ্ঠস্বর—অনুশোচনার তীব্র আঘাতে আজ সকল ব্যবধান টুটিয়া গিয়াছে! সে আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে আমার বুকের উপর আসিয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল,—"ভাই! ভাই, আমায় ক্ষমা কর; তুমি একবার আমাকে মৃত্যুর হাত হতে বাঁচিয়েছিলে, কিন্তু আমি যে তোমায় আর একটু হ'লেই মেরে ফেলেছিলাম। শুনিয়া যুগপৎ ভীত ও স্তম্ভিত হইলাম।

পিতৃদেব দেশে ফিরিয়াছেন। তিনি দেওঘরেও এক কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রমে এবং কলিকাতার কোনও এক প্রথিত নামা ডাক্তার বাবুর অর্থে তথায় একটী অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি বহুদিন পরে সুস্থ শরীরে আবার দেশে ফিরিয়াছেন দেখিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হইল না।

কিছুদিন হইল শতদল একটী মৃত পুত্র প্রসব করিয়াছে, তাহার পূর্ব্ব হইতেই উহার ভয়ানক জ্বর হইতেছে। প্রসবের পর হইতে রোগের উপসর্গ সকল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ডাক্তারেরা বলিলেন,—যে রক্ত দূষিত হইয়া গিয়েছে। আদালত হইতে আসিয়াই নলিনের টেলিগ্রাফ পাইলাম—স্ত্রীর শেষ অবস্থা, বিপদের সময় একবার আসিও। রাত্রি এগারটার গাড়ীতে রওনা হইয়া বৈকালে গ্রামে পৌছিলাম। আসিয়া দেখি পিতার মুখে বিষাদের ছায়া, তিনি কোথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—শতদলের কোনও সংবাদ পাইয়াছেন কি? তিনি বলিলেন হাঁ তুমি শীঘ্র প্রস্তুত হও। আজ হেরম্ব আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন. অতি সত্বর পিতাপুত্রে বাহির হইলাম। হেরম্ববাবুর বাটীর নিকটে আসিয়া দেখি যে তিনি দরবিগলিত নেত্রে ক্ষিপ্তের ন্যায় ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে-

ছেন, পিতাকে দেখিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,— ভাই। আজ আমার সব ফুরায়ে গেল, আমার জীবনের উৎস—একমাত্র অবলম্বন আমার শতদলের শেষ সময়। এই শ্মশানক্ষেত্রে দেবতার কথা মনে পড়ে যায়, তাই তোমার কথা আজ মনে পড়ে গেল। তোমার উপর যত অত্যাচার করেছি, সে সমস্ত পাপের আজ প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল। এস ভাই, শতদলকে একবার শেষ আশীর্ব্বাদ করবে। সকলে তুলসী তলায় আসিয়া পৌঁছলাম। আমায় দেখিয়া নলীন ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, আমি তাহাকে নিরস্ত হইতে বলিলাম; দেখিলাম, সেই কমনীয় মুখ-মণ্ডলে একটী স্বর্গীয় সুষমা বিরাজমান। জীবনের শেষ রেখাটুকু মুছিয়া যাইতে আর বিলম্ব মাত্র নাই।

সব ফুরাইয়া গিয়াছে। হেরম্ববাবু শেষ জীবনটা কাশীতে কাটাইবেন মনস্থ করিয়াছেন। উইলে আমাকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিলেন। লিখিত হইল যে তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন বার্ষিক ছয়শত টাকা করিয়া নিজের খরচ লইবেন। তাঁহার সম্পত্তির বক্রী সমস্ত আয় একটী অতিথিশালায় ব্যয়িত হইবে। এখন তাঁহার বাটীই উক্ত অতিথিশালায় পরিণত হইবে।"

শ্রাদ্ধের দিন সেই তুলসী তলায় একটী স্মৃতি মন্দির স্থাপিত হইল। তাহার গাত্রে প্রস্তর ফলকে এই কথাকয়টি খোদিত করা হইয়াছিল,—

"গিয়াছে অমর আত্মা সে অমরধাম।
মাটীর দেহের হেথা মাটী পরিণাম ?

শ্রীজনরঞ্জন রায়।

মধুমতী।

মধুমতি ! তুই কিরে সেই স্বর্গ-মন্দাকিনী !
স্বরগ ছাড়িয়ে তুই এসেছিস হেথা !
রজত কিরণে হাসি আনন্দে যেতেছ ভাসি,
কোকিল কূজন সনে মিশাইয়া কল তানে
ধীরে ধীরে গাহি যাও স্বরগের গাথা।
তোরে তোর কি মলয় বহিতেছে সদা ?
কোকিলও আকুল হয়ে গাইতেছে গান ?
বার মাস কি বসন্ত সেথায় হয়না অন্ত !
তাই কিরে সারানিশি চাঁদের কিরণ রাশি
ঢালিতেছে সুধা রাশি মাতাইয়া প্রাণ !
তোরে দেখিবারে সদা হই গো ব্যাকুল
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা দগ্ধ হয় পোড়া প্রাণ ;
যেই দিন তব নাম শুনি আমি অবিরাম,
মধুময় "মধুমতি" ! ভক্তিপূত রসে মাতি
সেই দিন হতে মোর আনন্দ উজান।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

শ্রীশ্রীদুর্গা স্তোত্রম্।

শিবপুর নিবাসী, পরলোকগত পণ্ডিত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন নিভৃত কবি ও পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি ভক্তির উচ্ছ্বাসে যে সকল সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রার্থনা-গীতি রচনা করিতেন, তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়, প্রাণ গলিয়া যায়। আমরা নিম্নে তদ্রচিত শ্রীশ্রীদুর্গা স্তোত্রটি উপহার দিলাম। আশা করি ভক্তগণ মাতৃ-সন্নিধানে এই স্তোত্র পাঠ করিয়া ধন্য হইবেন।

সিন্ধু-ভৈরবী—তাল একতালা।

জানে ন কো বা কুত আগতোঽহং
জানে ন চান্তে ভবিতাস্মি কোঽহং।
জানে ন কিঞ্চিৎ সমুপৈমি যোঽহং
ত্রায়স্ব দুর্গে শরণাগতোঽহং ॥ ১
জানে ন কিং মে করণীয়মস্ত
জানে ন কিঞ্চাকরণীয়বস্ত।
জানে ন কো বা ভবপারসেতুঃ
জানে ন কো বা নিরয়স্য হেতুঃ ॥ ২
জানে ন কিং বাচরণং বিশুদ্ধং
জানে ন কিঞ্চাচরণং বিরুদ্ধং।
পশ্যামি জিঘ্রামি যদাচরামি
জানামি নাহং কিমিদং করোমি ॥ ৩
ত্বমেব সর্ব্বং বিদধাসি মাতঃ
নিমিত্তভূতং হি মদীয় চেতঃ।
দেহশ্চ চেতশ্চ তবৈব কোঽহং
ত্রায়স্ব দুর্গে শরণাগতোঽহং ॥ ৪
ত্বমেব ধাত্রী জগতাং বিধাত্রী
ত্বমেব মাতঃ প্রলয়স্য কর্ত্রী।
পয়শ্চ ভূমিশ্চ নভশ্চ বাতঃ
ত্বমেব বহ্নিঃ সকলস্য চেতঃ ॥ ৫
জানামি নাহং কিমিবানাদস্তি
যস্মিন্ হি সত্তা তব দেবী নাস্তি!
ত্রায়স্ব মামস্ব তবৈব দেহং
ত্রায়স্ব দুর্গে শরণাগতোঽহং ॥ ৬
কালপ্রবাহে মম কায়নৌকা
ধাবত্যকর্ণা বিগতা পতাকা।
হাহা সদা তত্র বিপাকশঙ্কা
আবর্ত্তঘোরেঽত্র পতিষ্যতেকা ॥ ৭
মাতঃ কিয়ন্মে বলমস্তি দেহে
যেনেন্দ্রিয়োর্ম্মীনিহ তর্ত্তুমীহে।
বাতোঽতিচণ্ডো রিপবোঽতিভীমাঃ
আচ্ছাদ্য নেত্রে প্রচরন্তি ধূমাঃ ॥ ৮
গর্জ্জন্তি শীর্ষোপরি কালমেঘাঃ
স্ফূর্জ্জন্তি বজ্রাণি শিলাম্বুসঙ্ঘাঃ।
ভিন্দন্তি মর্ম্মাণি মহাবিপন্নং
সংরক্ষ দুর্গে শরণং প্রপন্নং ॥ ৯
শীলং বহিত্রং শতধা বিভগ্নং
ছিন্নঞ্চ বস্ত্রং গুণদণ্ডলগ্নং।
ধ্বান্তং প্রগাঢ়ং ন চ ভানুরেখা
জানে ন কা মেঽস্তি ললাট-লেখা ॥ ১০
দূরেঽস্তু রত্নং ন চ কূলমাপ্তং
সংসারসিন্ধৌ সকলং বিলুপ্তং।
কারাম্বুদগ্ধং পরমাস্য বিম্বং
দীনায় দেহম্ব করাবলম্বং ॥ ১১
বৎসস্য তুষ্টৈ প্রদদাসি মাতঃ
মাতুঃ স্তনে স্তন্যমহো কৃপাতঃ।
কারুণ্যপূর্ণে ত্বয়ি বৎসলায়াং
হাহা বিপন্নে কিমহং ধরায়াং ॥ ১২
দীনোঽহমার্ত্তো বিলপামি মাতঃ
নাদ্যাপি জাতো ময়ি দৃষ্টিপাতঃ।
কা বা ভবেদম্ব তবেহ শক্তিঃ
পাপস্য ন স্যাত্বমি মে বিমুক্তিঃ ॥ ১৩
জানেঽতিঘোরং মম পাপমস্তি
নো চেৎ কথং কষ্টমহো ন যাতি।
পাপং যদেবাস্ত মহাবিপন্নং
ত্রায়স্ব মাতঃ শরণং প্রপন্নং ॥ ১৪
জানে ন ভক্তিং জানে ন পূজাং
মূর্খাধমোঽহং খলু দেহভাজাং।

মাতর্ম্মহাপাতকিনং ক্ষমস্ব
দুর্গে কুপুত্রে করুণাং কুরুষ্ব ॥ ১৫

দুঃখ কি অন্তরায় নহে ?

আজ এই প্রবন্ধে ধর্ম্মোন্নতির অন্তরায় যে দুঃখ, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। দুঃখের কথা আজ বলিব, এবং সুখও যে অন্তরায় তাহা আর একদিন বলিব। পূর্ব্বে "বুঝাইবার" কথাটি লিখিলাম ; এই জন্য, যে অনেকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াও বলিতে চাহেন না যে দুঃখ মানবের ধর্ম্মোন্নতি করিবার পক্ষে প্রতিবন্ধক। তাঁহারা বলেন—যে যতই দুঃখে পড়ুক না কেন, ভগবানে মতি রাখিবার চেষ্টা করিলে, নিশ্চয়ই সে তাহা রাখিতে পারে, তা ছাড়া, দুঃখে পড়িলে ভগবানে টান বরং বেশী হয়"। এ কথা যে সম্পূর্ণ সত্য নহে, আজ তাহাই দেখাইব। পাঠক আমার কথাগুলি বেশ করিয়া তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে আমার লেখনী ধারণ সার্থক হইবে।

আপনি এটা বোধ হয় জানেন, যে লক্ষ লক্ষ লোক কেবলই দুঃখ করিতেছে—আমাদের আর ধর্ম্মচিন্তা কোথা থেকে হবে, পেটটার জন্যেই অস্থির, তা অন্য চিন্তা করব কি ক'রে ? আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি এর ভিতর কোন সত্য নাই কি ? দু জন নয়, দশ জন নয়, শতজন নয়, কোটী কোটী মনুষ্য এই যে দুঃখ প্রকাশ করিতেছে, ইহার ভিতর কোন মহাসত্য নিহিত নাই কি ? নিশ্চয়ই আছে। দুই চারি জনের দুঃখ হইলে আমি দুঃখকে ধর্ম্মোন্নতির অন্তরায় বলিতাম না, বলিতে সাহসও করিতাম না। কিন্তু যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই যখন বলে—"অন্ন চিন্তা চমৎকারা" তখন এ বিষয়ে বিশেষ কোন সত্য নিহিত আছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন "সংসারে আবদ্ধ হইলেই অন্ধকার, নতুবা কষ্ট কি ! নির্লিপ্তভাবে দিন কাটাইবার চেষ্টা করিলে আর কোন কষ্টই থাকে না। সকলেরই ত খাওয়া পরা চলিতেছে। তবে আত্মোন্নতির চেষ্টা করে না কেন ? অনেক চাই, এত-চাই, তত-চাই করিয়া ঘুরিলে কি আর শান্তি স্বস্তি থাকে !"

কেহ যদি ও কথা বলেন, তাহা হইলে ঐ কথা বলিতে মনকে চোখ্ ঠারিয়া দিয়াছেন। মনের কথাটা খুলে বলুন দেখি। আচ্ছা, আপনি মনে করিলেন—সুখে সুখবোধ করিব না, দুঃখে দুঃখ অনুভব করিব না, কিন্তু কাজের সময় পারেন কি ? তর্কচ্ছলে "পারি" বলিবেন না। আপনার সংসারে দুঃখের পর অতুল ঐশ্বর্য্য হইল, আপনি সুখবোধ করেন না কি ? যদি বলেন "না"। মানিলাম সত্য।—মানিলাম আপনি নির্লিপ্ত সংসারী। কিন্তু আপনার বিষয় লইয়া ত সর্ব্বসাধারণের বিষয় বিবেচনা করা চলে না ! তাই বলি, বাস্তবিকই দুঃখ ধর্ম্ম কর্ম্মের একটী প্রধান অন্তরায়।

যাহাকে একমুষ্টি উদরান্নের জন্য হা হা করিয়া ঘুরিতে হইতেছে, যাহার সংসারে পরিবার বর্গ চারিটি ভাতের কাঙাল, যে অনাথ অনাথা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের কোন সুবিধা না দেখিয়া অহোরাত্র জীর্ণ বসনাঞ্চল দ্বারা চক্ষের জল মুছিতেছে, যাহার পিতৃবিত্ত নাই—

অভিভাবক নাই, যাহার মুখ চাহিবার কেহ নাই, অথচ থাকিলেও সাহায্য করিবার সামর্থ্য নাই, যাহাকে নিজের এবং দুঃখার্ত্ত পরিবার-বর্গের শাকান্ন সংগ্রহ করিবার জন্য যৎসামান্য বেতনের চাকরি যোগাড় করিতেও দেশ দেশান্তরে ঘুরিতে হইতেছে, কত লোকের তোসামোদ করিতে হইতেছে, তাহার কথা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ? ভাবিবার অবসর পাইয়াছেন কি ? যদি ভাবিয়া থাকেন, তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, দুঃখের যাতনা ভোগ করিবার কালে মানুষের অন্য কোন বিষয়ে উন্নতি করিবার সুযোগ কিরূপ !

যাহারা ঐ রকম দুঃখী তাহারা কি কেহ কখনও আত্মোন্নতির জন্য ইচ্ছুক নহে ? তাহারা সকলেই কি শুধু অর্থ পাইলেই সন্তুষ্ট ? তাহা হইতে পারে না। সকলে না হউক, কাহারও কাহারও যে আত্মোন্নতির ইচ্ছা প্রবল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু তাহারা ইচ্ছা সত্বেও কোন উপায় করিতে পারে না। সংসারকে দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করিয়া তাহারা অরণ্যের আশ্রয় লইতেও পারে না, অথচ সংসারে থাকিয়াও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ না হওয়ায় নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। বড়ই কষ্ট ! যাহারা বলে—দুঃখ আবার কি, তাহারা ভ্রান্ত ! জগতে সুখের প্রভাব আছে আর দুঃখের প্রভাব নাই ? সুখের রোমাঞ্চকর সংবাহন উপভোগ করিতে করিতে যাহাদের চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে, তাহারা আর্ত্তের দুঃখ, দরিদ্রের অন্নকষ্ট, রোগীর আর্ত্তনাদ, শোকার্ত্তের হৃদয়, মোহার্ত্তের বিক্ষিপ্ততা দেখিবে কোন্ চোখে ? সুখের আবেশে তাহাদের মন শিথিল হইয়া গিয়াছে।

তাই কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

চিরসুখী জন
ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন
বুঝিতে পারে,
কি যাতনা বিষে,
বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে
দংশেনি যারে ?

যাহারা জীবনে অর্থকষ্ট বা বিশেষ একটা শোক তাপ পায় নাই, তাহারা—দুঃখটা কেমন, দুঃখ ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোনরূপ প্রতিবন্ধক কি না, কেমন করিয়া বুঝিবে! অনুভব আর কল্পনা স্বতন্ত্র জিনিষ! আপনি বলিতে পারেন, "দুঃখী কি আর ধর্ম্মাচরণ করে না ?"

আমি তা বলিতেছি না। দুঃখীই ত ধর্ম্মাচরণ করে। ধর্ম্মে যদি কাহারও মতি থাকে, ঈশ্বরে যদি কাহারও অগাধ ভক্তি থাকে ত সে দুঃখীর আছে। দুঃখীর হৃদয় নির্ম্মল ও স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায় স্বচ্ছ বলিয়াই পরম দয়ালের ছবি তাহাদের হৃদয়ে অহরহঃ জাগে। ভগবানকে স্মরণ করিয়া যাহার চক্ষে কখনও জল না আসে, যাহার কখনও কান্না না পায়, সে কি ভক্তিমান ? অর্থবান লোক দুঃখের ছ্যাঁকা না পাইলে, সহজে ধর্ম্মপ্রবণ হইতে চায় না।

এখন প্রশ্ন করিতে পারেন, যে দুঃখীরাই যদি সুখী ও বিলাসী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা ঈশ্বরে বেশী ভক্তিমান হইল, তবে দুঃখ আত্মার অন্তরায় হইল কিরূপে ?

অন্তরায় এইজন্য যে—তাহারা অহোরাত্র অর্থচিন্তায় ও অন্নচিন্তায় বিব্রত থাকে বলিয়া চিত্তে 'অভিনিবেশ' নামক জিনিষটির লোপ হয়। এটুকুই দুঃখ। তাহারা বলে—হে ভগবান্ কতদিনে নিশ্চিন্তমনে তোমাকে ডাকিব। পাঠক বোধ হয় জানেন, যে ঈশ্বর-চিন্তায় মন একাগ্র না হইলে বেশ সুখ বা শান্তি পাওয়া যায় না। তাই বলি—দুঃখী ব্যক্তি ভগবানকে ডাকিয়াও শান্তি পায় না। কারণ মন নানা চিন্তায় আহত, প্রহত হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। দুঃখের কারণ বা অভাব নষ্ট না হইলে, সে মন জোড়া লাগিবে না এবং তাহা না হইলে ভগবানকে ডাকিয়াও শান্তি নাই। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবে, না ভগবানকে চিন্তা করিবে!

যদি বলেন "মানুষের অভাব কখন মিটে না"—তাহা ঠিক নয়। অভাব মিটিতে পারে, আশা মিটে না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে, অভাবপূরণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বগ্রাসী আশা ক্রমশঃ ক্রমশঃ মানবের হৃদয়ে স্থান অধিকার করে, এবং যে অভাব—সে অভাবই থাকিয়া যায়। একথা নিতান্ত মিথ্যা নহে। তখন চক্ষু হইতে ভগবানের জন্য যে পবিত্র জলবিন্দু ঝরিয়া পড়িত, তাহা অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন সুখবাসনা আবার ধর্ম্মচিন্তায় অন্তরায় হইয়া পড়ে। মোট কথা দুঃখের দংশন ও সুখের সংবাহন সমভাবে চিত্তে বিক্ষিপ্ততা আনে। সময় পাইলে পাঠককে সুখের বাসনার জন্য বিক্ষিপ্ততা কেমন, তাহা বলিবার আশা রহিল।

শ্রীমুনীন্দ্র নাথ জ্যোতীবরত্ন।

নিরাশ প্রেম।

শত বাধা পদে পদে
অসমাপ্ত রহিল এ মধুর মিলন।
খুলে দাও বাহু-পাশ,
মিটিবে না হৃদিআশ
অপূর্ণ থাকিয়া যাক্ মিলন এখন।
এই নব প্রেমোচ্ছ্বাস
হৃদয়ে হৃদয়ে ভাষ,
জীবন বসন্তে এক সুখের স্বপন,
ভোলো প্রিয়ে, ভুলে যাও
হিয়া মোর ফিরে দাও
যাই দূরে দেশান্তরে লভিতে মরণ
অসমাপ্ত থেকে থাক্ প্রথম মিলন।
ভুলে যাও সব সাধ,
বাধ সংযমের বাঁধ
ছুটুক তাহার মাঝে অবশ প্রণয়;
ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে
পড়ুক আছাড় খেয়ে
কঠিন বেলার' পরে হোক তার লয়
হেথা বুকভরা এই আশা মিটিবার নয়।
যেথা প্রেমে নাহি বাধা
নাহি কাঁদা নাহি সাধা
নাহি দ্বেষ হিংসা মান সমাজ শাসন
(সেই) জীবনের পর-পারে
পূত মন্দাকিনী ধারে,
ধুয়ে নিয়ে দুজনার কলঙ্কী জীবন;
চাঁদের আলোর পর
রচিব ফুলের ঘর
পাতিব নূতন করি সুখের সংসার।

না থাকিবে বেলা-বাঁধ
মিলিবে চকোরী চাঁদ
উদ্বেল অনন্ত প্রেম ছুটিবে আবার ;
কোটি যুগ অন্তে নাই মরণ তাহার।

শ্রীরণধীর চট্টোপাধ্যায় বি, এ।

শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুণের আদর সর্ব্বত্র। যাহার যত টুকু গুণ ভগবান যে তাহাকে সেই অনুসারে পুরস্কৃত করেন, তাহা আমরা রামপদ বাবুর চরিত্রে বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। যাহার বিষয় আজ আমরা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতেছি, সেই রামপদবাবু সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের পরিচালন ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত তাহা পরিচালিত করিয়াছিলেন। "মানব-চিত্র" "সংসার-চিত্র" ও "জীবন-সংগ্রাম" নামে ইহার তিন খানি সুবৃহৎ উপাদেয় ধর্ম্মমূলক উপন্যাস বাজারে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার কয়েক খানি পুস্তক ছয় মাসের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া দ্বিতীয় সংস্করণ আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতেই তাঁহার গুণপণার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রামপদ বাবু হুগলী জেলার অন্তর্গত সন্নাটী মায়াপুর গ্রামে ১২৮১ সালের ৬ই ভাদ্র রবিবার জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা ৺রামময় বন্দ্যোপাধ্যায় ; পিতামহ ৺কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তদানিন্তন হিন্দু সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা সদাশয়তা পরোপকারপরায়ণতা তাহাদিগকে দেশের ও দশের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী করিয়াছিল। পূজা-পার্ব্বনে দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন দান, অতিথি-সৎকার প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে তাহাদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ইঁহাদের পবিত্র চরিত্র, রামপদবাবু তাঁহার "জীবন-সংগ্রাম" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। পিতার যাবতীয় গুণ সন্তানে সংক্রামিত হইয়া থাকে, রামপদ বাবুর তাঁহার পিতৃদেবের স্মৃতি রক্ষার্থ পৈতৃক সম্পত্তি দীন-দরিদ্রের সেবায় উৎসর্গ করিবার বাসনা করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার হৃদয়ে বল দিন, তাঁহার এই সাধু সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হউক। চাকুরীর নেশা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে দেশীয় যুবকগণ ব্যবসার প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারে ; রামপদবাবু তজ্জন্য ব্যবসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র "ব্যবসায়ী" পরিচালক বর্গকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। রামপদবাবু ভগবানের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ "মণিলাল" নামে একটী পুত্র রত্ন লাভ করেন। কিন্তু শিশুটী অকালে কাল কবলিত হওয়ায় সেই স্বর্গীয় শিশুর স্মৃতিকল্পে "মণিলাল কোং" নামে একটী জুয়েলারী কারবার স্থাপন করিয়াছেন। নিরীহ ভদ্রমহোদয়গণ দেশীয় স্বর্ণকারের প্রলোভনে পড়িয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার সময় প্রতারিত না হন এই উদ্দেশ্যে উক্ত কারবারের স্থাপনা, তাঁহার এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। আজকাল কলিকাতা সহরে "মণিলাল কোম্পানীর" প্রসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। দেশীয় রাজা, মহারাজা, জমীদার, উকীল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি সকলেই ইহাদের সুভক্ত

দর্শনে ইহাদের নিকট অলঙ্কার প্রস্তুত করাইতেছেন। ভগবান রামপদ বাবুকে দীর্ঘজীবী করিয়া এইরূপ সৎকার্য্যে ব্যাপৃত রাখুন—ইহাই প্রার্থনা।

—

মাসিক পত্র সমাচার।

(প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৯)

এবার প্রবাসীর স্থচি করেছিলেন কে? বোধ হয় বিশেষ কোন কারণে তথাকথিত কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের "বিশ্বকর্ম্মার বিজয় যাত্রা" নামক কবিতাটি স্থচিতে স্থান পায় নাই। পাঠ্যবিষয়ের মধ্যেও যদি স্থান না পাইত, কোন দুঃখ থাকিত না।

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "জন্ম কর্ম্ম এবং আচার" গবেষণাপূর্ণ ও সুখপাঠ্য।

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর "রবীন্দ্র নাথের জীবন দেবতা" নামক প্রবন্ধে "আইডিয়া" কথাটি অনেকবার আছে। রবীন্দ্রনাথের এক পত্র উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তাহার মধ্যে এক জায়গায় আছে—"আমরা দুজনে একলা মুখোমুখী করে বসলেই আমাদের পরিচয় অল্প অল্প মনে পড়ে।" অজিতকুমার রবীন্দ্রনাথকে কি ঠাউরেছেন কে জানে!

"বিবিধ প্রসঙ্গে" এক জায়গায় লেখা আছে —"সংপ্রতি কলিকাতা টাউন হলে একটী স্মৃতি সভা উপলক্ষে কোন কোন মান্য গণ্য ব্যক্তি কলিকাতার কোনো কোনো থিয়েটারের প্রশংসা করিয়াছিলেন কাগজে এইরূপ দেখা গেল। ইহা সত্য হইলে গভীর পরিতাপের বিষয়।" বটে? তোমরা থিয়েটার ভাল বাস না, বা গিরিশচন্দ্রের নিন্দা কর বলিয়া কি থিয়েটারের প্রশংসা করা পরিতাপের বিষয়? আমরি কি বিদ্যাবুদ্ধি! বলিতেও লজ্জা করে না এই আশ্চর্য্য গ্রাহকগণ অনেকে প্রবাসীর কথা জানে না, তাই প্রবাসী গ্রহণ করে। প্রবাসীর বাহিরের রঙ চঙ ও খুমসো গতর দেখিয়া তাহারা লোভ সংবরণ করিতে পারে না। নৈলে টাকা দিয়া অমন কাগজে কেহ হাত দিত না।

(সাহিত্য, আশ্বিন, ১৩১৯)

প্রায় সকল লেখাই সুপাঠ্য! বেশ চলিতেছে। 'সাহিত্য' দীর্ঘজীবী হউক। উদীয়মান কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "রেবা" নামক কবিতাটি সুখপাঠ্য নহে। কবিতার ভাষা সুমিষ্ট ও সহজবোধ্য না হইলে, কিচ্‌কিরির কুদো দিয়ে দাঁত ভাঙ্গার মতন হয়। সত্যচরণ শাস্ত্রী লিখিত "প্রাচী-ভ্রমণ" পড়িবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া রহিলাম।

(ভারতী, বৈশাখ, ১৩১৯)

প্রথমেই গোধূলি নামক একটী তে-রঙা ছবি। আহামরি হয় নাই। বর্ষ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে গোধূলির ছবি কেন? "বন্দনা" একটী কবিতা। সম্পাদিকা নিজেই রচয়িত্রী। ১৬ পঙক্তির মধ্যে দুইটী পঙক্তিতে ছন্দপতন হইয়াছে।

হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত "নীলভূধর"এ লেখায় আছে,"জগন্নাথের রত্নবেদীর পশ্চাদ্ভাগে লিখিত আছে—

শকাব্দে রন্ধ্র শুভ্রাংশু রূপ নক্ষত্র নায়কে।
প্রাসাদং কারয়ামাসানঙ্গভীমেন ধীমতা॥"

হেমেন্দ্র বাবু উহা হইতে ১১১৯ শকাব্দ পাইলেন কেমন করিয়া? রন্ধ্র=৮, শুভ্রাংশু=চন্দ্র=১, রূপ=১, নক্ষত্রনায়ক=চন্দ্র=১। এখন, অঙ্কস্য বামাগতি, এই সূত্র ধরিয়া হিসাব করিলে হয় ১১১৮ শকাব্দ। সুতরাং ১১১৯ শকাব্দের উপর সন্দেহ হওয়া উচিত। হেমেন্দ্রবাবু কিরূপে ১১১৯ করিলেন বুঝাইয়া দিলে সুখী হইব। জ্যোতিষশাস্ত্রে রন্ধ্র অর্থে লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান। এবং তাহা হইতেই রন্ধ্র হইতে ৮ আসিয়াছে, বলিয়া অনুমিত হয়।

শ্রীবৃহস্পতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বড়ই দুঃখের বিষয় আমরা আজ ৬। ৭ মাস সকলের নিকট "আলোচনা" পাঠাইতেছি কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাগিদ সত্বেও আমরা বার্ষিক মূল্য

পাঠাতেছি না। ভিঃ পিঃ করিলে অম্লান বদনে গ্রাহকগণ ফেরৎ পাঠাইয়া আমাদিগকে সকল প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করেন। ইহা কিরূপ ভদ্রতা তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ৬।৭ মাস পত্রিকা লইয়া টাকা দিবার সময় ফেরৎ দেওয়া কি ভদ্রোচিত? কার্য্য যাহা হউক আমরা ক্রমশঃ সকলেরনামেই কেবল মাত্র পত্রিকা দিয়া ১॥৴ আনা ভিঃ পিঃ করিব। তৎপরে যাঁহার উপহার আবশ্যক হইবে; ভিঃ পিঃ গ্রহণের পর আমাদিগকে পত্র লিখিলেই ॥০ আনা লইয়া সেই সুবৃহৎ রামায়ণ বা মহাভারত যাহার যাহা ইচ্ছা লিখিলেই পাঠাইয়া দিব। থাড় লইলে ১৷৷০ টাকা দিতে হইবে একণে আমাদের সবিনয় নিবেদন—পুরাতন বা নূতন গ্রাহক যাহারা পত্রিকা লইবেন না তাহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভিঃ পিঃ করিতে নিষেধ করিবেন এবং পূর্ব্ব-প্রাপ্ত সংখ্যাগুলি আমাদের ফেরৎ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আমরা স্বদেশ বাসী, আমাদের বৃথা লোকসান করাইয়া তাহাদের কি ফলোদয় হইবে বুঝিতে পারি না বরং সামান্ন বার্ষিক সাহায্য করিলে একটী সৎকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করা হয়, ইহা ভাবিয়া কার্য্য করিলে আর দুঃখ কি? ক্রমশঃ সকলের নামে কেবল মাত্র পত্রিকা ভিঃ পিঃ করিব। পূজার সময় যাহারা স্থানান্তরে যাইবেন, পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহারা পোষ্ট আপিসে বলিয়া যাইবেন। ম্যানেজার।

শুক্তি।

বহু সাধনায় সংগৃহীত কাব্য সমুদ্রের মুক্তো ভরা শুক্তি।

দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

ভাব ও ভাষার মাধুর্য্যে ছন্দের লালিত্যে, ছাপার পারিপাট্যে এবং বিখ্যাত শিল্পি রচিত ছবির সৌন্দর্য্যে শুক্তি এক অভিনব সামগ্রী। পুত্র কন্যা, ভাই-ভগিনী, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, যে কাহারও হাতে পূজার মঙ্গলানুষ্ঠান কালে উপহার দিবার এমন সুন্দর পুস্তক অতি অল্পই আছে মূল্য অতি সুলভ ॥০ আট আনা মাত্র। প্রকাশকের নিকট (অথবা কলিকাতা ১৮নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকুমার রায়ের নিকট) চিঠি লিখিলেই যথাসময়ে পুস্তক পাইবেন। শ্রীকালীচরণ ত্রিবেদী।
সম্পাদক—মানভূম পুস্তকালয়।

মেদিনীপুর হিতৈষী।

মেদিনীপুরের একমাত্র বৃহৎ ও বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। জেলার কালেক্টরীর ও দেওয়ানী আদালতের সমুদায় ইস্তাহার মুদ্রিত হয়। প্রত্যেক দেন্দারকে এক একখানি করিয়া কাগজ প্রেরিত হওয়ায় বহু নূতন নূতন ব্যক্তি পাইয়া থাকে। উহাতে বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রচুর লাভ। বিজ্ঞাপনের দর সুলভ।

কলঙ্ক—ভক্তের ভগবান—প্রণয়ীর পত্র।

উৎকৃষ্ট সত্য ঘটনামূলক গ্রন্থ। পাঠে কলঙ্কের ভয় থাকিবে না। কলঙ্কীও সাবধান হইবেন। ভাষার লালিত্য ও মধুরতায় মুগ্ধ হইবেন। শিক্ষার চূড়ান্ত। রস ও রসিকতার প্রস্রবণ। হাতে পড়িলে পাঠ শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারিবেন না। মূল্য বাঁধাই ৸০ আনা, আবাধা ॥৵০ আনা।

ভক্তের ভগবান অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। সতীর পতিভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও ভগবানের ভক্তরক্ষা দেখিয়া চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসিয়া যাইবে। না পড়িলে বুঝা যায় না। মূল্য ।০ আনা।

প্রণয়ীর পত্র স্ত্রীপাঠ্য। সতীর পতিভক্তি ও কর্ত্তব্য সম্পাদন দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য্যে, বিষয়ের পরিস্ফুরণে ও শিক্ষায়—ইহা অমূল্য। মূল্য ।০ আনা।

পুস্তক তিনখানি পাঠ করিয়া মুগ্ধ না হইলে মূল্য ফেরত দিব।

কার্য্যাধ্যক্ষ—মেদিনীপুর হিতৈষী, মেদিনীপুর।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামমূর্ত্তী নাইডু।

গোপা।

মহাত্মা বুদ্ধদেব সূর্য্যবংশোদ্ভূত ক্ষত্রিয় রাজপুত্র। তাঁহার প্রকৃত নাম সিদ্ধার্থ। পিতা শুদ্ধোদন কপিলাবস্তুর রাজা ছিলেন। সর্ব্বজীবে দয়া ও অহিংসা তাঁহার ধর্ম্মের সার তত্ত্ব। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই এই উচ্চ ধর্ম্মে সম অধিকারী।

বৌদ্ধ দুই প্রকার ; গৃহী ও ভিক্ষু। ভিক্ষু সন্ন্যাসী বৌদ্ধেরা গৃহী ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন জন্য মঠে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধনা এবং ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি কঠোর সাধনায় সিদ্ধি ও সমুন্নত ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করায়, বুদ্ধদেব নামে ভুবন বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন।

গোপা দেবী এই ভুবন বিখ্যাত মহাত্মা মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের সর্ব্বগুণবতী বণিতা এবং কলি দেশাধিপতি মহাবীর মহারাজা দণ্ডপাণির প্রাণাধিকা দুহিতা।

বিবাহের পূর্ব্বে একদা সিদ্ধার্থ অশোকভাণ্ড বিতরণার্থ বহুরাজ কন্যাকে নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রিত নৃপতি-নন্দিনীরা একে একে আসিয়া সকলেই অশোকভাণ্ড গ্রহণান্তর চলিয়া গেলেন। সর্ব্বশেষে গোপাদেবী অশোক ভাণ্ড গ্রহণ জন্য উপনীত হইলেন। তখন অশোকভাণ্ড সব নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। সিদ্ধার্থ রাজকুমারী গোপাকে অশোকভাণ্ড প্রদানে অসমর্থ হইয়া বড় লজ্জিত হইলেন।

গোপা কহিলেন,—"কুমার ! আমি নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছি, অশোকভাণ্ড না লইয়াই ফিরিয়া যাইব কি ?

গোপার অপ্সরা বিনিন্দিত পরম সুন্দর রূপ-মাধুরী দর্শন এবং বীণা ধ্বনিবৎ অমিয় মধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া সিদ্ধার্থ মুগ্ধ হইলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় অঙ্গুরীয়ক উন্মোচন করিয়া গোপার করে অর্পণ করিলেন। কুমারী গোপা আপন হৃদয় মন্দিরে সিদ্ধার্থের পবিত্র মূর্ত্তি নয়ন চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া, দেবতার চরণে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের ন্যায় অলক্ষ্যে তাঁহা-দুই চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া পিতৃ ভবনে প্রতিগমন করিলেন।

যথা সময়ে রাজকুমার সিদ্ধার্থের সহিত কুমারী গোপার শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। উৎসবের আনন্দ কোলাহলে রাজভবন মুখরিত হইয়া উঠিল। এ মণি-কাঞ্চন সংযোগে পুরীস্থ সকলেই সুখী হইলেন। অনুরূপ পতি পত্নী লাভে নব দম্পতির সুখের সীমা থাকিল না।

গোপা রূপসী ও বিদুষী ; এবং ধীর বুদ্ধি-

রমণী সমুন্নত চরিত্র প্রভাবে সর্ব্বত্র গরীয়সী। তিনি মহাতেজস্বিনী ক্ষত্রিয় রমণী; আপনার অসীম তেজঃপ্রভাবে আত্ম বিশ্বাস-নির্ভর শালিনী ছিলেন বলিয়া সাধারণ মহিলাদের অনুরূপ অবগুণ্ঠনে আবরিতা হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় অন্তঃপুরে আবরুদ্ধ থাকিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি রাজকন্যা ও রাজ-পুত্রবধু হইয়াও স্বাধীন ভাবে রাজভবনের সর্ব্বত্র বিচরণ এবং সকলের সহিত যথাযোগ্য কথোপকথন করিতেন।

বধূর এ লোকাচার বিরুদ্ধ ব্যবহারে পুরাঙ্গনা-গণ তাঁহার প্রতি বড় রুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা একথা লইয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিন্দা করিতেন। একদিন গোপা পুরাঙ্গনাদিগকে সম্মিলিত করিয়া বলিলেন—আপনারা গুণে, জ্ঞানে, বয়সে ও সম্পর্কে অনেকেই আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমি আপনাদিগকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও সমাদর সম্ভাষণ পুর্ব্বক একটি নিবেদন করি-তেছি। আশা করি, আমার কথা গুলি আপ-নারা সকলেই সরল ও সদয় ভাবে গ্রহণ করিবেন। কথাটা এই,—আপনারা সময় সময় লজ্জাহীনা বলিয়া আমার অযথা নিন্দা করিয়া থাকেন, অবশ্য এজন্য আমি ব্যথিত নহি কিন্তু আপনাদের মত বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া আপনা-দিগকে ব্যথিত করি বলিয়া, আমি আন্তরিক দুঃখিত। আমি জানি এবং মানি যে, ধর্ম্মই স্ত্রীজাতির একমাত্র অলঙ্কার, আবরণ, সৌন্দর্য্য ও লজ্জা। ধর্ম্ম রক্ষিত হইলেই রমণীর সব রক্ষা পায়। যে রমণী স্বধর্ম্ম প্রভাবে আত্ম রক্ষায় অসমর্থ, চিত্ত যাঁহার অবনীভূত ও চঞ্চল, ভোগ বিলাস-লালসায় নিয়ত যিনি অভিভূত এবং যিনি আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী অবগুণ্ঠন ও অবরোধ তাঁহার অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু ধর্ম্ম-শীলা, তেজস্বিনী আত্মরক্ষাশক্তিক্ষম, উন্নত চরিত্রা এবং ভোগ বিলাস বিহীনা, সংযতবাক্ ও সুপ্রসন্না সাধ্বী মহিলাদের বৃথা অবগুণ্ঠন ও অবরোধের প্রয়োজন কি? চঞ্চল-চিত্ত,আত্ম-মর্য্যাদা বোধহীনা, নারী ধর্ম্মের উচ্চ গৌরব শূন্যা,দুর্ব্বলা, প্রলোভনের ক্রীতদাসী, ইন্দ্রিয় পরা-য়ণা, স্বামীভক্তি বিহীনা, পাপ চিন্তানিপুণা, দুর্ব্বল হৃদয় রমণী শত অবগুণ্ঠনে আবরিতা এবং অন্তঃপুরের দৃঢ় অবরোধে অবরুদ্ধা থাকিলেও সে অরক্ষিতা! আমি কায় মনোবাক্যে নিয়ত স্বামীসেবা করিয়া থাকি, ধর্ম্মে আমার অচলা ভক্তি, আমার চিত্ত কখনও ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যে বা ভোগ বিলাসের আবল্যে আশক্ত হয় না। আমি সংযত বাক্, সুরুচি ও সুনীতি সম্পন্ন এবং নারী ধর্ম্মের পবিত্র তেজে তেজস্বিনী। পতিব্রতা, এবং আত্ম শক্তিতে বিশ্বাসকারিণী লজ্জাবতী ধর্ম্ম শীলা রমণীর জন্য অবগুণ্ঠন বা অন্তঃপুরে অবরোধের প্রয়োজন হয় না। আমি একদিকে যেমন পতিব্রতা, অপর দিকে স্বামীর আত্মীয় স্বজনের প্রতি তেমনি আশক্তা। আমি স্বামী ব্যতীত রাজপুরীর সকলকে এবং পুরীর বাহিরের স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রকৃতিবর্গকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী পুত্র-কন্যার ন্যায় যথা যোগ্য ভক্তি ভালবাসা ও স্নেহ প্রদর্শন করিতে কখনও কুণ্ঠিত হই না। সকলকে ভক্তি-ভালবাসা পূর্ণ স্নেহ-মধুর সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করি, —ভক্তি বা স্নেহের ভাব ব্যতীত কাহারও

মুখাবলোকন করি না। আপনারা কেহ কখনও আমার নিকট হইতে অশ্রদ্ধা অভক্তি বা অসম্মান জনক ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন কি? অবশ্য প্রকৃত কথা ব্যক্ত করিতে যাইয়া আমাকে নিতান্ত অনিচ্ছায়ও আত্ম প্রশংসার অপরাধে অপরাধিনী হইতে হইয়াছে বলিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত, আপনারা কৃপা করিয়া আমার এ ক্রটি ক্ষমা করিবেন।

গোপার কথায় পুরাঙ্গনাগণ যারপর নাই লজ্জিত হইলেন। সে দিন হইতে আর কখনও কেহ তাঁহাকে নিন্দা করিতেন না। বরং তাঁহার অমিয় মধুর ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া সকলেই শত মুখে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। নির্ম্মল চরিত্র প্রভাবে গোপা রাজ পরিবারস্থ সকলের নিকট দেবী প্রতিমার ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এইরূপ সর্ব্বজন বরণীয় হইয়া গোপা মনের আনন্দে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন।

বিবাহের পর মহা সুখে গোপার দশ বৎসর অতীত হইল। আজ ছয় দিন, তাঁহার একটি পুত্র রত্ন ভূমিষ্ট হইয়াছে। মহোৎসবের আনন্দ কোলাহলে রাজপুরী মুখরিত। সুকুমার শিশু পুত্র লইয়া রাজবধূ গোপা সূতিকা গৃহে সুনিদ্রিতা।

গভীর রজনী। বিরাট রাজপুরী তখন ও সুষুপ্তির সুকোমল অঙ্কে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করে নাই। তখনও দুই দশ জন পুরবাসী উৎসব আনন্দে মত্ত। রাজপুরীর স্থানে স্থানে কেহ নিদ্রিত, কেহ জাগ্রত। সাহসা রাজপুরিতে গভীর ক্রোন্দন ধ্বনি উঠিল। সে ক্রোন্দন-কোলাহলে রাজপুরীর সুপ্ত নরনারী জাগরিত হইল—সূতিকা গৃহে রাজবধূর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বিশ্ববাসী মানবগণের দুঃখ মোচন জন্য গোপার চির-আরাধ্য-ধন, বিশ্বরঞ্জন সিদ্ধার্থ রজনীর ঘোর অন্ধকারে সন্ন্যাস অবলম্বন জন্য গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাই এ বিষম বিলাপ ধ্বনি। একজন বিষয়ী লোক সংসার বন্ধন ছেদন করিয়া শ্রীভগবানের উদ্দেশে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে এ সংসার কিছু দিন কুররী কণ্ঠে এমনি উচ্চ বিলাপ ও ক্রোন্দন করিয়া ঘোর বিষয়াশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। অহো! জগৎব্যাপী কি বিষম মোহ!

সকলে কাঁদিল। কিন্তু গোপার বিশুষ্ক নয়ন কোণে এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রুও প্রবাহিত হইল না। একটি নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাসও বহিল না। তিনি রাজবধূর উপযোগী বিলাস মধুর রত্নময় বেশ-ভূষা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনীর পবিত্র বেশ ধারণ করিলেন। মস্তকের ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ গুচ্ছ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে ব্রতী হইলেন। শ্বশুর বুঝাইলেন, শাশুড়ী অশ্রু-প্রবাহে ভাসিয়া কত প্রবোধ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু রাজবধূ কিছুতেই তাপসীর দীনবেশ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনীর কঠোর ব্রত ভঙ্গ করিলেন না।

গোপা শ্বশ্রূকে বলিলেন,—মা, স্বামীই স্ত্রীর সর্ব্বস্ব ধন ও পূজা ভক্তির একমাত্র পাত্র—শ্রীনারায়ণ। পতির প্রীতি সাধনার্থই পত্নীর বেশ-ভূষা ধারণ ও অঙ্গসৌষ্টববর্দ্ধনের একমাত্র প্রয়োজন। এখন আর কাহার তুষ্টি সম্পাদন জন্য

মণি মাণিক্য খচিত মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কার, সুরভি বিলাস সামগ্রী এবং রাজভোগ পুষ্ট দেহধারণ করিব? পতির যাহা প্রীতিকর, পত্নীর তদ্রূপ বেশ-ভূষা ধারণই অবশ্য কর্ত্তব্য। পতি যখন রাজভোগানুরক্ত ও রাজপুত্রযোগ্য ভোগ-সুখে আসক্ত ছিলেন; তখন আমিও রাজ্ বধূর যোগ্য এবং বিলাসিনীর ভোগ্য বসন ভূষণ ও ভোগ বিলাসের অশেষবিধ উপকরণ সমূহ ব্যবহার করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদনে নিশি-দিন প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি। এখন তিনি ভোগ-সুখ, বিলাসবাসনা বিমুক্ত ধর্ম্মাশক্ত সর্ব্ব-ত্যাগী তরুতলবাসী সন্ন্যাসী; সুতরাং আমার সন্ন্যাসিনীর বেশই তাঁহার নিকট অধিকতর প্রীতিপ্রদ। আহারে বিহারে সর্ব্বপ্রকার আচার ব্যবহারে সর্ব্বতোভাবে স্বামীর প্রীতি সম্পাদন ও চিত্তরঞ্জনই যথার্থ সতী-ধর্ম্ম। মা, আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার এ অযোগ্যা পুত্রবধূ যেন কায়মনোবাক্যে আজীবন এ পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

পুত্রবধূর যুক্তিযুক্ত সারগর্ভ বাক্যশ্রবণ করিয়া শাশুড়ী গৌতমী দেবী নীরবে দুই বিন্দু উষ্ণ অশ্রুপাত করিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন।

সিদ্ধার্থ শৈশবে সূতিকাগৃহে মাতৃহীন। তাঁহার গর্ভধারিনী জননীর নাম—মহামায়া। গৌতমী সিদ্ধার্থের বিমাতা ও মাতৃস্বসা। তিনি মাতৃস্নেহের মধুর আবরণে সিদ্ধার্থকে আশৈশব প্রতিপালন করিয়াছেন। গৌতমীর তনয় বলিয়া সিদ্ধার্থের আর এক নাম গৌতম। সূর্য্য-বংশে শাক্যকুলে জন্ম বলিয়া তাঁহাকে শাক্যসিংহ বা শাক্যমুনি বলা হইয়া থাকে। কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বুদ্ধ দেবের আবির্ভাব হইয়াছিল।

দীর্ঘকাল পরে বুদ্ধদেব একবার কপিলাবস্তু নগরে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার ভিক্ষু সন্ন্যাসীর বেশ। রাজপুত্র সন্ন্যাসীর দীনবেশে রাজপথে পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। রাজপুরীতে বুদ্ধের আগমন বার্ত্তা পঁহুছিল। আনন্দে অধীর হইয়া পুর-বাসী ও নগরবাসী সকলে দলে দলে রাজপুত্রের দর্শনার্থ রাজপথে উপনীত হইল। বুদ্ধদেবের পিতা বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদন তখনও জীবিত আছেন। সংসারী পিতার রাজভবনে সর্ব্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী পুত্রের নিমন্ত্রণ হইল।

রাজঅন্তঃপুরের সমুন্নত হর্ম্ম্যোপরি উঠিয়া গোপা ভিখারী স্বামীকে দর্শন করিলেন। শত দাস-দাসী সেবিত, মণি মাণিক্য খচিত, মহামূল্য, বেশভূষায় সজ্জিত, রাজভোগ-প্রতিপালিত, নিয়ত সুবাস-বিলসিত রাজকুমার সিদ্ধার্থ আজ মুণ্ডিত মস্তকে ভিক্ষু সন্ন্যাসীর দীন বেশে, নগ্ন পদে ধূলি-কঙ্কর পূর্ণ বন্ধুর রাজপথে, কাঙ্গালের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া প্রথমতঃ পতিব্রতা সতী গোপার মনে বড় দুঃখ হইল। দীর্ঘকাল পর স্বামীর এ দীন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। হায়, সুদীর্ঘ কালের রুদ্ধ অশ্রু আজ নিষেধের বাঁধ মানিল না। শুষ্ক নদীতে আজ বান ডাকিল।

গোপা অতি কষ্টে আত্ম সম্বরণ করিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, দূর ছাই, আমি একি করিতেছি? কোন দুঃখে, কিসের লাগিয়া আমি

কাঁদিতেছি, এই যে তিনি তাঁহার স্বর্গীয় জ্যোতি-পূর্ণ অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় দেবমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে কি এক মহান্ পুণ্য জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া এখনও আমার নয়নের সম্মুখে বিচরণ করিতেছেন। রাজপুরীতে অবস্থান কালে মণি-মাণিক্য খচিত রত্নময় হীরকোজ্জল মহামূল্য বেশভূষা পরিধানেও ত কখন তাঁহার এমন উজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শন করি নাই! এ যেন ঠিক দেবমূর্ত্তি। অনন্ত শান্তি পরিপূরিত, মহাজ্যোতি-বিমণ্ডিত এমন করুণা-পূর্ণ অপূর্ব্ব পুণ্য-পবিত্রতাময় মূর্ত্তিও কি কখন মানুষের হয়? এতদিন স্বামী আমার পৃথিবীর মানুষ ছিলেন, এখন স্বর্গের দেবতা হইয়াছেন। আজ কঙ্করকনকে সুখ দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রাজভবন ও শশ্মানে তাহার সম জ্ঞান। শাকান্ন ও রাজভোগ, পর্ণকুটীর আর সুরম্য হর্ম্ম্য, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এবং আত্মপর তাঁহার নিকট সব সমান। আজ তিনি বিশ্বজনী মহাপ্রেমের মহাজন। আজ তিনি হিংসাদ্বেষ শূন্য; অহিংসা এবং সর্ব্বজীবে দয়া আজ তাঁহার পুণ্যময় জীবনের সার ব্রত। আমার স্বামীর ন্যায় এমন মহৎ, এতবড় উচ্চ আর কে? জানিনা আমি কখনও তাঁহার এ মহাব্রতের অনুসরণ ও অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার যোগ্য সহধর্ম্মিণী হইতে সমর্থ হইব কি না। গোপা যুক্তকরে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া উচ্চ প্রাসাদতল হইতে অবতরণ করিলেন।

মহাত্মা বুদ্ধদেব নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। পতির পবিত্র সন্ন্যাস ব্রত ভঙ্গ ভয়ে গোপা তাঁহার সাক্ষাতে আসিলেন না। তিনি শিশু পুত্র কুমার রাহুলকে ডাকিয়া পিতৃ ধন প্রার্থনার জন্য পতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বালক জননীর আদেশ মত পিতৃপদে প্রণাম করিয়া পিতৃধন প্রার্থনা করিল। পিতা পিতৃ-ধন প্রার্থী শিশু পুত্রকে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত করিয়া লইলেন। গোপার বাসনা পূর্ণ হইল। পুত্রের সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণে তিনি অণুমাত্র দুঃখিত হইলেন না।

ইহার পর সুদীর্ঘকাল অতীত হইল। বুদ্ধ-দেবের জনক বৃদ্ধরাজা শুদ্ধোদনের মুমূর্ষকাল উপস্থিত। তখন পুনরায় সিদ্ধার্থ পিতৃ ভবনে পিতৃচরণপ্রান্তে আসিয়া দাড়াইলেন। পিতার ভোগদেহের অবসান হইল। পিতৃবিয়োগের পর বুদ্ধদেব পুরবাসী সকলকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পুরাঙ্গনাদিগের দ্বারা এক ভিক্ষুণী সম্প্রদায় গঠন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এত দিনে সাধ্বী গোপার অভিলাষ পূর্ণ হইল। তিনি পতির পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া পতি প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে জীবন উৎসর্গ করিলেন। এত দিনে তিনি আপনাকে স্বামীর যোগ্য সহধর্ম্মিণী মনে করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ইহারই নাম সতী-ধর্ম্ম। প্রার্থনা, ভারতের ঘরে ঘরে এরূপ সতী-লক্ষ্মীর আবির্ভাব হউক। আমরা আদ্যাশক্তি জগজ্জননী জগদম্বার পবিত্র মূর্ত্তি জ্ঞানে, তাঁহা-দের পবিত্র পদরেণু শিরে ধারণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ে কৃতার্থ হইব।

শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

কবিতা।

It is only when the heart of him is rapt into true passion of melody, and the very tones of him. according to colbridges remarks, become musical by the greatness depth and muder of his thoughts, that we can give him right to rhyme and sing ; that we call him a poet, and listen to him as the Heroic of speakers,—whose speech is song—carlyb.

গদ্য ও পদ্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয় ; কিন্তু এই পার্থক্য যে কি, তদ্বিষয়ে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যে প্রতিভাবলে অপার্থিব জিনিষকে পার্থিবাকারে আনয়ন করা যায়,—তাহাই কবিত্ব ; আবার অনেকের মত ইহা নহে। সাধারণতঃ ছন্দবদ্ধ বাক্যের নাম পদ্য। কিন্তু সূক্ষ্মতঃ দেখিতে গেলে পদ্য তাহা নহে—ছন্দের মিল হইলেই পদ্য হয় না। কতকগুলি পয়ার লিখিতে পারিলেই কবি হওয়া যায় না। অথবা কবিতাকারে কতকগুলি ভাব সন্নিবেশিত করিলেই পদ্য হয় না! আলোচ্য জিনিষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহার নির্য্যাস বাহির করিয়া, তাহাদ্বারা যে প্রতিকৃতি গঠিত হয়—তাহাই পদ্য। চন্দ্রের চন্দ্রিকা চুঁয়াইয়া যে প্রতিকৃতি তৈয়ার হয়, তাহাই পদ্য। যে ব্যক্তি আলোচ্য দ্রব্যের হৃদয় কন্দরে সুমুপ্ত mystry জন-সমাজে প্রতিফলিত করেন, তিনিই কবি। অর্থাৎ পদ্য অর্থে আলোচ্য-বিষয়ের আত্মা, নির্য্যাস। মানবের হৃদয়স্থিত যে বিকার তাহাই পদ্য ; এমন কি ঈর্ষা-নিবন্ধন যে প্রকাশিত ক্রোধ, তাহাও পদ্য। এখন দেখা যাক, গীত শব্দের অর্থ কি ? গীত-শ্রবণে আমাদের হৃদয়ে যে একরূপ ভাবের উদয় হয়, তাহা কি কখনও নৈয়ায়িকেরা বিচার-দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারেন ? গীত অর্থে গভীর, অব্যক্ত, অপরিসীম বাক্য।—যাহা আমাদিগকে দুস্তর অর্ণবতীরে লইয়া যায়, এবং তথাকার উত্তাল তরঙ্গধ্বনি শ্রুত করায়। গভীরত্বই গীত ;—ইহা আমাদের কেন্দ্রস্থিত আত্মা। ইহাই আমাদের ও সকল দ্রব্যের, প্রধান উপাদান। গীত অর্থে চিন্তা ;—যে চিন্তা সচরাচর প্রকাশ করা যায়, তাহা গীত নহে। অর্থাৎ যে চিন্তা প্রকৃত-জিনিষ-সম্ভূত, তাহাই গীত। যে ব্যক্তি ভয়াবহ ঝটিকার মধ্যে, ভয়ানক ভূমিকম্পের মধ্যে এবং বহির্জগত ও অন্তর্জগতের মধ্যে সাম্যভাব দেখেন, রাজকীয় শাসন দেখেন, তিনিই যথার্থ গায়ক। পদ্যই যথার্থ গীত, Cobridge বলেন—যে বাক্য পদ্যাকারে লিখিত, যথার্থ যতি সংবলিত, এবং প্রযুক্ত শব্দের মাধুরিমা আছে, সৎ ও গভীর অর্থপূর্ণ, এবং গভীর ভাবময়, তাহাই গীত। ভাবের অভাবযুক্ত, এবং কবিতাকারে গঠিত, পদ্য, গীত নহে। তাহার মধ্যে 'গীতত্ব' কিছুই থাকে না। কতকগুলি কথা পদ্যাকারে শ্রেণীবদ্ধ করার নাম গীত নহে ;—গীত অর্থে গভীর ভাব, যেমন সৌন্দর্য্য অর্থে দেহের পারিপাট্য নহে, আত্মার পারিপাট্য। বাক্যের ছটা না থাকিলেও, ছন্দবদ্ধ না

হইলেও, প্রকাশিত ভাব গীত হইতে পারে। গীত অর্থে আন্তরিক গভীর ভাবসমূহের তার-ধ্বনি। যেমন তাম্বুরার 'মাত্ত'। যাহাতে ভাবের অভাব, যাহাতে আভ্যন্তরিক সামাঞ্জ্য নাই, তাহা গীত নহে,—তাহা গদ্য মাত্র। যে ব্যক্তির গভীর ভাব আছে, এবং যিনি জগতের ভয়াবহ অস্বচ্ছন্দতার ভিতরে সাম্যতা দেখেন, তিনিই যথার্থ গায়ক। আর, যাঁহার সে ভাব নাই, অথচ বাক্যগুলি কবিতাকারে গঠিত করেন, তিনি ছলি মাত্র। তাঁহার লেখা পদ্যও হয় না, গদ্যও হয় না।

শ্রীমণীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।

—o—

হে সুন্দর।

(গীতিকা)

হে চির-সুন্দর, কম-কলেবর—
এস হে মম হৃদয়ে।
তোমার লাগিয়ে, পিপাসিত চিত্ত,
আছি, আকুল পরাণে চাহিয়ে॥
তব,—ইতর রূপেতে মজিয়ে, মাতিয়ে,
সৌন্দর্য্য-পিয়াস মিটে না।
তব, অতুল সুষমা দেখাও এবার
দূর কর নীচ কামনা॥
নাথ, প্রেম-বিচ্ছুরিত মূরতি তোমার
বারেক আমারে দেখায়ে—
মোরে, মুগ্ধ চিরকাল রাখহে দয়াল!
যেন, নাহি রই কামে ভুলিয়ে॥
আমি, প্রাকৃত রসে ডুবিয়ে, ডুবিয়ে,—
অপ্রাকৃত রস ভুলেছি।
এবে, উপায় কি মোর? হে অন্তর চোর,
কাল-ভয়ে কাতর হ'য়েছি॥
হে বাঞ্ছিত মোর, মায়ার এ ঘোর,—
লও নিজ গুণে সরায়ে।
তুমি সুন্দর! অতি সুন্দর!!
আমি, সুন্দর হই হেরিয়ে॥

দীন শ্রীরসিক লাল দে।

ধ্রুবের প্রয়াণ।

সুশীতল মাতৃ বক্ষে ধ্রুব অচেতন
জননীর অশ্রুনীরে নি'বেছে তখন—
প্রাণের বিবেক বহ্নি, হায়, এ জগতে—
কে আছে মায়ের মত শান্তি বিধানিতে!
ঘু'চল ভাবনা এ'ল বিশ্বাস ফিরিয়া
বুঝিলা স্নেহের ডোর যাবে না ছিঁড়িয়া
কুমার; নিশার প্রায় ষষ্ঠ যাম গত
সুষুপ্তি জুড়াতে এ'ল হৃদয় আহত
দুঃখিনীর; ধীরে ছটী নেত্র নীলোৎপল—
মুদে এ'ল গণি গণি পল অনুপল।
ত্রিদিবের পুষ্প দোল বাহুর বন্ধন,
সুস্নিগ্ধ উরসে মি'শে রহিল নন্দন।
প্রভাতে জাগিয়ে দেখে ধ্রুবের জননী
ধ্রুব নাই, বুকে মাত্র শোকের অশনি!

শ্রীমহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মৃত্যুর ডাকে।

(১)

যবে আহ্বান তব পশিল আসিয়া
মরমে,
আমার গোপন মরমে ;
মোর সকল হৃদয় উঠিল নাচিয়া
সরমে,
পুলক জড়িত সরমে !
এত মধুমাখা আবাহন যার,
কত মধুময় সে জন আবার
ভাবিয়া ঝরিল নয়ন আমার
ভরমে,
যেন কি মনের ভরমে !
ওগো, কিবা শুভ লেখা আছিল আমার
করমে,
জনম—জনম—করমে !

(২)

সখা, যতদিন শুধু তোমার লাগিয়া
ভুবনে,
বিশাল বিপুল ভুবনে ;
চারু কুসুম ভূষণে আছিনু সাজিয়া
যতনে,
অবসাদ-হীন-যতনে।
ততদিন তুমি ডাকনি আমায়,
ফুল-সাজ যবে শুকাইল হায়,
বিকচ মালিকা ধরায় লুটায়
বেদনে,
অকারণ-গাঁথা বেদনে !
সখা, তখনি যে তুমি ডাকিলে আমায়
কেমনে,
আপনা-পাশরি' কেমনে !

(৩)

মোর, এ মলিন-বেশে কেমনে বা যাই
সদনে,
তোমার চরণ-সদনে !
ওগো উপহার দিতে কিছু আর নাই
চরণে,
তোমার রাতুল চরণে !
সকল বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে তবু
আকুল-পুলকে ছুটিলাম প্রভু,
দয়া-বশে যদি ঠাঁই পাই কভু
ভবনে,
তোমার বিরাট ভবনে !
মোর সার্থক হবে এ জীবন তবু
মিলনে,
তোমার দরশ-মিলনে !

(৪)

হায়, পুরিল না আশ একি গো তোমার
ছলনা,
সহন—অতীত—ছলনা,
দৃঢ় অর্গলে রোধি, স্বর্ণ-আগার
আপনা,
লুকায়ে রাখিলে আপনা !
মাঝে মাঝে তবু ডাক 'আয় আয়'
সকল পরাণ বাহিরিতে চায়,
তিয়াসা অপার জাগায় হিয়ায়
বেদনা,
কহন-অতীত-বেদনা !
কেন ডেকে এনে নিজে আপনার পায়
হের না,
এ দাসীরে তব হের না !

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

পুষ্পবতী।

—:+:—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শেখর রাজ্য।

জয় পুরের অন্তর্গত শেখরবতী একটি প্রদেশ। এই প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক করদ রাজার বাস। যখন এই সব রাজারা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং জয়পুরের মহারাজা দুর্ব্বল হন, তখন ইহারা কর দেওয়া বন্ধ করেন, আবার মহারাজা প্রবল প্রতাপ হইলে কর দিতে বাধ্য হন। এই সব রাজাদিগকে ঠাকুর বলে, ইহাদের মধ্যে একজন প্রধান ঠাকুর শেখর রাজা, শেখর রাজা রাজভক্ত, অর্থশালী ও পরাক্রান্ত ঠাকুর। তিনি নিজ রাজধানীতে সুন্দর অট্টালিকা ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেছেন। কিন্তু শেখরবতীর ঠাকুরদের সকলে দস্যু বলিয়া অভিহিত করিত, কারণ পররাজ্য লুণ্ঠন, পথিকদিগের নিকট হইতে সুবিধা পাইলে অর্থাপহরণ, এমন কি ব্রিটিশ রাজ্যের সীমানায় মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করিতেন। শেখর রাজা এই সব দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন বটে তথাপি প্রায় সকল ঠাকুরই এই পথ অবলম্বন করেন বলিয়া, তিনিও দুর্ণাম হইতে রক্ষা পান নাই। তথাপি তিনি অতি সাবধানে চলিতেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের উপর তাঁহার অত্যন্ত বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল।

শেখর রাজা নিজ অট্টালিকায় একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। তখন বেলা অবসান হইয়াছে, রবি আপন স্বর্ণ-কিরণ বড় বড় পাদপের ও অট্টালিকার অগ্রভাগে বিস্তার করিয়া সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিয়াছেন। মৃদু অনিল বসন্তের কুসুমের আঘ্রাণ বহন করিয়া সমস্ত প্রাণীকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে জনৈক অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ দ্বারে দণ্ডায়মান, প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। রাজা পুস্তকখানি রাখিয়া বলিলেন "কে এসেছে?" ভৃত্য বলিল "তিনি পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক।" রাজা অভ্যাগতকে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিলেন, ভৃত্য চলিয়া গেল।

রাজা সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া নবাগতকে আনিতে আদেশ করিলেন। একজন ভৃত্য অভ্যাগতকে সঙ্গে লইয়া রাজার প্রকোষ্ঠে আসিল। ভৃত্যকে যাইতে আদেশ করিয়া, রাজা অভ্যাগতকে বসিতে বলিলেন। তিনি বসিলে, রাজা বলিলেন "আপনার কি উদ্দেশ্যে এ স্থানে আগমন, জানিতে পারি কি?" এই প্রশ্ন করিয়াই রাজা যুবককে দেখিলেন যে তিনি সুন্দর পরিচ্ছদে ভূষিত আকৃতিও মনোহর, বয়স অতি অল্প। তিনি রাজার প্রশ্নের উত্তর করিলেন "আমার পিতা আপনার সখা ছিলেন, সেই সাহসে আপনার নিকট পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য এসেছি। আমি বালক, আপনার পুত্র সদৃশ, আশা করি পুত্রকে রক্ষা করবেন। আমার পিতা কৈরোলীর রাজা ছিলেন,

অল্প দিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এখন এই রাজ্যভার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ও অকর্ম্মণ্যের স্কন্ধে পতিত হইয়াছে।" রাজা এই কথা শুনিয়া তখনই উঠিয়া যুবককে আলিঙ্গন করিলেন, এবং হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিলেন "তোমাকে নিতান্ত বালক দেখেছি, তাই চিন্‌তে পারি নাই। এতবড় হ'য়েছ? তোমার পিতা আমার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। এখন কি বক্তব্য তাহা পরে হবে, পূর্ব্বে কিছু আহারের আয়োজন করি। এত পরিশ্রম ক'রে এসেছ, কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর।" যুবক নম্রভাবে বলিলেন "আমি নিতান্ত গোপনে আপনার নিকটে এসেছি। গোপনেই চ'লে যাবো। চারিদিকে শত্রু, কেহ যদি টের পায় যে আমি আপনার নিকট এসেছি, তা হ'লে আমারও বিপদ, আপনারও বিপদ। জয়পুর রাজ্যের যে অবস্থা, তাহাতে সাবধনতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমি অতি প্রত্যুষে এই স্থান ত্যাগ ক'রে যাবো। অতএব আমার যাহা বক্তব্য এখনই শুনিবেন।" শেখর রাজা বলিলেন "তবে বল।" যুবক বলিলেন "বেহারী-দাস আমার মুরব্বি ছিলেন, যতদিন তিনি মন্ত্রী ছিলেন, ততদিন আমরা নিরাপদ ছিলেম। এখন তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন, জোতারাম আজকাল রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা। চিরকাল সে আমার ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর সলোভ দৃষ্টি কচ্চে। আমার পিতা বর্ত্তমানে কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারে নাই। কিন্তু এক্ষণ আমি বালক—অভিভাবক শূন্য—তাই শুনিতেছি আমার রাজ্য কাড়িয়া লইতে পরামর্শ হইতেছে। এক্ষণে আপনার পরামর্শের জন্য এসেছি।" রাজা কতকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তারপর ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন "বৎস! এ বিষম সমস্যা, জোতারাম ক্রূর প্রকৃতির লোক, সে যাহা মনে করে তাহাই সে সাধন করে। সামান্য লোক থেকে এত বড় লোক হ'য়েছে, জোতা-রাম ভয়ানক প্রকৃতির লোক। তোমার সাবধানে চলা কর্ত্তব্য। তবে আমি যতদূর পারি তোমাকে গোপনে সাহায্য কর্‌বো, প্রকাশ্যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য মনে করি না। যাহা হউক, আজকাল ভারতেশ্বর ইংরেজগণ, তাঁহারা দয়ালু। আমি দেখ্‌বো যাহাতে তাঁহারা তোমার উপর অনুগ্রহ করেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তোমার পক্ষ হ'লে আর কোন ভয়ের কারণ নাই। আমার সঙ্গে অনেক রাজ-পুরুষের আলাপ আছে, তুমি কোন চিন্তা ক'র না।" এই কথায় শৈক্ষত্রীর নূতন রাজা অনেক আশ্বস্ত হইলেন এবং প্রাণের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। ইহার পর রাজা যুবক অতি-থিকে সঙ্গে লইয়া অন্য প্রকোষ্ঠে গেলেন, তথায় আহারাদির আয়োজন হইয়াছিল, উভয়ে আহারে বসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঐতিহাসিক-তত্ত্ব।

রাজস্থানের মধ্যে জয়পুর বা অম্বর রাজ্য সুপ্রসিদ্ধ। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে জগৎসিংহ জয়পুরের অধীশ্বর ছিলেন, তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের

সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন; কিন্তু ১৮০৫ খৃঃ অব্দে এই সন্ধি বিচ্ছিন্ন হয়। কয়েক বৎসর এই ভাবে অতীত হইলে, ১৮১৭ খৃঃ অব্দে পুনরায় সন্ধির চেষ্টা হয়। এবং ১৮১৮ খৃঃ অব্দে নূতন সন্ধি অনুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জয়পুর রক্ষার ভার গ্রহণ করেন ও তৎপরিবর্ত্তে জয়পুর রাজ রীতিমত কর দিতে অঙ্গীকার করেন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে জগৎ-সিংহ পরলোক গমন করেন। মহারাজার মৃত্যুর পর মহারাণী নাবালক পুত্র তৃতীয় জয়সিংহকে লইয়া রাজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরের প্রধানা দাসী রূপা জন্ম কালাবধি মহারাণীর নিকট ছিল। মহারাণী তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন, এমন কি রূপা যাহা বলিত মহারাণী তাহাই শুনিতেন; অতএব রূপাই যে রাজ্য চালাইত, তাহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জোতারাম নামক একজন সওদাগর রূপাকে হস্তগত করিয়াছিলেন, তিনি নিজ বুদ্ধি বলে ও রূপার সাহায্যে শীঘ্রই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইলেন। কিন্তু তিনি অধিক দিন এ সম্পদ ভোগ করিতে পারিলেন না। রাজ্যের কোন কোন ঠাকুর তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, জোতারাম অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, এক জন প্রধান ঠাকুর বেহারী সান পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হইলেন। জোতারাম অবসর লইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকিল, কারণ রূপা অন্তঃপুরের পরিচালিকা ও জোতারামের ভ্রাতা হুকুম চাঁদ অন্তঃপুরের সরবরাহকার। জোতারাম বেহারী সানকে জব্দ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, তাঁহার উত্তেজনায় সৈন্যগণ বেতনের জন্য বেহারী সানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল; বেহারী সান প্রাণভয়ে ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন মহারাণী সুবিধা পাইয়া বেহারী সানের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিলেন—বেহারী সান অনুপযুক্ত মন্ত্রী—স্বার্থপর; বেহারী সান রাজস্ব আদায় করিতে পারেন নাই এবং রীতি মত সময়ে গবর্ণমেণ্টের কর দিতে পারেন নাই, সেইজন্য অনেক টাকা বাকী পড়িয়াছে—বেহারী সান সৈন্যগণকে বেতন দেন নাই, অতএব তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সার্ ডেভিড্ অক্টারলনি প্রথমতঃ নসিরাবাদ কেণ্টনমেণ্ট হইতে ব্রিটিশ সৈন্য আনাইয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন, তৎপর ১৮২৪ খৃঃ অব্দে বেহারী সানকে কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিয়া অপর এক জন ঠাকুর মেঘ-সিংহকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন এবং হুকুম-চাঁদ দেওয়ান নিযুক্ত হইল। বেহারী সান ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাঁহার ধন প্রাণ রক্ষার অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়া নিজ জায়গীর সামোদে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নূতন যে সব কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল, সকলেই জোতারামের লোক, অতএব জোতারামের প্রতিপত্তি যথেষ্ট থাকিল।

নাবালক রাজকুমার সর্ব্বদা অন্তঃপুরে থাকিতেন। অন্তঃপুরের বাহিরের কোন লোক তাঁহাকে আজ পর্য্যন্ত দেখে নাই, তাই কুমারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ জন্মিতে লাগিল।

বিকানিরের মহারাজার কন্যার সঙ্গে এই রাজকুমারের বিবাহ স্থির হইয়াছিল, তিনিও কুমারকে বাহির-দরবারে আনিতে জেদ্ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ মনে করিল কুমারের মৃত্যু হইয়াছে, রূপা অপর একটি ব্রাহ্মণ বালককে আনিয়া সেইস্থলে বসাইয়াছে। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে জোতারাম পুনরায় স্ব-ক্ষমতা পাইলেন, কিন্তু রাজ্যের প্রধান প্রধান ঠাকুরেরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। সকলেই কুমারকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইল। মহারাণী বলিলেন—যে কুমারের অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তিনি তাঁহাকে সভায় উপস্থিত করিবেন। কিন্তু তাঁহার এ আপত্তি টিকিল না। বেহারী সান ও তাঁহার দলস্থ লোককে রাজ সভাতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। এক শুভদিনে কুমারকে সভায় উপস্থিত করা হইল। ঐই সভায় ৭২ জন ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন, অধিকাংশের মতে রাণী কুমারের অভিভাবিকা হইতে পারিবেন না, এইরূপ স্থির হইল। কিয়দ্দিন পরেই সার্ চার্লস মেট্‌কাফ্ রাজসচীব হইয়া আসিলেন, তিনি ঠাকুরদের মত সংগ্রহ করিলেন। তাহাতে অধিকাংশের মত হইল যে মহারাণীই রাজকুমারের অভিভাবিকা থাকিবেন। সেই সময় রাওচাঁদ সিংহ প্রধান মন্ত্রি, কাহাল সিং সৈন্যাধ্যক্ষ, হুকুমচাঁদের জামাতা প্রেমচাঁদ দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। অতএব জোতারামই বলিতে গেলে রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা থাকিলেন। এই সময়ে রাজস্ব আদায় লইয়া বড় গোলযোগ হইল, সৈন্যেরা জোতারামকে তাহাদের প্রাপ্যের জন্য তাগাদা করিতে লাগিল; জোতারাম বাধ্য হইয়া নিজ তহবিল হইতে তাহাদিগকে বেতন দিলেন। ইহার পরই জোতারাম পুনরায় প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। তিনি উক্ত কার্য্য পাইয়াই সৈন্যদিগের বেতন দেওয়ার জন্য ঠাকুরদিগের উপর নূতন কর স্থাপিত করিলেন, অতএব রাজ্যের ঠাকুরগণ সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং মহারাণীর পক্ষ ত্যাগ করিল। কতক কতক শাসন-কর্ত্তারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, ১৮৩০ খৃঃ অব্দে হুকুম-চাঁদ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করা হইল। গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু ঠাকুরদিগকে ভয় দেখাইলেন যে তাহারা কর্ত্তব্যকর্ম্মে ত্রুটী করিলে গবর্ণমেণ্ট আর তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন না। সকল ঠাকুরই তখন জয়পুরের বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল বেহারী-সান ও কৈত্রীর রাজা ব্যতীত আর সকলকে ক্ষমা করা হইল।

জয়পুরের অন্তর্গত শেখরবতী একটি প্রদেশ। এই প্রদেশের করদ ঠাকুরগণ এক একটি ক্ষুদ্র রাজা। এই রাজারা অনেকে দেশ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেন, এবং কেহ কেহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজত্বে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া প্রজাদিগের ধন অপহরণ করিতেন। এই দস্যু রাজাদিগকে দমন করার উদ্দেশ্যে জয়পুর হইতে অনেক সময় সৈন্য প্রেরিত হইত, প্রায়ই তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিত। ইহারা জয়পুর রাজাকে রীতিমত কর দিতেন না, যখন বাধ্য হইতেন তখন দিতেন; যখন দেখিতেন

জয়পুর দুর্ব্বল, তখন আর গ্রাহ্য করিতেন না। জয়পুর কোর্ট হইতে ইহাদের উপর হুকুম জারি হইত, ইহাঁরা তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহাদের দুর্গ, সৈন্য-শ্রেণী, মরুভূমি, এই সব সুবিধা পাইয়া করদ রাজাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন নৃপতি হইয়া দাঁড়াইলেন। জয়পুর হইতে ইহার কোন প্রতিকার হইল না, বা প্রতিকার করিবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা ছিল না। ক্রমে ইহাদের সাহস আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আমাদের ঘটনা এই সময়-সম্বলিত।

রাজস্থানের উৎসবের মধ্যে বসন্তোৎসব একটি প্রধান কার্য্য, এই সময়ে নর-নারী উৎসবে মাতিয়া উঠিত। বসন্তের দেবী বাসন্তীর পূজা ঘরে ঘরে হইত। এই উৎসব বসন্ত পঞ্চমী হইতে ১৩ই ও ১৪ চৈত্র পর্য্যন্ত থাকিত। শেষ তারিখে সকলে মিলিয়া কামদেবের সঙ্গীত গাইত এবং শেষ কয়েক দিন সময় পূজায় অতিবাহিত হইত। এমন কি অসভ্য ভীলেরা পর্য্যন্ত এই আনন্দে যোগদান করিত, যাহারা সবল ও সক্ষম তাহারা সহরে গিয়া উৎসবে যোগদান করিত, যাহারা তাহা পারিত না, তাহারা নিজ নিজ গ্রামে আমোদে মত্ত হইত।

কৈত্রীর রাজা বহুকাল হইতে তাঁহার সুন্দর উর্ব্বরা ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে বেহারি দানের বন্ধুত্ব ভাব, তাই জোতারাম রাজার উপর মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এই সুন্দর জায়গীর কি ভাবে নিজে গ্রহণ করিতে পারেন তাহা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর অল্প বয়স্ক পুত্র রাজা পাইয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথ-গড়।

ভোর হইয়াছে, পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল বিহঙ্গম-কুলের রবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সুমিষ্ট গন্ধবহ প্রাণীকুলের প্রাণ সঞ্চার করিতেছে। এই সময়ে মানবের মন পবিত্র থাকে এবং ভগবানের নাম স্মরণ করিতে উৎসুক হয়। আরাবলি পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গ রঘুনাথ-গড় নামে অভিহিত, এই শৃঙ্গে লোকের বসতি অধিক নাই, তবে কতিপয় ভীল বাস করে। সর্ব্বোচ্চ শিখরে একটি সুন্দর স্বভাবজাত গুহা। অতি প্রত্যূষে গুহার বাহিরে বসিয়া একটি বৃদ্ধা ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। বৃদ্ধার সচঞ্চল চাহনি দেখিয়াই বোধ হইতেছে সে কাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। একটু বিরক্তির সহিত বৃদ্ধা বলিল "এখনও এল না?" ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই একটি বালিকা তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই বৃদ্ধা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিল "মা! এত দেরি কেন? আমি সমস্ত রাত্রি ঘুমাই নাই।" বালিকা বলিল "মা! গুরু ছাড়লে না, বল্লে যে, রাত্রে তাদের বাড়ীতেই থাকতে হবে। আমি বল্লেম, যে মা ব্যস্ত হবেন ও বক্‌বেন। তারা বল্লে, যে মা কিছু যদি বলেন তবে তারা দায়ীক। তাদের হাত ছেড়ে আসতে পারলেম না।" বৃদ্ধা বালিকার হস্ত ধরিয়া গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং এক স্থানে বসিতে বলিয়া কতকগুলি মূল ও বিল্বপত্র আনিয়া

বালিকার মস্তকে দিল তখন গম্ভীর স্বরে বলিল—ভগবান একলিঙ্গ তোমার মঙ্গল করুন। আমার বহু যত্নের ধনকে রক্ষা করুন"। তার পর নিজে উপবেশন করিয়া বলিল 'মা! তুমি নাকি বসন্তের রাণী হ'য়েছিলে? এমন সুন্দর মেয়েকে রাণী না সাজালে এ ভীলরাজ্যে কে সাজ্‌বে? ভগবান করুন, তুমি যথার্থ রাজরাণী হও।" এই কথা বলিয়াই বৃদ্ধা একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। বালিকা বলিল, মা! সকলেই আমাকে লয়ে আদর করেছে, কত খাবার দিয়েছে, কত ফুলের মালা দিয়েছে। এক জন অতিথিও এসেছিল, তাকে আমরা অভ্যর্থনা করলেম।" বৃদ্ধা বলিল অতিথি কে? বালিকা তাহা বলিতে পারিল না। তখন উভয়ে পুনরায় গুহার বাহিরে আসিল, কারণ তখনও ভিতরে অন্ধকার, ভাল করিয়া আলো প্রবেশ করিতে পারে নাই। বাহিরে আসিয়া একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া বৃদ্ধা বলিল—মা পুষ্প! বসন্তোৎসব ত শেষ হল, আবার চৈত্র মাসে তোমাকে ডাক্‌বে। একবার কি রাজধানী যাবে?" পুষ্পবতী উত্তর করিল, মা! আমরা দরিদ্র, আমাদের আবার রাজধানী যাওয়া কেন? এখানেই আমাদের ভাল। সকল মেয়েরা আমাকে ভালবাসে, ভীলেরা আমাকে স্নেহ ও ভক্তি করে, তোমার ন্যায় মাতার আদর পাচ্ছি, আবার রাজধানী যাওয়ার প্রয়োজন কি? না মা, ওসব দরকার নাই। আমরা যেমন গরীব, তেমন গরীবের মত থাক্‌বো, সহরের আমোদ প্রমোদে আমাদের যোগ দেওয়া দরকার কি?" মাতা কন্যার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—পুষ্প! কত লোক যাচ্ছে। এরা আমাকে বলে যে তোমার মেয়েকে লয়ে যাও, রাজধানীতে যদি বসন্তের রাণী হতে পারে, তবে কত পুরস্কার, কত নাম হবে।" পুষ্পবতী পুনরায় উত্তর করিল 'না মা! আমি পুরস্কার বা নাম চাই না, আমার এখানেই ভাল।" ইহার পর বৃদ্ধা আর একথা তুলিল না। তারপর বলিল" মা! শিব পূজার সময় উপস্থিত হইল, তুমি ফুল ও বিল্বপত্র আন। আমার আর চলিবার ক্ষমতা নাই, তোমার জন্যই ভগবানকে ফুল ও বিল্বপত্র দিতে পারি। ভগবান করুণ তোমার ভাল বর হয়। পুষ্পবতী তখন ফুল ও বিল্বপত্র আহরণার্থ চলিয়া গেল, বৃদ্ধা একাকী দাওয়ায় বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"ভগবান একলিঙ্গের কি ইচ্ছা জানিনা, মেয়েটাকে যদি সুখী কর্‌তে পারি তাহলেই হয়। ঠাকুর বলেছিলেন যে, দ্বাদশ বর্ষে ওর জীবন সংশয়, দেখি রক্ষা পায় কি না। রক্ষার উপায়ত সব অবলম্বন করেছি, এই বৎসরটা কোন রূপে কাট্‌লেই হয়। মা ভবানী ওর মঙ্গল করুন।"

কিছুক্ষণ পরেই একজন বৃদ্ধ ভীল উপস্থিত হইল। সে বৃদ্ধাকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"মা! বুড়ী কোথায় গেল?" বৃদ্ধা হাসিয়া উত্তর করিল "তোর বুড়ী ফুল তুলিতে গিয়াছে।" ভীল বলিল—"কাল আমার মেয়ের কাছে ছিল তুমি যদি কিছু বল, সেই ভয়ে সুকু আমাকে তোমার কাছে পাঠালে। তুমি তাকে কিছু

বলো না।" বৃদ্ধা বলিল সে ভয় নাই, সুকুও আমার আদরের মেয়ে, পুষ্প সেখানে থাকবে তাতে আমার ভয় কি?" বৃদ্ধ বলিল—শুনলেম বুড়ী সহরে যাবে, সহরে শুনেছি সব লোক খারাপ, এমন স্থানে যেতে দিবে কেন?" বৃদ্ধের এই বাক্য শুনিয়া বৃদ্ধা হাসিয়া উঠিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল,"না তোর বুড়ী তোদের ছেড়ে কোথাও যাবে না। সুকুকে একবার সন্ধ্যা বেলা পাঠিয়ে দিও, সুকু এলে পুষ্প বড় সুখী হয়।" বৃদ্ধ স্বীকার করিয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধা তখন উঠিয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। একটু পরেই পুষ্পবতী ফুল ও বিল্বপত্র লইয়া গুহায় আসিল, এবং বলিল "মা! বসন্তে ৎসবে আর ফুল পাওয়ার উপায় নাই।" বৃদ্ধা বলিল "যা পেয়েছ, তাতেই হবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পাগলিনী।

পুষ্পবতী সায়ংকালে পর্ব্বতের উপর বেড়াইতেছিলেন, ভীলদুহিতা সুকু সঙ্গে ছিল। একটি শৃঙ্গে উভয়ে বসিয়া কতই আলাপ করিতেছিলেন। পুষ্পবতী বলিল, "সুকু! তোর নাকি বিয়ে হবে শুনলেম, সে দিন তোর বাবা আমার মায়ের কাছে বলছিল। তবেত আমার কাছ ছাড়া হ'য়ে যাবি। আমার তখন উপায় কি হবে?" সুকু হাসিয়া বলিল—"তোমাকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না। তোমার যখন বিয়ে হবে, আমারও তখন বিয়ে হবে। আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না।" পুষ্পবতী হাসিয়া বলিল "আমি যদি বিয়ে না করি, তবে তুই কি করবি?" সুকু হাসিয়া বলিল,"আমিও ও তাহ'লে বিয়ে করবো না।" এবার পুষ্পবতী উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল—"পাগলি! তাও কি হতে পারে?" সুকু উত্তর করিল—"কেন হবেনা? বাবাকে সব বল্‌বো।" এই কথা ছাড়িয়া পুষ্পবতী বলিল—"শুনিছি, তোর বর নাকি খুব বীর, সেদিন বাঘ শীকার করেছে?" সুকু হাসিয়া বলিল—"বাঘ শীকার না করলে সেত মানুষই নয়।" পুষ্পবতী বড় দুষ্ট, সে সুকুর সঙ্গে রঙ্গ তামাসা করতে ছাড়ে না। সুকু সরলা ভীল কন্যা, সে অত গোলমাল বুঝে না। পুষ্প বলিল—"সুকু! শুনলেম সে নাকি আর একটা বিয়ে কচ্চে?" এবার সুকু গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল "তা হ'লে আর আমাকে পাবে না।" পুষ্পবতী আরও তামাসা দেখিবার জন্য বলিল—সুকু! সে নাকি বলেছে যে তোকে পছন্দ করে না, তুই নাকি সুন্দরী নয়। যাকে সে পছন্দ করেছে সে নাকি দেখতে ভাল ও ভাল হরিণের মাংস রান্না করে।" সুকু বড় অসন্তুষ্ট হইল, সে উত্তর করিল "তা যদি ব'লে থাকে, তবে আর একটা বিয়ে করুক, আমি ত আর সেধে সেধে তার কাছে যাচ্ছিনা।"

এই সময় সন্ধ্যা সমাগত হইল। উভয়ে গল্প করিতে করিতে সে বিষয় লক্ষ্য করে নাই। সূর্য্যের শেষ চিহ্ন ক্রমে লোপ পাইল, একটি দুটি নক্ষত্র আকাশে দেখা দিল। তখন পুষ্প-

বতী বলিল—"সুকু! আর অপেক্ষা কর্‌তে পারব না, চল্ যাই আমাদের ঘরে, আজ রাত্রে বাড়ী না গেলি, কাল সকালে যাবি।" সুকু স্বীকার করিল, সে পুষ্পবতীকে বড় ভাল বাসিত, পুষ্পের নিকটে থাকিতে তাহার ভাল লাগিত। উভয়ে যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিল, এমন সময় পশ্চাতের বনে "হি হি" শুনিতে পাইল। উভয়ের ভয় হইল তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতে লাগিল, এমন সময়ে তাহাদের সম্মুখে কে আসিয়া দাঁড়াইল। পুষ্পবতী ও সুকু স্তম্ভিত হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। পাগলিনীর পরিধানে নানা রঙ্গের ছিন্ন বস্ত্র, কেশগুলি অর্দ্ধ পক্ক ও অর্দ্ধ কাঁচা, তাহাতে আবার জটা হইয়াছে। সময়ে যে তাহার চেহারা ভাল ছিল তাহা এক্ষণে পাগলিনীকে দেখিলেই বুঝা যায়। পাগলিনীর চক্ষু দুটি অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে। সে পুষ্পবতীকে দেখিয়া বলিল—"তুই তো সেই মেয়ে, চিনেছি—চিনেছি! আমাকে ফাঁকি? আমি কে জানিস? আমি স্বয়ং শিবের মেয়ে।" পুষ্পবতীর বড় ভয় হইল, সে সুকুর গলা ধরিল। পাগলিনী আবার "হি হি" করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল, "তুই ভয় পাচ্ছিস? আমাকে দেখে আবার ভয় কি? এক কাজ কর্‌বি, আমার সঙ্গে যে তোর দেখা হ'ল, তা কাকেও বলিস্ না। আমি এখন যাই। যদি বলিস্ তাহলে তোর ভাল হবে না। আর যদি না বলিস তবে একদিন বুঝতে পারবি।" এই বলিয়া পাগলিনী আবার বনের মধ্যে লুকাইল। উভয়ে কতক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কোন কথা কহিল না। অবশেষে পুষ্পবতী বলিল, "সুকু! একে ত আর কখনও দেখি নাই। তুই কি ওকে জানিস?" সুকু উত্তর করিল, "আমিও কখন দেখি নাই, তবে আমার মনে হচ্চে ও মানুষ নয়, বনের দেবতা! সময় সময় শুনিতে পাই এইরূপ দেবতারা মানুষদিগকে দেখা দেয়।" পুষ্পবতীর হাসি পাইল, বহু কষ্টে হাসি সম্বরণ করিয়া বলিল, "সুকু! তুই কি ওর কথা বল্‌বি? পাগলিনী কিন্তু নিষেধ করেছে। আমাদের ত কোন ক্ষতি করে নাই, বা ভয় দেখায় নাই, তবে আর বলে কি হবে। কেমন তুই ত বলবি না?" সুকু উত্তর করিল,—"তুমি যখন বারণ করলে তখন আর বল্‌ব না। কিন্তু আমার বড় ভয় হ'য়েছিল।" এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে গুহার নিকট পৌঁছিল। উভয়ে উভয়ের হস্ত ধরাধরি করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি, এ।

ক্রমশঃ—

প্রাচীন হিন্দু-উপনিবেশ।

(প্রথম প্রসঙ্গ।)

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ যে সর্ব্ব প্রথমে সভ্যতার চরম সোপানে উঠিয়াছিলেন, সমস্ত পৃথিবীতে যে তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, পশু মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন এবং অপরকে মানবোচিত জীবনযাপনের আদর্শ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। উত্তর কালে যাহারা

সুসভ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের রীতি নীতি শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান ও ধর্ম্ম যে তত্রত্য ঔপনিবেশিক হিন্দু-সন্তান দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার বিবিধ প্রমাণ এখনও সংগ্রহ করিতে পারা যায়। কালের কুটীল গতিতে, দেশ, সমাজ ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইলেও, নির্ব্বাণপ্রায় চিতার অভ্যন্তরে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিকণার ন্যায়, আর্য্য হিন্দুসন্তানের প্রভাব অদ্যাপি যে,পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির সকল জ্ঞানের সকল ধর্ম্মের সকল কীর্ত্তির মূলে, প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহা একটু স্বাধীন ভাবে, যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পুরাবৃত্ত অনুসন্ধানপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল, এই বিষয়ে আন্দোলন করিয়া যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, একদেশদর্শী ইতিহাস লেখকগণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া, যে নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সারাংশ অবলম্বন করিয়া প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব। আর, আজ কাল এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ বৌদ্ধ বৌদ্ধ করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা লোকদিগকে বুঝাইয়াছেন, হিন্দুর যা কিছু তা যেন সমস্তই বৌদ্ধদিগের কৃপায় আবির্ভূত হইয়াছে—এই অদ্ভুত ধারণা যে ভ্রান্ত তাহাও প্রদর্শিত হইবে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় আর্য্য হিন্দুগণ, অন্যত্র গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতেন। এই মতের পরিপোষকতা করিয়া প্রফেসর হীরেন "হিষ্টোরিক্যাল রিসার্চেস্" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩১০শ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে "পুরাকালে যদিও আভ্যন্তরীণ গোলযোগে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, বৌদ্ধদিগের মত, হিন্দুদিগকে দেশত্যাগ করিতে হয় নাই, তথাপি এত অধিক লোক সংখ্যা যে, এক দেশে বহুকাল ধরিয়া বাস করিতে পারিয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না। ভারতবাসিগণ অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ হইতে বাহির হইয়া অন্যদেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক বসবাস করিয়াছিলেন।"

কোন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মতে বৈবস্বত মনুর পর হইতেই প্রথম উপনিবেশের সূত্রপাত হয়। এই সময় যে সকল আদিম উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, মিশর বা ইজিপ্ট দেশ তন্মধ্যে অতি প্রাচীন; তাহার কিছুকাল পরে ও হিন্দুদিগের প্রধান উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে আমেরিকা বা মার্কিন দেশে হিন্দুগণ উপনিবেশ স্থাপন করেন। গ্রীস দেশে কুরুক্ষেত্র সমরাবসানের পর হিন্দুদিগের প্রধান উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ঐ সময় অনেক সংস্কৃত শব্দ ও সেইজন্য গ্রীক্-ভাষায় ব্যবহৃত হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ওয়েবার সাহেবের "ইণ্ডিয়ান লিটারেচার" পুস্তকের তৃতীয় পৃষ্ঠা হইতে 'কপি' শব্দটী উদ্ধৃত করিলাম। খৃঃ পূঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে খোদিত একখানি গ্রীকদেশীয় শিলা লিপিতে 'কপি' শব্দ বানর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মোজেসের জন্ম প্রবর্ত্তিত হইবার বহু পূর্ব্বে গ্রীক দেশে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হইতে, অধিক পরিমাণে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। ঐ যুদ্ধে হয় জীবন নাশ, না হয় দেশত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না; পলায়ন তখন অতি কাপুরুষোচিত কার্য্য বিবেচিত হইত বলিয়া, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষেই যাহারা যোগ দেয় নাই, অথবা উভয় পক্ষের বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া সমুদায় কুলনাশের ভাবী আশঙ্কা করিয়া, কিম্বা কুরুকুল নাশে সন্তপ্ত ও পাণ্ডব রাজ্যে বাস করিতে অনিচ্ছা বশতঃ অনেকেই সে সময় ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া, নানা স্থানে গিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। এই অভিযানকেই হিন্দুদিগের উপনিবেশ বলিয়া সাধারণতঃ উক্ত হইয়া থাকে। মিঃ পিকোক্ "ইণ্ডিয়া ইন্‌গ্রিস্" পুস্তকে (২৬ পৃষ্ঠা) এই মহারণ লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন যে এই সময়ের পর বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞানসমন্বিত হিন্দুগণ উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতের পথ-প্রদেশে, দক্ষিণে সিংহল ও তৎসমীপবর্ত্তী দ্বীপ সমূহে ও পশ্চিমে সিন্ধুনদের পরপারে গমন করিয়া ইউরোপীয়দিগের বর্ত্তমান সভ্যতার বীজ রোপন করিয়াছিলেন। এই মহাবল পরাক্রান্ত জাতি আরব্য পারস্য প্রভৃতি দেশে স্থলপথে গমন করিয়া সমস্ত ইউরোপকে সুশিক্ষিত ও সুসভ্য করিয়াছিলেন।

কতকাল পূর্ব্বে এই উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা স্থির করিতে হইলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও মহাভারত রচনাকালের আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং এস্থলে, সংক্ষেপে এ বিষয়ের প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিয়া একটু বিচার করিলে বোধ হয় অবান্তর বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, ভারতবর্ষীয় প্রমাণিক গ্রন্থ সকল আজ কাল সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়াছে। কারণ, অশিক্ষিত যবন দিগের হস্তে, পড়িয়া, কত না শাস্ত্রগ্রন্থ কত পুস্তকাগার, কত মন্দিরাদিতে খোদিত শিলালিপি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। বৌদ্ধদিগের বুদ্ধগয়ার মহাগন্ধালয় নামক পুস্তকাগার, নলন্দের বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, রতনদধি মহাগঞ্জের পুস্তকাগার; বিহারে উদন্তপুরী মন্দিরের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদিগের অসংখ্য শাস্ত্র গ্রন্থ, মুসলমানদিগের হস্তে ধ্বংস পাইয়াছিল। অনহালওয়ারা পাটনে প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় আলাউদ্দীন খিলিজি বিনষ্ট করেন, সিয়র মুতাখরীণ পুস্তকে লিখিত আছে যে, আরঙ্গজেব যেখানে হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ দেখিতে পাইতেন বা শুনিতে পাইতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলিবার হুকুম দিতেন। আরও কত প্রকার অত্যাচারে যে এই সকল অমূল্য রত্ন পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সুতরাং হিন্দুগণ যে কোন ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন নাই বা তাঁহারা রচনা করিতে [illegible]তেন না—এই মত অতি অসার ও ভ্রা[illegible]। যাহা হউক, বর্ত্তমান কালে যে সকল [illegible] অবশিষ্ট আছে, তাহা কালনির্ণয়ের প্রমাণ সংগ্রহ ব্যাপারে কি ভাবে সহায়তা করিয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

স্বামী দয়ানন্দসরস্বতী তদ্রচিত "ভৌমিকে" লিখিয়াছেন যে, কলির পাঁচ হাজার সাত বৎসর অতীত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক প্রসিদ্ধ

হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়াযায় যে, শালিবাহন রাজার শাল প্রবর্ত্তিত হইবার সময় কলিযুগ তিন হাজার এক শত উনসত্তর বৎসরে উপনীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে (১৯০৬ খৃঃঅঃ) শালিবাহনের শাল ১৮২৮, সুতরাং উহাতে ৩১৭৯ সংখ্যা যোগ করিলে (১৮২৮+৩১৭৯), পাঁচ হাজার সাত বৎসর পাওয়া যাইতেছে।

"জ্যোতির্ব্বিদ্ ভরণ" নামে,২৪ সম্বতে রচিত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের একখানি ইতিহাস আছে। ঐ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ২৪ সংবতে কলিযুগের ৩০৬৮ বৎসর গত হইয়াছিল। সুতরাং ইহাতেও দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান সংবৎ ১৯৬৩ হইতে ২৪ বৎসর বাদ দিয়া, সেই বিয়োগফল ৩০৬৮ তে যোগ দিলে, ৫০০৭ হয়। বিক্রমাদিত্যের সম সাময়িক, বরাহ মিহির, "বরাহী সংহিতার" ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে—যুধিষ্টিরের রাজত্ব কাল জানিতে হইলে, শালিবাহনের শালে ২৫২৬ যোগ করিলেই পাওয়া যাইবে। সুতরাং (১৮২৮+২৫২৬) যুধিষ্টির ৪৩৫৪ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কহ্লন ভট্ট রাজ-তরঙ্গিনীতে লিখিয়াছেন—কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে যুধিষ্টির জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং কলিযুগ এক্ষণে ৬৫৩—৪৩৫৪+৫০০৭ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

জ্যোতির্ব্বিদ পরাশর ও আর্য্য ভট্ট উভয়েই বলিয়াছেন যে মহাভারত প্রায় ৬৬২—৬৬৬ কলি অব্দের কিঞ্চিদধিককাল পরে রচিত হইয়াছিল। এই মত অনুসরণ করিয়া "আইনি আকবরি" গ্রন্থ কর্ত্তা লিখিয়াছেন যে বিক্রমাদিত্য,যুধিষ্টির অব্দের ৩০৪৪ বৎসর পরে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সুতরাং ইহাতেও (৩০৪৪+১৯৬৩ সংবৎ) দেখা যাইতেছে যে কলিযুগের ৫০০৭ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। দক্ষিণাত্যের কালাদাঘ জেলার, ব্যহোলা সন্নিকটে এক পর্ব্বতোপরি জৈনদিগের এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে,—তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, চালুক্য বংশের দ্বিতীয় পুলকেশী রাজা মহাভারতের মহাযুদ্ধের ৩৭৩৫ বৎসর পরে ও ৫৫৬ শকাব্দের পর, এই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এখানেও দেখা যাইতেছে যে, (৩৭৩৫-৫৫৬) শকাব্দ প্রচলন হইবার ৩১৭৯ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে মহারণ হইয়াছিল। অতএব, (৩১৭৯—১৮২৮) শকাব্দ কলিযুগের এখন ৫০০৭ বৎসর গত হইয়াছে।

আরও অনেক প্রমাণ আছে। সেগুলি পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাইবে। যাহা হউক কুরুক্ষেত্র সমর-কাল সম্বন্ধে মত দ্বৈধতা থাকিলেও এক্ষণে ইহা স্থির করিয়া লইতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-পুস্তকে বর্ণিত জল-প্লাবন ও "নোয়ার" জন্মের বহু পূর্ব্বে কলিযুগ উৎপত্তি হইয়াছে; এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে হইয়াছিল।

এই সময় হইতে যে প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু উপনিবেশ পৃথিবীর দিগদিগন্তে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে হিন্দুগণ গঙ্গার উপত্যকা পার হইয়া চীনদেশ, জাপান, প্রশান্ত ও ভারত সাগরস্থিত দ্বীপ সমূহ অবশেষে আমেরিকা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

উত্তর ও পশ্চিম দিকে তাঁহারা তুর্কীস্থান, সাইবিরিয়া, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া, জার্ম্মণী, ইংলণ্ড প্রদেশ এবং পারস্য, রোম, গ্রীস ও ইট্রুরিয়া প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। পশ্চিম দিকে তাহারা আফ্রিকার পূর্ব্ব সীমায় ও ইজিপ্ট প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন।

আমাদের বিশ্বাস, মিশর, পারস্য, আসিরিয়া এবং গ্রীস দেশবাসীগণ সকলেই হিন্দুদিগের নিকট হইতে সভ্যতা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছিল; এবং এই কারণে মিশর, আসীরীয়, গ্রীসিয়, জার্ম্মান্, স্ক্যাণ্ডেনেভিয় ও ড্রুইডদিগের লৌকিক পুরাণে হিন্দু পুরাণ শাস্ত্রের ছায়াপাত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল উপনিবেশের বিস্তারিত বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। তৎপূর্ব্বে আমরা পৌরাণিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রসঙ্গের আলোচনা করিব।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

আঁধার।

আঁধার—আঁধার—চারিদিক আঁধার, এ আঁধারের অন্ত নাই। জগৎ নিরবচ্ছিন্ন আঁধারে ব্যাপ্ত। মানব—আকুল হইয়া ভীত মনে আঁধারের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে চেষ্টা করে কিন্তু আঁধার তাহাকে ছাড়ে না। সে মানবকে বড় ভাল বাসে. মানবের চারিদিকে ঘিরিয়া থাকাই. তাহার প্রকৃতি, মানব তাহার বড় ভালবাসার জিনিষ। মাতৃগর্ভ হইতে সে আপনার মনোহর মূর্ত্তি দেখাইয়া—অবশেষে তাহাকে নিজের অনন্ত কোলে টানিয়া লয়। কিন্তু মানব এমন সুহৃদকে ভয় করে কেন? কেন তাহাকে পাইয়া ঠেলিয়া ফেলিতে চায়! মানবের সঙ্গ ধরিয়া তাহার চির জীবনে

আমি আঁধার দেখিয়াছি, আঁধারে বড় ভীত হইয়াছিলাম। কিন্তু একবার ভাবিয়াছিলাম, কই আঁধার ত আমায় ভয় দেখায় না আমিই আঁধারকে ভয় করি। সেই অবধি প্রাণে আঁধারের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে। সময় পাইলেই আঁধারের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকি, আঁধার আমার চারিদিকে তাহার স্নেহস্নিগ্ধ হস্তটী বুলাইতে থাকে, তাহার সেই গভীর স্নেহ ভরা কোল যেন আমার আজন্ম পরিচিত বলিয়া বোধ হয়। সে কোল বড় সুন্দর, বড় প্রাণারাম। থাক্ থাক্ এই ভাবেই এ জীবনে আঁধার থাকিয়া যাক্। আলো বলিয়া যাহা আছে, তাহাও থাকুক, আমার আঁধার ছাড়িয়া আলোর প্রয়োজন নাই।

আমি প্রাণ ভরিয়া আঁধার দেখিতে থাকি—এস এস আঁধার আমার এ ক্ষুদ্র জীবনকে ব্যাপ্ত করিয়া থাক। আমি গাঢ় অমানিশিতে তোমায় দেখিতে দেখিতে প্রাণে স্বর্গের সুখ উপভোগ করিব। জগত তোমাতে আচ্ছন্ন হইয়া যাক। তুমি না থাকিলে আজ আলোকের আদর হইত না। তুমি বিশ্বের কালিমার সহিত আমার অন্তরে আসিয়া দাঁড়াও. দাঁড়াও দেখি শ্যাম, শ্যামার সহিত মিলাইয়া দাঁড়াও দেখি, জলধির অঙ্গে তোমায় ছায়া ঢালিয়া দাঁড়াও, রমণীর কুঞ্চিত কেশের মাঝে আছি

তোমায় প্রাণ ভরিয়া দেখিতে থাকি। তুমি জগতের আদি, বিশ্বধাত্রী; তোমায় দেখিলে ভীত হই না। সন্তানের কাছে মায়ের মূর্ত্তি কি ভীষণ? তোমায় দেখিয়া ভয় কিসের?

কত রত্নের আধার তুমি মানব তাহা এক বারও ভাবিয়া দেখে না। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তোমাতেই বিলীন হইয়া যায়। তুমি সকলের অন্ত, কিন্তু তোমার অন্ত নাই। অনন্ত-রত্নের খনি, তোমাতে ডুবিলে আর কিছুই প্রয়োজন হয় না। মানব তোমার মধ্যে ডুবিবার জন্য আসিতেছে, মানব তোমাতে ডুবিতেছে কিন্তু তাহার অন্তরে কি ভয়! তোমাতে ডুবিতে হইবে ইহা অতি সত্য কিন্তু তবুও কি ভয়! কি আকুলতা! এ দশা কি ছাড়িবে না।

তুমি শান্ত, তুমি ধীর, মহাযোগীর মত উদাসীন। তোমার অনন্ত গাঢ় মূর্ত্তি কখনও ত্যাগ করিতে পারি না এই মূর্ত্তি তোমার নিত্য। এই মূর্ত্তিতেই জগতের আদি ও অন্তের দ্রষ্টা। প্রকৃতির প্রত্যেক অণুপরমাণু তোমার নিত্যতা প্রকাশ করিতেছে। ঢাল ঢাল তোমার অক্ষয় সুধাভাণ্ড চারিদিকে ঢালিয়া দাও, প্রাণ ভরিয়া তোমার মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে অমর হইয়া যাইব। তুমি কবির কল্পনার বহির্ভূত, যোগীর ধ্যানের অগোচর আত্ম—নিত্য চিরব্যাপ্ত হইয়া মানবের জ্ঞানের বাহিরে রহিয়াছ। তোমাতে ডুবিতে দাও, দুই বাহু তুলিয়া তুমি জগতকে তোমাতে ডুবিবার জন্য ডাকিতে থাক। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবে?

কবে তোমারই তরে হইয়ে আকুল
ছুটিব তোমার পানে!
কবে তোমার সহিত সুর মিলাইয়ে
গাহিব একই তানে!
কবে পরাণ পিয়াসা মিটিয়া যাইবে
হৃদে রবে তুমি আঁকা!
কবে "তুমি" আর "আমি" মিলিয়া যাইব
রহিব না (আর) একা!

শ্রীউপেন্দ্র নাথ ঘোষ। দক্ষিদার।

জলমগ্ন টিটানিকের প্রতি।

পোত-শ্রেষ্ঠ টিটানিক, শিল্পের গৌরব,
অবিনশ্বর সিন্ধুসেতু ভেবেছিনু মোরা,
জলধি ভীষণ কিন্তু, হয়ে জ্ঞান-হারা
এড়িলা তুষাররূপী তোর মৃত্যু-বাণ,
মুহূর্ত্তেকে ভিন্ন করি অভেদ্য কবচ,
অবিমৃষ্য উৎসবের করি অবসান,
মহোদরে নিল টানি' মহান্ জাহাজ
সহযাত্রী শত শত অতি মহাজন,
যাহাদের কীর্ত্তিপূত অবনী সদাই;
বাড়াতে হে রত্নাকর, আপন রতন
বসুধার রত্নরাজি হরে নিলে তাই?
কি নির্ভীক পুরুষের আত্ম-বলিদান!
অবলা রমণী-রক্ষা, শিশু অসহায়,—
এ অপেক্ষা কিবা উচ্চ-জাতীয় সম্মান?
স্বদেশের কাছে চির কৃতজ্ঞ বিদায়,

নহে অপমৃত্যু, মহা অমরত্ব-লাভ।
মধুর কর্ত্তব্য, তার মধুময় স্মৃতি
সমুজ্জ্বল আদর্শের চূড়ায় অভাব ;
গাহিবে বনের পাখী এ যশের গীতি।
এত উদারতা, কিন্তু এত অহঙ্কার,
অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র আবিষ্কারে
দুর্নিবার নিয়তির প্রলয়-ঝঙ্কার
নগন্য মানবী শক্তি চাহে রোধিবারে।
বৃথাগর্ব্ব পরিহার কররে মানব,
দেখ মনে স্রষ্টা তব সর্ব্বশক্তিমান্!
(তাই বলি রে টিটানিক!)
এনহে অকাল ধ্বংশ, অপযশ তব,
মহাশিক্ষা দাম্ভিকের তব অবসান।

শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক।

বা

ওয়ার্টারের বিষাদে কাহিনী।

ষষ্ঠপত্র।

এত অল্পদিনের মধ্যে কত লোকের সহিত যে আলাপ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ; কিন্তু আজও আমার সহচরের পদ শূন্য! কি আশ্চর্য্য! বিদেশীয়ের প্রতি ইহাদের এত আসক্তি কিরূপে জন্মিল? আমি ভ্রমণে বহির্গত হইলে ইহারা আমার অনুগমনের নিমিত্ত উৎসুক হয়। আমিও যখন অনন্যোপায় হইয়া তাহাদিগকে বিদায় দিই, প্রাণের ভিতর যেন কোথা হতে একটু ব্যথা অনুভব করি। কে ইহারা? ইহাদের প্রকৃতি বা কিরূপ? জগতের আর আর অংশে যেরূপ মানুষ প্রত্যক্ষকর, ইহারা তাদেরই অনুরূপ। বিধির সৃষ্ট মানুষের রীতি একই প্রকার—কেবল অবস্থান্তরই মানুষের রূপভেদ করে। সামান্য জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত জগতের অধিকাংশ লোক জীবনের সুদীর্ঘকাল পরিশ্রমে ব্যয়িত করিতেছে—অবশিষ্ট অত্যল্প অবসর দুর্বিসহ বোধে, কিরূপে সত্বর অতিবাহিত করিবে, তাহার উপায় অনুসন্ধানে ব্যস্ত রহিয়াছে। মানব, এই কি তোমার নিয়তি?

আমি এস্থানে নব আলাপনের সুখে আছি। হে পদগর্ব্বিত! তুমি কি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাও, আমি কি ছিলাম—এখন কি হয়েছি? সত্য বটে, আমি কে ভুলিয়াছি ; কিন্তু, এইরূপে আপনাকে ভুলিয়া, আপনাকে উপভোগ করিতে জানিয়াছি। আতিথ্য-বিধান পূর্ব্বক সমাগত বন্ধুগণের সহিত রসালাপ, কভু তাঁহাদের সহিত উপবন ভ্রমণ, কখন গীতবাদন, কখন বা অন্য কোনও চিত্ত-রঞ্জন-প্রমোদে লিপ্ত হইয়া যে আনন্দ-উপভোগ অনুভব করি, ইহা কি পূর্ব্বে সম্ভব ছিল? ইহারা স্ব স্ব হীনতা অনুভব করিয়া আমার সহবাসে সঙ্কুচিত হইতে পারে, এজন্য আমাকে সময়ে সময়ে আত্মপ্রচ্ছন্ন করিতে হয় সত্য বটে—এরূপ আত্মগোপনের আয়াস সুখের পথে অন্তরায় স্বরূপ সত্য বটে ; কিন্তু, ইহাতে ক্ষোভ প্রকাশ আমার পক্ষে শোভা পাইবে কেন? আমি যদি নিরবচ্ছিন্ন সুখেরই অধিকারী হইব, তবে আজ আমাকে

যৌবনের সঙ্গিনী প্রাণ-প্রিয়া প্রণয়িনীর বিয়োগে কাতর হইতে হইবে কেন? এ জীবন বিলাপ ও পরিতাপে অতিবাহিত করিবার জন্যই তাঁহার সহিত ক্ষণস্থায়ী সে পরিচয়ই বা হইবে কেন? সে প্রিয়তমা আর জীবিতা নাই—ওহো কি তীব্র-যন্ত্রণাময়ী স্মৃতি! প্রিয়তমে! এ সুখের সংসারকে দগ্ধ অরণ্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া তুমি কি এখন পরলোকে আমার প্রতীক্ষা করিতেছ?—না এরূপ বিলাপের আর পরবশ হইব না।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে যশস্বী মিঃ ব—এর সহিত পরিচয় হইয়াছিল। এই যুবকের আকৃতি অতি মনোজ্ঞ। ইনি সম্প্রতি "উপশালা" বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। অপর হইতে নিজ অসাধারণতা বিদিত থাকিলেও, ইনি অকারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের প্রয়াস করেন না। ইনি যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি,তাহাতে সন্দেহ কি? তথাপি, আমার মনে হইল, ইহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হইতে চরিত্রের অধ্যবসায়ই সমধিক প্রশংসনীয়। একাধারে চিত্রবিদ্যা ও গ্রীকভাষার বুৎপত্তি অধিবাসিগণ অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক বলিয়া মনে করে। ইহাদের মধ্যে কাহারও নিকট আমার সুখ্যাতি শ্রবণে ইনি আমার সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হয়েন। কথা প্রসঙ্গে ইহার পাণ্ডিত্য ও অধীত গ্রন্থপরিমাণ অনুভব করিলাম ইনি বলিলেন, ;—"সালস্তারের" 'থিওরি'র প্রথমাংশ অধ্যয়ন করিয়াছি। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে 'হিনেস'এর একখানি পাণ্ডুলিপি হস্তগত আছে।" ফলতঃ ইহার সহিত আমি বিলক্ষণ কথালাপসুখ অনুভব করিয়াছিলাম। আরও একটী যোগ্য ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। ইনি কোনও কুমারের ধনাধ্যক্ষ। চরিত্রের সৌজন্যে ও হৃদয়ের মহত্ত্ব হেতু ইহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি না করে এমন লোক এ দেশে দেখি না। ইহার পুত্র কন্যা নয়টী। একপ শুনিতে পাই ইনি যখন গৃহে পুত্রকন্যাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকেন, তখন সে দৃশ্য দেখিলে অন্তরে আপনা হইতে আনন্দের সঞ্চার হয়। ইহার জ্যেষ্ঠ কন্যার সুখ্যাতি নিয়ত লোকমুখে কীর্ত্তিত হয়। ইনি আমাকে গৃহদর্শনের অনুরোধ করিয়াছেন। অবসর লাভমাত্র ইহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া ইহার সম্মাননা করিব। ইনি বিপত্নীক, পত্নীবিয়োগের পর পূর্ব্বতন সুখ স্মৃতিজড়িত পূর্ব্বাবাস সুকোমল হৃদয়ের দারুণ ক্লেশোৎপাদক হইলে ইনি সে আবাস পরিত্যাগ করেন। তদবধি কুমারের করুণা-চিহ্ন-রূপে এই আবাস লাভ করিয়া বাস করিতেছেন। একদিকে ইহাদের সহিত আলাপ যেরূপ প্রীতিকর ও প্রার্থনীয়, অন্যদিকে অপর কয়জনের সহিত পরিচয় তদ্রূপ বিরক্তিপ্রদ হইয়াছে। ইহাদের আচরণ স্মরণ করিলে কখন অবজ্ঞা কখন বা হাস্যের উদ্রেক হয়। ইহাদের সঙ্গ প্রার্থনা না করিলেও ইহারা সতত সঙ্গদানে তৎপর; ইহাদের সৌহার্দ্দের অবসর না হইলেও ইহারা সতত সৌহার্দ্দ স্থাপনে উদ্যত; বিনয়ের আতিশয্য প্রদর্শনে যে বিনয়ের অভাব ঘটে, ইহারা সে ধারণায় অনভিজ্ঞ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিনী—একখানি সুলভ আয়ুর্ব্বেদ সংক্রান্ত মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। ঢাকা হইতে এই মাসিক পত্র খানি বেশ নিয়মিত রূপে প্রকাশ হইতেছে। পত্রিকা খানির অনেক প্রবন্ধই সুখপাঠ্য এবং উপকারী। সরল ও সহজ ভাষায় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা প্রকাশ করাই ইহার উদ্দেশ্য। এরূপ পত্রিকার আদর বাঞ্ছনীয়।

সাহিত্য বান্ধব।—একখানি মাসিক পত্র সম্পাদক শ্রীতারা কুমার কবিরত্ন। পত্রিকা খানি অতি ক্ষুদ্র এবং সাহিত্য সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ইহাতে ধারা বাহিক রূপে প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু তাহা সত্বেও ইহাতে সময়ে সময়ে অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ডায়মণ্ড হারবার হীরকচন্দ্র হইতে প্রকাশিত।

রামলীলা। স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক বিরচিত একখানি পৌরাণিক গীতাভিনয়। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি, স্বর্গীয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি রঘুবংশ উত্তররামচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আভাষ লইয়া এই পুস্তকের প্রণয়ন করিয়াছেন। গীত গুলির বাঁধা অতি পরিপাটী। যাহারা যাত্রা করিয়া আমোদ উপভোগ করিতে চাহেন, আমরা তাহাদিগকে এই ধর্ম্মমূলক গ্রন্থের অভিনয় করিতে অনুরোধ করি, ইহাতে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে। প্রাপ্তিস্থান কর্ম্মযোগ প্রেস, হাবড়া।

তারার মালা।—একখানি ক্ষুদ্র গল্পের বই, বেগমবাহার"তৈলের আবিস্কর্ত্তা হাকিম মসিহর রহমান; ক্রেতাগণকে এই পুস্তক বিনামূল্যে উপহার দিয়া থাকেন। লেখকগণকে অর্থ পুরস্কার প্রদান করিয়া তাহাদের দ্বারা গল্প লেখাইয়া হাকিম সাহেব এই পুস্তক প্রচার করিয়া বঙ্গসাহিত্য সেবীগণকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, তাহাতে তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। পুস্তক খানিতে অনেকগুলি গল্প আছে, তন্মধ্যে কয়েকটী গল্প আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। পুস্তকস্থিত হাপ টৌন ছবি গুলিও চিত্তাকর্ষক। গ্রাহক গণ ১১৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতায় উক্ত হাকিম সাহেবের নিকট হইতে বেগমবাহার খরিদ করিলে পাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা আজ ৯ মাস "আলোচনা" সকলের নিকট পাঠাইতেছি কিন্তু গ্রাহকগণ অদ্যাবধি তাহাদের বার্ষিক সামান্য মাত্র সাহায্য ১৷৹ পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন না গ্রাহকগণের কৃপাদৃষ্টির উপরই পত্রিকার জীবন নির্ভর করিতেছে। আমাদের নূতন ও পুরাতন সকল গ্রাহকের নিকট আমরা ক্রমশঃ "আলোচনা" ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিকমূল্য ১৷৹ টাকা ও ভিঃ পিঃ খরচ ⁄৹ আনা মোট ১৷⁄৹ আদায় করিব। যাঁহাদের আপত্তি থাকে সত্বর জানাইবেন। নূতন গ্রাহক গণও যেন ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত না করেন—ইহাই প্রার্থনা।

সারস্বত সুখ গীতি।

দেব ভাষা মহা সিন্ধু করিয়ে মন্থন
রত্ন তুলি রত্নমালা কে করে গ্রন্থন ?
নাহি সে 'ভারবি'—'মাঘ'
'কালিদাস' মহাভাগ
সবাই ত্রিদিব ধামে লভিয়াছে ঠাঁই
আগের ভারতবর্ষ আজি ত মা নাই !

দীন মোরা হীনাবস্থা পরের অধীন,
স্ফূর্ত্তিশূন্য মনে বীণা বাজে কি নবীন ?
আগে ছিল "নবরত্ন"
পাইয়া শুশ্রূষা যত্ন
এখন সে ক্ষণ চলে গিয়াছে ভারতী,
কে আর করিবে তব অর্চ্চনা আরতি ?

সেরূপ সুযোগ্য পুত্র দেখিনা চাহিয়া
সরোজ চরণ পূজে ভাবাঞ্জলি দিয়া,
অল্প বুদ্ধি মোরা মাতঃ,
তুমিত সকলি জ্ঞাত
ভয়ে ভয়ে করিয়াছি তব আবাহন
কর মা অজ্ঞান সুতে স্নেহ বরষণ !

এখনো মা তীর্থ পথে আমরা দাঁড়ায়ে
কেমনে সুদীর্ঘ পথ যাব মা ছাড়ায়ে ?
মা করিলে আশীর্ব্বাদ
পারি না পুরাতে সাধ
তাই মা সজল নেত্রে চাহি পদ পানে,
করি গো করুণা ভিক্ষা আকুল পরাণে !

প্রবল বাসনা মনে সংস্কৃত মন্দিরে
প্রবেশি জীবন ধন্য করি মা অচিরে,
আছে কি মা সে তপস্যা ?
ঘুচিয়া এ অমাবস্যা—
সৌভাগ্য পূর্ণিমা হবে সম্মুখে উদয় ?
যা দেখি গাইব সুখে "বাগ্‌বাণীর" জয়

যুগ যুগান্তের কত ঐশ্বর্য্যের রাশি
রয়েছে পুণ্য-মন্দিরে দীপ্তি পরকাশি,
সে সৌন্দর্য্য হেরিবারে
দিয়াছ সামর্থ্য যারে
যথার্থ সে কৃতী-পুত্র সংসারে তোমার,
সাধনায় ঘটিয়াছে পূর্ণ সিদ্ধি তাঁর !

করিবে কি এত দয়া হে সুর বন্দিতা,
নির্গুণে স্বগুণে আজি হইয়ে সুপ্রীতা ?
জানি মা সকলি জানি
তুমি করুণার রাণী
তব অযাচিত দয়া করিয়া গ্রহণ
বাল্মিকী রচিলা "সপ্তকাণ্ড রামায়ণ !"

সে যুগ প্রবর্ত্ত যদি কর গো জননী
উঠিবে ভারতে পুনঃ সুমঙ্গল ধ্বনি,
মধুরত্ত সে সাম গানে
পীযুষ বর্ষিবে কাণে
যাগ যজ্ঞ আরাধনা আসিবে ফিরিয়া
শাশ্বত-ধর্ম্মের জয় সগর্ব্বে গাহিয়া !

সবিনয় নিবেদন—আমরা অনবরত ৯ মাস গ্রাহকগণের নিকট যথারীতি পত্রিকা প্রেরণ করিয়া ২।০ বার তাগিদ পত্র প্রদানের পর ভিঃ পিঃ করিলেও গ্রাহকগণ অম্লানবদনে [illegible] ফেরৎ দেন। স্বদেশ বাসীর দুঃখ অর্থের অপব্যয় করাইয়া তাহাদের যে কি সম্মান বর্দ্ধিত হয় বলিতে পারিনা। যাহারা নমুনা গ্রহণ করেন—তাহাদের নিকট হইতে কোন রূপ পত্র না পাইলে গ্রাহক হইতে ইচ্ছা আছে জানিয়া পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় কিন্তু তাহারাও তদ্রূপ, একণে বৎসর শেষ হইতে চলিল আমাদের নূতন ও পুরাতন গ্রাহকগণ সত্বর তাহাদের মতামত জ্ঞাপন করুন—নতুবা ক্রমশঃ সকলেরই নামে ভিঃ পিঃতে পত্রিকা প্রেরিত হইবে। যেন কেহ ফেরৎ পাঠাইয়া আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত না করেন—ইহাই প্রার্থনা।

ম্যানেজার।

কর মা সে শুভ দিন ভারতে উদিত
দেখিয়া জগৎ হউক বিমুগ্ধ বিস্মিত,
সে পবিত্র বেদ গানে
আবার জাগুক প্রাণে
সুতীব্র ব্রাহ্মণ্য তেজ প্রদীপ্ত শিখায়
যে তেজে সগর বংশ সদ্য ধ্বংশ পায়!

হায় মা বলিতে বক্ষ যায় বিদরিয়া
নব ধর্ম্ম স্থাপিতেছে আর্য্যে উপেক্ষিয়া
কল্পিয়া ব্যবস্থা পাঁতি
মাতিয়াছে নিম্ন জাতি
ঐ শুন দিকে দিকে ঘোর আস্ফালন
চলিছে প্রচণ্ড তেজে ব্রাহ্মণ-দলন!

দাও মা ঘৃণিত বিপ্রে সেই ধর্ম্ম বল
অগস্ত্য শোষিলা যাহে সপ্ত সিন্ধু জল,
মজিল করিয়া ক্রটি
যাদব "ছাপান্ন কোটি"
পড়ে হরিশ্চন্দ্র লুটি বিশ্বামিত্র পদে
ভূষিত কর মা সেই ব্রাহ্মণ্য সম্পদে!

বিষাদ আঁধারে আর রেখ না ফেলিয়া
সনাতন ধর্ম্মজ্যোতি দাও মা জালিয়া,
দেখিয়া ভারতবর্ষ
আবার জাগুক হর্ষ
সংস্কৃত-আবৃত হউক এ মহী মণ্ডলে,
কাঙ্গালের এ প্রার্থনা সুখ গীতি ছলে!

শ্রীমহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সতী ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

(২)

সতীত্ব ও 'পতিব্রতা-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবিধ শাস্ত্রে বহুবিধ উৎকৃষ্ট উপদেশাবলী বর্ণিত আছে। কিরূপ ভাবে সতীত্ব রক্ষিত হয়, কিরূপ আচরণ করিলে পতিব্রতা হওয়া যায় এবং ভর্ত্তা বিদেশবাসী কিংবা পরলোকগত হইলেই বা ভার্য্যার কিরূপ সংযতভাবে অবস্থান করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয়ের স্থূল তাৎপর্য্য বিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে নিম্নে প্রকটিত হইল।

মহিলা ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরাশর সংহিতায় এই রূপ লিখিত আছে,—

(ক) মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ॥
তিস্রঃ কোটোহর্দ্ধ কোটিশ্চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারিং যানুগচ্ছতি॥"

অর্থাৎ, ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে, যে রমণী ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করেন, তিনি পরকালে ব্রহ্মচারীদের ন্যায় স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। মানবশরীরে যে সার্দ্ধ তিন কোটী লোম আছে, কামিনী স্বামীর সহমৃতা হইলে তাবৎকাল স্বর্গে বাস করেন।

(খ) "দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারিং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃপুনঃ॥"

অর্থাৎ—রমণী, দরিদ্র ব্যাধিত ও মূর্খ

স্বামীকে অনাদর করিলে দেহান্তে ভুজঙ্গিনী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ও জন্মে জন্মে বিধবা হয়।

ফলতঃ পতিই নারীর পরম দেবতা। অবলা জাতির পক্ষে এ হেন পরম পূজনীয় পতি-দেবতাকে একান্ত মনে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও যত্ন করাই সঙ্গত।

(গ) "ঋতুস্নাতা তু যা নারী ভর্ত্তারং নোপ-সপতি।

সা মৃতা নরকং যাতি বিধবা চ পুনঃপুনঃ॥"

অর্থাৎ,—ঋতু স্নানান্তে স্বামি-সেবা না করিলে রমণী জন্মে জন্মে বিধবা হয় ও নরক যাতনা ভোগ করে।

(ঘ) "আসনাচ্ছয়নাদয়নাৎ সম্ভোষাৎ সহভোজ-নাৎ।

সংক্রামন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥"

অর্থাৎ,—বিন্দুমাত্র তৈল জলে পতিত হইলে, যেমন সমস্ত জল ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ পাপীর সহিত একত্র উপবেশন, শয়ন, গমন, আলাপ এবং ভোজন করিলে পাপহীনকেও পাপাশ্রয় করিয়া থাকে। সাধ্বী মহিলাগণের কুত্রাপি অসৎ চরিত্রা রমণীদের সহিত এক সঙ্গে শয়ন, ভোজন ও কথোপকথনাদি করা কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বদা ধর্ম্মশীলা সুচরিত্রা মহিলা-দের সহিত একত্র অবস্থান করাই তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে সমীচীন।

বস্তুতঃ লোক সঙ্গদোষেই চোর এবং সঙ্গ-গুণেই সাধু হইয়া থাকে। বুধগণ বলেন যে, "সৎসঙ্গে কাশীবাস" সাধু সংশ্রবে যে হৃদয় পবিত্র ও নিষ্পাপ হয় তাহাতে সংশয় নাই।

স্ত্রী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে "যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়" এই রূপ লিখিত আছে,—

(ক) "পতি প্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতে-ন্দ্রিয়া।

ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখং॥"

অর্থাৎ,—যে স্ত্রী স্বামীর প্রিয় ও হিতকার্য্যে লিপ্ত থাকেন এবং সদাচার পরায়ণ ও সংযতে-ন্দ্রিয়া হন, তিনি ইহকালে কীর্ত্তি ও পরকালে অনুপম সুখ লাভ করেন।

(খ) "যত্রানুকূলং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে।

অর্থাৎ,—যে বংশে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর প্রণয় থাকে, সেই বংশের ধর্ম্মার্থ ও ভোগ বর্দ্ধিত হয়।

ভগবান মনুও একস্থলে বলিয়াছেন,—

"সন্তুষ্টো ভার্য্যায়া ভর্ত্তা ভর্ত্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।

যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রৈব ধ্রুবম্॥"

অর্থাৎ,—যে কুলে ভার্য্যা সর্ব্বদা ভর্ত্তাকে এবং ভর্ত্তা সর্ব্বদা ভার্য্যাকে সন্তুষ্ট রাখেন, সে কুলের মঙ্গল সুনিশ্চিত।

(গ) "পতি শুশ্রূষণং কর্ম্মভক্ত্যাদি সু সমাহিতা।

সত্যাচারাদি ভূষাচ গৃহকার্য্যং সমাচরেৎ॥

অনেনৈব বিধানেন সেবতে পতিং

সা যাতি সুভগা যা নারী রাজন্

বিষ্ণুলোকং সুদুর্লভং॥"

অবলাগণ লোভ হীনা, অল্পে তুষ্টা, ধর্ম্মজ্ঞান সম্পন্না, দক্ষা, সর্ব্ব কর্ম্মে সাবধান, সত্যভাষিনী ও প্রিয়বাদিনী হইবেন এবং শুদ্ধান্তঃকরণে স্বামীসেবা করিবেন।

স্ত্রী ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছেঃ—

দীর্ঘতমা উবাচ।

(ক) "অদ্য প্রভৃতি মর্য্যাদা ময়ালোকে
প্রতিষ্ঠিতা।
এক এব পতি নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্॥ ৩১
মৃতেজীবতি বা তস্মিন্ন পরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্।
অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥" ৪২

অর্থাৎ,—মহর্ষি দীর্ঘতমা বলিতেছেন, অদ্যাবধি আমি লোকদিগের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিলাম। রমণীর মাত্র এক পতি হইবে; এবং সে যাবজ্জীবন তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকিবে। সেই স্বামী বর্ত্তমানে কি অভাবে স্ত্রী বিপথগামিনী হইলে নিশ্চয় পতিতা হইবে।

(খ) "ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিং নার্য্যা অদ্য প্রভৃতি
পাতকম্।
ভ্রূণ হত্যা সমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহম্॥"

অর্থাৎ,—অতঃপর যে রমনী স্বামীকে অতিক্রম করিবে, তাহার গর্ভস্থ সন্তান (ভ্রূণ) হত্যার সমান পাতক জন্মিবে।

(গ) বৈষম্যমপি সংপ্রাপ্তা গোপয়ন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
আত্মানমাত্মানা সত্যোজিতাস্বর্গা ন সংশয়ঃ॥"
(বন।)

অর্থাৎ,—কুল-স্ত্রীগণ বিষম অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও আপনাকে আপনি রক্ষা করেন। এই হেতু ঐ সকল সাধ্বী মহিলাগণ নিশ্চয় স্বর্গভোগ করিয়া থাকে।

(ঘ) "জলোদর সমাযুক্তাঃ শ্বিত্রিণঃ পালিতাস্তথা।
অপুমাংসঃ কৃতাঃ স্ত্রীভির্জড়াষ্চ বধিরাস্তথা॥
পাপানুগাস্ত পাপাস্তাঃ পতিমুপনয়ন্ত্যুতঃ।
ন জাতু বিপ্রিয়ং ভর্ত্তুঃ স্ত্রিয়াকার্য্যং কথঞ্চন॥"
(ঐ।)

অর্থাৎ,—পাপপরায়ণা রমণীগণ স্বামীকে বশতাপন্ন করিবার জন্য তাঁহাকে ঔষধ (মূলাদি) ভক্ষণ করাইয়া থাকে। ইহাতে অনেকে জলোদরগ্রস্ত, শ্বিত্রি (কুষ্ঠা), পতিত, জড়, অন্ধ বা বধির প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে। ভর্ত্তার অপ্রিয়াচরণ করা স্ত্রীর কখনও উচিত নয়।

(ঙ) "প্রিয়াংশ্চ রক্তাংশ্চ হিতাংশ্চ ভর্ত্তু
স্তান্ ভোজয়েথা বিবিধৈরুপায়ৈঃ।
দ্বেষ্যৈরপক্ষ্যৈ রহিতৈশ্চ তস্য
ভিদ্যস্ব নিত্যং কুহকোদ্যতৈশ্চ॥
(ঐ)

অর্থাৎ,—স্ত্রী পতির প্রিয়, অনুরক্ত ও হিতকারী ব্যক্তিদিগকে যত্নের সহিত ভোজন করাইবেন এবং স্বামীর দ্বেষ্য, বিপক্ষ, অহিতাচারী ও কুহকী ব্যক্তি সকল হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবেন।

(ক) "পানং দুর্জ্জনসংসর্গ পত্যাচ বিরহোহ
টনং।
সপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারী সংদুষনানিষট্॥"
(হিতোপদেশ।)

অর্থাৎ,—সুরাপান, দুর্জ্জন সংসর্গ, পতিবিরহ, যথেচ্ছা ভ্রমণ, অসময়ে শয়ন এবং পরগৃহে বাস এই ছয় প্রকার আচরণ নারীদিগের দোষের কারণ।

(খ) "নগরস্থো বনস্থো বা পাপো বা যদি বা
শুচিঃ।
যাসাং স্ত্রীনাং প্রিয়োভর্ত্তা তসাং লোকামহোদয়া॥

অর্থাৎ পতিব্রতা স্ত্রী বনবাসিনী কি নগরবাসিনী, শুচি কি অশুচি যাহাই হউন, তিনি নিশ্চয় স্বর্গলাভ করেন।

(গ) "ভর্ত্তাহি পরমং নার্য্যা ভূষণং ভূষণৈর্ব্বিনা
এষা বিরহিতা তেন শোভনাহপি ন শোভনা॥"

অর্থাৎ,—স্ত্রীলোকের ভূষণ না থাকিলেও স্বামীই তাঁহার ভূষণ। স্বামী-হীনা সুন্দরী হইলেও অশোভনীয়া।

(ক) "পতির্হি দেবো নারীণাং পতির্বন্ধুঃ পতির্গতিঃ।
পত্যাগতিঃ সমা নাস্তি দৈবতং ব যথাপতিঃ॥"
(অনুশাসন।)

অর্থাৎ,—পতিই রমণীর দেবতা; পতিই বন্ধু এবং পতিই গতি। সতীর পতির ন্যায় আর কেহই গতি ও মঙ্গলপ্রদ নহে। অতএব মহিলাদের এহেন পরম পূজ্য পতি-দেবতাকে কায়মনোবাক্যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

(খ) "শ্রুত্বা দাম্পত্যধর্ম্মং বৈসহ ধর্ম্মকৃতং শুভং।
যা ভবেদ্ধর্ম্ম পরমা নারী ভর্ত্তৃ সমব্রতা।
দেববৎ সততং সাধ্বীং ভর্ত্তারমনুপশ্যতি।
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ দেবতুল্যাং প্রকুর্ব্বতী।
বশ্যাভাবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখদর্শনা।
অনন্যচিত্তা সুমুখী সা নারী ধর্ম্মচারিণী॥" (ঐ)

অর্থাৎ,—যে রমণী দাম্পত্য-ধর্ম্ম ও ধর্ম্মকৃত শুভ ফল শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রতাবলম্বন করেন, পতিকে দেবতা সদৃশ সমাদর ও পরিচর্য্যা করেন এবং যে নারী অনন্য মনে স্বামীর বশী-ভূতা থাকিয়া, সহর্ষে সৎকার্য্যে লিপ্ত হইয়া সুখদর্শনা হন, সেই রমণীই ধর্ম্ম পরায়ণা।

(গ) "পরুষাণ্যপি যা প্রোক্তা দৃষ্টা ক্রুদ্ধেন চক্ষুষা
সুপ্রসন্ন মুখী ভর্ত্তুঃ সা নারী ধর্ম্মভাগিনী॥"
(ঐ।)

অর্থাৎ,—ভর্ত্তা পরুষ বাক্য বলিলে কি রোষ-কষায়িত নেত্রে অবলোকন করিলেও যে নারী সুপ্রসন্নমুখে থাকেন, সেই নারীই ধর্ম্মভাগিনী।

(ঘ) "শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ করোত্যবিমনাঃ সদা।
সুপ্রীতাচ বিনীতাচ সা নারী ধর্ম্মভাগিনী॥"

অর্থাৎ,—যে রমণী সন্তোষের সহিত বিনীতভাবে একমনে স্বামীর শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা করেন, তিনি ধর্ম্মলাভ করিয়া থাকেন।

(ঙ) "শেষান্নমুপভুঞ্জানা যথান্যায়ং যথাবিধি।
তুষ্টপুষ্টজনা নিত্যং নারী ধর্ম্মেন যুজ্যতে॥"
(ঐ।)

অর্থাৎ,—যে স্ত্রী পরিবারস্থ সকলকে আহার করাইয়া পরে আপনি ভোজন করেন, এবং যাঁহার আত্মীয়গণ তুষ্ট ও পুষ্ট সেই রমণী ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন।

(চ) "ন কামেষু ন ভোগেষু নৈশ্বর্য্যে ন সুখে তথা।
স্পৃহা যস্যা যথা পত্যৌ সা নারী ধর্ম্মভাগিনী॥"
(ঐ।)

অর্থাৎ,—যে রমণী ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখের স্পৃহা না করিয়া, কেবল পতিকেই অভিলাষ করেন, তিনিই ধর্ম্মভাগিনী হয়েন।

অহো! কি নিষ্কাম স্বামী-প্রেম!—কি উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মোপদেশ!

এ সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,—

"স্বামী সৌভাগ্যবান্ হইলে স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা হইতে বিভবশালিনী হইতে পারা

বান্ধ, সেই স্বামীকে উত্তমা স্ত্রীরা সর্ব্বদা ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে সেবা করেন। কুল কামিনীদিগের পতিই বন্ধু, পতিই অধিদেবতা, পতিই গতি, পতিই পরমৈশ্বর্য্য স্বরূপ ও পতিই বর্ত্তমান সুখ। পতিই ধর্ম্ম দিয়া থাকেন, সুখ দিয়া থাকেন, সর্ব্বদাই প্রীতি দিয়া থাকেন, শক্তি দিয়া থাকেন, সম্মান দিয়া থাকেন; তিনিই মান খণ্ডন করিতে পারেন, তিনিই মাননীয়। বন্ধুবর্গের মধ্যে স্বামীর তুল্য বন্ধু আর নাই। স্বামী স্ত্রীকে ভরণ করেন বলিয়া "ভর্ত্তা", পালন করেন বলিয়া পতি নামে উক্ত হন। তিনি স্ত্রী শরীরের ঈশ্বর বলিয়া স্বামী, পত্নীর কামনা পূর্ণ করেন বলিয়া কান্ত নামে উক্ত হন। তাঁহার সহিত স্ত্রীর পরম সুখ সম্বন্ধ স্থাপিত বলিয়া তিনি "বন্ধু" ও পত্নিকে প্রতিপালন করেন বলিয়া "প্রিয়," ঐশ্বর্য্য দিয়া থাকেন বলিয়া "ঈশ্বর" এবং স্ত্রীলোকের প্রাণের ঈশ্বর বলিয়া "প্রাণের নায়ক" নামে উক্ত হন। * * * স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর কিছুই প্রিয় নাই। এমন কি স্বামী হইতে পুত্রের জন্ম হয় বলিয়া পুত্র স্ত্রীলোকের প্রিয় হইয়া থাকে; অন্যথা একশত পুত্র অপেক্ষাও স্বামী অধিকতর প্রিয়। যাঁহারা অসদ্বংশ জাত, সেই সকল কামিনীই স্বামী কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারে না।" যথাঃ—

"স্ত্রীণাং পতি সৌভাগ্যার্দ্ধতে চ দিনে দিনে।
সুস্ত্রী ভবিতবাযত্নাৰ্ত্তং ভজেদ্ধর্ম্মতঃ সদা॥
পতির্বন্ধুঃ কুলস্ত্রীণামধিদেবঃ সদা গতিঃ।
পরং সম্পৎ স্বরূপশ্চ সুখরূপশ্চ মূর্ত্তিমান্॥
ধর্ম্মদঃ সুখদঃ শশ্বৎ প্রীতিদঃ শক্তিদঃ সদা।
সম্মান দোহমানদশ্চ মান্যশ্চ মান খণ্ডনঃ।
ন চ ভর্ত্তুঃ সমোবন্ধুর্বন্ধুবর্গেষু দৃশ্যতে॥
ভরণাদেব ভর্ত্তায়ং পালনাৎ পতিরুচ্যতে।
শরীরেশাচ্চ স স্বামী কামদাৎ কান্ত এবচ॥
বন্ধুশ্চ সুখ বন্ধাচ্চ প্রীতি দানাৎ প্রিয়ঃ পরঃ।
ঐশ্বর্য্যদানাদীশ্বরঃ প্রাণেশাৎ প্রাণনায়কং॥
রতিদানাশ্চ মরণঃ প্রিয়োনাস্তি প্রিয়াৎপরঃ।
পুত্রস্তু স্বামিনঃ শুক্রাজ্জায়তে তেন স প্রিয়ঃ॥
শত পুত্রাৎ পরঃ স্বামী কুলজানাং প্রিয় সদা।
অসৎকুল প্রসূতা তু কান্তং বিজ্ঞাতুমক্ষমা॥

বনলালিত শকুন্তলা পতিকুলে প্রেরিত হইতেছেন, কিন্তু এতকাল বনবাসিনী ছিলেন; অতএব গৃহীর ধর্ম্ম কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা কার্য্যতঃ অবগত ছিলেন না; সুতরাং পিতৃ কল্প প্রতিপালক মহর্ষি পতি গৃহগামিনীকে বলিতেছেন,—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয় সখী বৃত্তিং সপত্নীজনে ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ। ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা গুরুজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী যান্ত্যেবং গৃহিনাপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥

অর্থাৎ কন্যা পতিগৃহে গুরুজনের সেবা করিবেন, সপত্নী জনের প্রতি অনুরাগ ব্যতীত কখনও বিরাগ প্রদর্শন করিবেন না। তাঁহাদের সহিত সখীবৎ ব্যবহার করিবেন। ভর্তৃবিমানিতা হইয়াও কদাপি ক্রোধভরে তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিবেন না। মাননীয় জনে বহুল পরিমাণে অনুকূল ব্যবহার করিবেন এবং কখনও ঐশ্বর্য্য মত্তা হইবেন না। যে সকল যুবতী এরূপই

আচরণের বিপরীত অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কুলের কণ্টক স্বরূপ।

প্রকৃত গৃহিণীর আচরণ সর্ব্বত্র এইরূপ হওয়াই উচিত। ভারতীয় কবি এই একটী শ্লোকে যথার্থই রত্নরাশি গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। এক সময়ে ভারতের ঘরে ঘরে এইরূপ লক্ষ্মীস্বরূপা গৃহিণী বিরাজ করিতেন। তখন গৃহস্থের আলয়ে হিংসা, দ্বেষ বা ভোগ বিলাসেচ্ছার কখনও প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইত না। পরিবারবর্গের মধ্যেও সদ্ভাব ব্যতীত অমিল ছিল না। পাশ্চাত্য সমাজের সজ্ঘর্ষণে এক্ষণে ভারতীয় সমাজে কোন কোন স্থলে প্রাচীন ব্যবহারের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। ইহা ভারতবাসীর পক্ষে যারপর নাই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান শতাব্দীর আর্য্য মহিলাদের মধ্যে ঋষি বর্ণিত ঐ সকল সদ্গুণ গুলির বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়। কিন্তু আরব প্রভৃতি অনার্য্য প্রদেশে অনেক সুনিয়ম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা দৃষ্টান্তচ্ছলে "বঙ্গবাসীর" অনুবাদ হইতে তাহার একটি নিদর্শন প্রকটিত করিতেছি।

"আরব দেশীয় কুমারীদিগের পরিণয় হইলে তাঁহাদের জননীগণ স্বীয় স্বীয় কন্যাদিগকে ভবিষ্যতে সুখী করিবার নিমিত্ত এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। যথা,—

"দেখ, বাছা! তুমি বাড়ী ছাড়িয়া একজন অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির সহিত বাস করিতে যাইতেছ, সর্ব্বদা স্বামীর দাসী হইয়া থাকিতে ভুলিও না, এইরূপ করিয়া স্বামীর মন যোগাইয়া চলিলে তোমার স্বামী তোমাকে আপনা হইতেই ভাল বাসিবেন। এবং তাঁহার উপর তোমার ও প্রভুত্ব চলিবে। অল্পে তুষ্ট থাকিও। যতক্ষণ তিনি নিদ্রা না যাইবেন, ততক্ষণ তুমিও ঘুমাইও না। কারণ তুমি জান না, ক্ষুধার জ্বালায় লোক রাগান্ধ হইয়া উঠে এবং নিদ্রার অভাবে মানুষ পাগল হয়। আর দেখ স্বামীর গোপনীয় কথাগুলি অন্য কাহাকেও বলিও না। তিনি হাসিতে থাকিলে তুমি কখনও দুঃখিত ভাব দেখাইও না; আবার তাঁহার দুঃখের সময় তুমি আনন্দ প্রকাশ করিও না।"

জাপান মহিলাগণ নবপরিণিতা দুহিতা দিগকে নূতন শ্বশুরালয়ে গমন কালে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন;—

১। বাছা! তোমার বিবাহ হইয়াছে; এখন আর তুমি আমার নহ। এতদিন তুমি তোমার পিতা মাতাকে যেরূপ মান্য করিতে, এখন হইতে তোমার শ্বশুর শাশুড়ীকেও সেইরূপ সম্মান করিবে।

২। বিবাহিতা পত্নীর উপর পতিরই পূর্ণ অধিকার, তুমি স্বামীকে একমাত্র প্রভু জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা শিষ্ট শান্ত ভাবে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবে। সর্ব্বতোভাবে পতিবশবর্ত্তিনী হওয়াই পত্নীর সার ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

৩। সর্ব্বদা প্রিয় ও মধুর ব্যবহারে শাশুড়ীকে সুখী করিবে।

৪। কখনও ঈর্ষা পরবশ হইবে না; ঈর্ষা নারীর পতি-প্রেম নাশ করে।

৫। স্বামীর অন্যায় ব্যবহারে ক্রোধ না করিয়া, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবে। এবং

ভর্ত্তার ক্রোধের শান্তি হইলে মধুর বচনে তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিবে।

৬। অধিক কথা, মিথ্যা কথা বা প্রতিবেশীর নিন্দাজনক বাক্য বলিবে না।

৭। অধিক রাত্রে শয়ন ও প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিবে। দিবা নিদ্রা বা সুরাপান করিবে না। তুমি পঞ্চাশ বর্ষ বয়সে পদার্পণ না করা পর্য্যন্ত জনতা বা সভা-সমিতিতে যোগদান করিবে না।

৮। দৈবজ্ঞের নিকট অদৃষ্ট ফল জানিতে যত্ন করিও না।

৯। পরিমিত ব্যয়ী ও গৃহকার্য্যে নিপুণা হইবে।

১০। যুবকদের সহিত মিশিও না।

১১। উজ্জ্বল বর্ণের রঙ্গীন বস্ত্র পরিধান করিবে না। কিন্তু তোমার পরিচ্ছদ যেন বেশ পরিষ্কৃত ও সাদা-সিদা হয়।

১২। পতি-গৃহে যাইয়া তোমার পিতার ধন বা পদগৌরবের গল্প বা অহঙ্কার করিওনা।

নিম্নে "বেদ ও মন্বাদি শাস্ত্রোক্ত বিবাহ রীতি সমস্ত কেবল পতি কর্ত্তৃক পঠিত, শাস্ত্রোক্ত পাণিগ্রহণ ও ভোজন প্রভৃতি হোম কালীন ১১টী এবং ঋগ্বেদোক্ত ১টা, সাকল্যে ১২টা মাত্র মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আর্য্য মহাশাস্ত্রোক্ত বিবাহ বিষয়ক মন্ত্র দ্বাদশের সহিত জাপানী রীতি দ্বাদশের কোন অংশে কিরূপ সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে পাঠক পাঠিকাগণ তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন।"

মন্ত্রার্থ।

১। হে কন্যে! আমি সৌভাগ্য অর্থাৎ গৃহাশ্রম সুখ ভোগ জন্য তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি। সকলৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ন্যায় ব্যবস্থাকারী সর্ব্ব জগদুৎপাদক সর্ব্বজগদ্ধারক পরমেশ্বর, গৃহকার্য্য নিষ্পাদন নিমিত্ত তোমাকে আমায় সমর্পণ করিয়াছেন, সৌভাগ্যোৎপাদনার্থ জরাবস্থা পর্য্যন্ত তুমি আমার সহিত অবস্থান কর।

২। হে কন্যে! তুমি ক্রূর দর্শনা এবং পতি ঘাতিনী না হইয়া আমার সহিত অবস্থান কর। তুমি গো মহিষাদি পশুগণের সুখ বিধাত্রী হও। তুমি প্রসন্ন চিত্তা, তেজস্বিনী, বীরপ্রসবিনী জীবদপত্যা, পঞ্চম মহাযজ্ঞরতা, গবাদি কারকল্যাণ কারিণী এবং আমাদের মঙ্গল বিধায়িনী হও।

৩। হে কন্যে! প্রজাপতি আমাদের ভাবী পুত্র-পৌত্রগণকে জরাবস্থা পর্য্যন্ত রক্ষা করুন। অর্য্যম সেই পুত্র-পৌত্রগণকে প্রকৃষ্ট গুণ বিশিষ্ট করুন। মঙ্গলবতী দেবতারা, তোমাকে আমায় সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি আমাদের শুভ বিধায়িনী এবং গবাদি-কারকল্যাণকারিণী হইয়া পতিকুলে অবস্থান কর।

৪। হে ইন্দ্র আপনি জল সেচন বিধি দ্বারা আপ্যায়নকারী হইয়া এই কন্যাকে সুপুত্রপ্রসবিনী এবং সৌভাগ্যবতী করুন; এই কন্যাতে দশ সংখ্যা পুত্র প্রদান করুন অর্থাৎ ইহার গর্ভে যেন দশটী পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই দশ পুত্র এবং পতি এই সমস্ত লইয়া যেন গৃহে একাদশ সংখ্যা হয়।

৫। হে কন্যে! তুমি শ্বশুর, শ্বশ্রু, ননদ এবং দেবর ইহাদিগের সমীপে সম্রাজ্ঞী হও অর্থাৎ ইহাদিগের নিকটে সর্ব্বপ্রধানা চিত্ত-রঞ্জনকারিণী হও।

৬। হে কন্যে! তুমি তোমার মনকে আমার কর্ম্মে স্থাপন কর। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ কর। অর্থাৎ আমাদের উভয়ের হৃদয়ের ঐক্য হউক। তুমি স্থির-চিত্ত হইয়া আমার বাক্যের সেবা কর অর্থাৎ অনন্যমনে আমার আদেশ পালন কর। বৃহস্পতি তোমাকে প্রীতি বিধানার্থ নিযুক্ত করুন।

৭। হে কন্যে! অন্নরূপ পাশ এবং মণিবৎ প্রাণ সূত্রদ্বারা ও সত্যরূপ গ্রন্থি দ্বারা আমি তোমার হৃদয় এবং মনকে বন্ধন করিতেছি।

৮। হে কন্যে! তোমার হৃদয় আমার হউক, এবং আমার হৃদয় তোমার হউক অর্থাৎ আমরা উভয়ে একহৃদয় হই।

৯। হে কন্যে! এই গৃহে তোমার চিত্ত-প্রসাদ হউক।

১০। হে কন্যে! আমাতে তোমার মনঃ প্রসাদ হউক।

১১। হে কন্যে! আমাতে তুমি আনন্দ-লাভ কর।

১২। হে দম্পতি! তোমরা দুইজনে গৃহাশ্রমে পরমসুখে বাস কর। কদাপি বিরোধ করিয়া পৃথক হইও না। শতাধিক বর্ষ আয়ুর্লাভ করিয়া সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর। পুত্রপৌত্রাদি সহ পরমানন্দে নিজ গৃহে ক্রীড়া করিতে থাক। ইহাই স্ত্রী-পুরুষের প্রতি ভগবানের আদেশ। *

"এইত আমাদের সনাতন আর্য্য শাস্ত্রের বিবাহ-নীতি! বলিতে কি, স্বামীকে ভার্য্যার সহিত এবং ভার্য্যাকে স্বামীর সহিত সর্ব্বদা মিলাইবার জন্য, সুখের ঘরকন্না করিবার জন্য, গৃহাশ্রম ব্যভিচার বিরহিত করিবার জন্য এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পন্ন করিবার জন্য, আর্য্য শাস্ত্র যাদৃশ প্রয়াসস্বীকার করিয়াছেন, ধরাতলে কোন দেশের কোন শাস্ত্রই তাহা করিতে সমর্থ হন নাই।"

জর্ম্মানদিগের রীতি-নীতির সহিত প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণের সামাজিক অবস্থার অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়; এজন্য প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে জর্ম্মান নারী-নীতি "সঙ্ক্ষেপে আলোচিত হইল।

১। জর্ম্মান দেশে প্রায় প্রতি পল্লীতেই বালিকা বিদ্যালয় আছে। গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বিদুষী বিধবা মহিলাগণ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের অপমান হইতে মুক্তির নিমিত্ত এই সব বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন। তিন চারি বৎসর বয়স্কা ক্ষুদ্র বালিকারা অতি উৎসাহের সহিত দুইবেলা এই সব শিশু বিদ্যালয়ে গমন করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের ব্যায়াম ও শিক্ষা দুইই হয়। বালিকাদিগকে প্রথমেই লিখিতে পড়িতে না দিয়া, শিক্ষয়িত্রী তাহাদের মনোরঞ্জনার্থ কিছু-দিন বিবিধ ক্রীড়া পুত্তলী ও খেলেনা লইয়া তাহাদের সহিত খেলা করেন। এবং বালি-

* শ্রীযুক্ত বঙ্কু বিহারী বেদজ্ঞ অনূদিত।

কাদের যাহাতে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া নির্ব্বিবাদে খেলা করিতে অভ্যাস হয়, তিনি অতি কোমল শাসনে তাহার ব্যবস্থা করেন, বালিকাদিগকে ক্রীড়া-পুত্তলী সমূহের বেশ-ভূষা পরিধান করাইতেও শিক্ষা প্রদান করা হয়। যখন তাহাদের মন বিদ্যালয়ের প্রতি সম্পূর্ণ আকৃষ্ট এবং স্মৃতি ও ধারণা শক্তির উপযুক্ত বিকাশ হয়, তখন সর্ব্বপ্রথম তাহাদিগকে বর্ণমালা ও ঈশ্বর স্তোত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। অতঃপর বয়ঃবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে পাঠ, কবিতা, আবৃত্তি ও সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করা হয়।

ধর্ম্মোপদেশ ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হইলে, দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বালিকারা সীবন (সেলাই) শিক্ষামন্দিরে গমন করে। তথায় মোজা সেলাই ও কার্পেটবয়ন প্রভৃতি বিবিধ সূচী কার্য্যের শিক্ষা হয়। অতঃপর তাহারা উচ্চ বিদ্যালয়ে গমন করিয়া ফরাশি ভাষা, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ও উদ্ভিদ্ বিদ্যা শিক্ষা করে। অবিবাহিতা কন্যাদিগকে স্বাধীনভাবে একাকিনী কোথাও যাইতে দেওয়া হয় না। মাতা স্বয়ং যাইয়া তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে রাখিয়া আসেন। পঞ্চদশ কি ষোড়শ বর্ষ বয়সে বালিকাদের শিক্ষা সম্পন্ন হয়। তখন তাহাদিগকে সমস্ত পরিবারের জন্য রন্ধন ও আবশ্যকীয় গৃহকর্ম্ম সমূহ সম্পাদন করিয়া ও ধর্ম্মগ্রন্থ সকল নকল করিয়া ধর্ম্মোপদেশ সমূহ শিক্ষা ও সঙ্গীতচর্চ্চা করিতে হয়। তথায় সঙ্গীত ধনীর আমোদ এবং দরিদ্রের আমোদ ও উপজীবিকার প্রধান উপকরণ।

২। জর্ম্মাণগণ পরিচ্ছদ-পারিপাট্য জনিত অহঙ্কারের প্রতি বড় ঘৃণা করেন। তাঁহারা কন্যাদিগকে পরিচ্ছদ গর্ব্বে গর্ব্বিতা বা বেশ-ভূষায় ভূষিতা করিয়া বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতে ভালবাসেন না। জর্ম্মান জনক-জননী কন্যাদিগকে সাদা-সিদা বেশ-ভূষায় তুষ্ট থাকিতেই শিক্ষা প্রদান করেন। কন্যা গরিবের হাতে পড়িলে দরিদ্র স্বামী বিলাসিনী পত্নীকে লইয়া অশান্তি ও অসুখ ভোগ করিবে এই আশঙ্কায়ই তাঁহারা কন্যাদিগকে পোষাক পারিপাট্য ও ভোগ বিলাসিতা শিক্ষা না দিয়া আশৈশব এইরূপ মিতাচারি ও মিতাহারি হইতে শিক্ষা প্রদান করেন। বালিকারাও অতি অল্প বয়সেই জননীর সঙ্গে সঙ্গে গৃহ কার্য্যগুলি শিক্ষা করিয়া থাকে। কন্যা কলাবতী ও বিদুষী হইলেও সদ্দৃষ্টান্তে, উজ্জ্বল বেশ-ভূষার জন্য লালায়িত না হইয়া তাঁহারা মাতার যাবতীয় গৃহ-কার্য্যে সহায়তা, স্বহস্তে রন্ধন, ছিন্ন পরিচ্ছদাদি সেলাই এবং পরিচ্ছদ, পাদুকা ও অন্যান্য গৃহ সামগ্রী সমূহ যথা স্থানে সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ কার্য্যগুলি পর্য্যন্ত সম্পাদন করেন। গৃহের অতি সামান্য কার্য্যটি করিতেও তাঁহারা লজ্জা বা অপমান বোধ করেন না।

৩। জর্ম্মান রমণী মৎস্য, মাংস, উদ্ভিজ্জ খাদ্য ও বিবিধ মিষ্টান্ন পাক করিতে বিশেষ সিদ্ধ হস্ত। তাঁহারা অতি যত্নে স্বহস্তে স্বামী ও পুত্র-কন্যাগণের নিমিত্ত আহার্য্য প্রস্তুত করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পরিচ্ছদাদির তত্ত্বাবধানও গৃহিণীকেই করিতে হয়। জর্ম্মান দেশে শীতকালে উদ্ভিদ পদার্থ কিছু মাত্র পাওয়া যায় না। সুতরাং শরৎকালেই শীতের উপযোগী খাদ্য

প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। এ সময় স্ত্রীলোকের কাজের বড় ভীড় পড়ে। কোন গৃহিণীই একাকিনী স্বীয় পরিবারের উপযোগী খাদ্য প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারেন না। প্রতিবেশিনী মহিলাদের সাহায্যে দল বাঁধিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। পরস্পরের সহায়তায় সকলেরই কার্য্য সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। এ সময়ে স্ত্রী-মহলে পারিবারিক চরিত্র সমালোচনার খুব ধুম লাগে।

৪। জর্ম্মানি-জননী কন্যার মুখ উজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত কোন রূপ যত্ন করেন না। কেবল সূর্য্যালোক হইতে বালিকাদের মুখের কোমলতা রক্ষা করিবার জন্য কুমারীগণের বদন কমল অবগুণ্ঠনের ন্যায় একরূপ মুখাবরণ দ্বারা আবরিয়া রাখা হয়। কিন্তু বালিকাদের কেশ-দামের প্রতি বিশেষ যত্ন করা হয়। সুকেশিনী জর্ম্মান্ বালিকার রঞ্জিত ফিতায় দ্বিবেণী বদ্ধ লম্বমান কেশ পৃষ্ঠদেশে যুগল ফনিনীর ন্যায় শোভা পায়।

৫। বিবাহ ও ধর্ম্মোৎসব ব্যতীত জর্ম্মান সমাজে স্ত্রী পুরুষের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয় না। উক্ত উৎসব কালে স্ত্রী ও পুরুষেরা একত্র সম্মিলিত হইলেও স্ত্রী ও পুরুষ সমাজ বিভিন্ন দিকে থাকিয়া অতি সংযত ভাবে পরস্পর আলাপাদি করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে ও স্ত্রী-সমাজের সহিত পুরুষের কিংবা পুরুষ সমাজের সহিত স্ত্রীলোকের মিশিবার রীতি নাই।

৬। জর্ম্মান যুবকেরা বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার পিতামাতার অনুমতি লইয়া ভাবী পত্নীর সহিত আলাপ করিতে পারেন। কিন্তু সে আলাপ নির্জ্জনে নহে, কন্যার জনক জননীর সম্মুখে করিতে হয়।

জর্ম্মান রমণী সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা ও আড়ম্বর হইতে বিমুক্ত; এজন্য তথায় অতি স্বল্প আয় বিশিষ্ট যুবকেরাও বিবাহ করিতে ভীত নহেন। জর্ম্মান বধূ অতি অল্প আয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বিশেষ পটু।

জর্ম্মাণ রমণী দিগকে পিতা বা স্বামীর মৃত্যুতে অন্ন-বস্ত্রের ভাবনায় অস্থির হইতে হয় না। কারণ পূর্ব্ব শিক্ষা প্রভাবে তাঁহারা শিল্প-কার্য্য, সঙ্গীত কিংবা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিয়া স্বাধীন ও পবিত্র ভাবে অনায়াসেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

ফলতঃ রমণীর শুধু সতী হইলেই চলিবে না। তাঁহাদিগকে পতিব্রতা ও গৃহ-কার্য্যে নিপুণা হইতে হইবে। যে গৃহের গৃহলক্ষ্মী স্বয়ং সংসারের আয়-ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অবস্থানুরূপ চলিতে জানেন না, তিনি সতী হইলেও পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের বিমল সুখ-শান্তি-ভোগ সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। কারণ অভাব-বোধ তাঁহার স্বামি-সেবা রূপ মহাব্রতের ঘোরতর অন্তরায় হয়। যে রমণী গরীব-গৃহিণী হইয়াও তাঁহার নিত্য অভাব-পূর্ণ-দুঃখের-ঘরে সুখের আলো জ্বালিতে পারেন, এ সংসারে তিনিই ধন্যা—তিনিই যথার্থ পতিব্রতা সতী, তাঁহারই নারী-জন্ম সার্থক। ক্রমশঃ—

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন

সন্তোষ-ক্ষেত্র।

পুণ্য-প্রয়াগের পুণ্যতোয়া ত্রিধারার কথা চিন্তা করিতে গেলেই আর একটী অতীতের পুণ্য-স্মৃতি স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। এই সঙ্গম-স্থল যেরূপ অপরিমিত পুণ্যের অনাবিল স্রোত, সেটিও সেইরূপ অক্ষয়কীর্ত্তির পবিত্র ক্ষেত্র; তাহার নাম 'সন্তোষ-ক্ষেত্র।' যথার্থই ইহা প্রভূত সন্তোষের আকর স্বরূপ। ইহা হর্ষবর্দ্ধণ শিলাদিত্যের কীর্ত্তি ক্ষেত্র।

মহারাজ শিলাদিত্য গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে, হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে, বৎসরান্তে একটী অসাধারণ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। এই স্থানের পাঁচ ছয় মাইল পরিমিত বিস্তীর্ণ ভূভাগ ইহার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। উক্তভূমি খণ্ডই সন্তোষ-ক্ষেত্র নামে পরিচিত ছিল। এই ক্ষেত্রের প্রায় চারিহাজার বর্গফিট পরিমিত ভূমি গোলাপপুষ্প-বৃক্ষে পরিবেষ্টিত হইত, এবং এই বেষ্টিত স্থানের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, কার্পাস ও রেশমের নানাবিধ-বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত করিয়া রাখা হইত। এই সকলের সান্নিধ্যে ভোজনাগার সমূহ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শোভা পাইত এবং প্রত্যেকটি প্রায় সহস্র লোকের ভোজনোপযোগী আহারীয় দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ থাকিত। ইতঃপূর্ব্বে, দানশৌণ্ড হর্ষবর্দ্ধণ ঘোষণা দ্বারা ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, মাতৃপিতৃহীন, আত্মীয়বন্ধু শূন্য, নিঃস্ব ও দুঃখী দুর্গতদিগকে নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্তোষ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তদীয় অযাচিত দান গ্রহণের জন্য আহ্বান করিতেন (১)। মহারাজ স্বয়ং অমাত্য ও সামন্তরাজগণে পরিবেষ্টিত হইয়া উক্ত কার্য্য সমাধা করাইতেন। তন্মধ্যে বল্লভীরাজ—ধ্রুবপুতি ক্ষেত্রের পশ্চিমে এবং ক্ষেত্র ও অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের শিবির শ্রেণীর মধ্য ভাগে, আসাম রাজ—ভাস্করবর্ম্মা যমুনার দক্ষিণ তটে এবং কর্ম্মী শিলাদিত্য ভাগীরথীর উত্তর তীরে, আপন আপন সৈন্যদল সহ অবস্থান করিতেন। এইরূপ শৃঙ্খলা, বিশেষ পারিপাট্যশালী ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। বিতরণ কালের পূর্ব্ব হইতে রাশীকৃত ধনরত্ন ঐ স্থলে আনীত হইত; ইহা দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক অপহৃত হইবার আশঙ্কায় ধন ভাণ্ডার সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত থাকিত। সকল বিষয়ে এতাদৃশ সুবন্দোবস্ত থাকায় কার্য্যকালে কোন বিষয়ে অনাটন বা শৃঙ্খলার অভাব হইত না।

অসীম আড়ম্বরের সহিত পঁচাত্তর দিনব্যাপী (১) সেই অলৌকিক দানোৎসব আরম্ভ হইত। হর্ষবর্দ্ধণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ও বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রতিপোষক নরপতি ছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনাদর ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষু উভয়ের প্রতি তুল্য সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু, কার্য্যতঃ একটু ইতর বিশেষ দেখা যাইত। প্রথম দিবস তিনি বুদ্ধের প্রতি-

(১) হুয়েনসাং বলেন—প্রায় ৫০,০০০০ সন্ন্যাসী ও দুঃখী তথায় সমবেত হইত।

(১) হুয়েনসাং বলেন—উক্ত উৎসব পঞ্চাশ দিনব্যাপী ছিল।

মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরণ করিতেন, এবং অভ্যাগতদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য প্রদান করিতেন দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণুর ও (২) তৃতীয়দিনে শিবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া তিনি প্রথম দিবসের বিতরিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ এই দিবসদ্বয়ে বিতরণ করিতেন। যাহাই হউক, তাঁহার উদার চরিত্র হইতে চন্দ্রকলঙ্কের ন্যায় ঐটুকু ছাড়িয়া দিতে হইবে; কারণ মানব-প্রকৃতির এই রীতি, যে যাহাকে ভালবাসে তাহার প্রতি একটু না একটু পক্ষপাতে স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে।

তদনন্তর সাধারণ দানকার্য্য আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধেরা কুড়ি দিন যাবৎ, হিন্দু দেবতা পূজকেরা দশদিন যাবৎ এবং পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা দশদিন যাবৎ সন্তোষ-ক্ষেত্রের দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশদিন পর্য্যন্ত দীন, দরিদ্র, নিরাশ্রয়, মাতৃপিতৃহীন ও পরিজন শূন্য ব্যক্তিদিগকে ধনদান করা হইত। শেষ দিন স্বয়ং দাতা মহারাজ শ্রীহর্ষশিলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণাভরণ, জ্যোতিষ্মান্ মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগ পুরঃসর চীরধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ ধারণ করতঃ স্বহস্তে সেই সকল আভরণ রাশীও দরিদ্রগণকে দান করিয়া স্বীয় মহৎ ও উদার চরিত্রকে দেবত্বে পরিণত করিতেন। এমন দান পৃথিবীর কয়জন করিয়াছেন? বুঝি এই কারণেই লোকে তৎকালে প্রয়াগকে দ্বিতীয় স্বর্গ বলিতেও কুণ্ঠিত হইত না! তৎপরে সেই মানব-রূপী দেবতা—সেই অপূর্ব্ব বদান্য ভিক্ষু সর্ব্বসমক্ষে কৃতাঞ্জলীপুটে গম্ভীর স্বরে বলিতেন, "আজ আমার রাজ্য রক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষ-ক্ষেত্রে সমুদয় দান করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। মনুষ্যবাঞ্ছিত পুণ্য সঞ্চয় মানসে আমি ভবিষ্যতেও এইরূপ করিবার আশায় আমার সমস্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিব।"

(২) হুয়েনসাং বলেন, "দ্বিতীয় দিনে সূর্য্যের মূর্ত্তি মন্দির মধ্যে স্থাপিত হইত।

এইরূপে পুণ্যভূমি সন্তোষ-ক্ষেত্রের গরীয়সী উৎসবের পরিসমাপ্তি হইত। দানবীর মহারাজ, রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত হস্তী, অশ্ব ও অস্ত্রাদি ব্যতীত প্রায় সমুদয়ই মুক্ত হস্তে দান করিতেন।

অধুনা ঐ প্রাচীন-গৌরব 'সন্তোষ-ক্ষেত্র' নাম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন ঐ স্থানটির সাধারণ নাম প্রয়াগ। শীতকালে নদীর জল অনেক দূর পর্য্যন্ত নামিয়া যায়, তাহাতে এক বিস্তীর্ণ চর বাহির হয়। আকবর কৃত দুর্গ ও বেণী ঘাটের সম্মুখে ইহার যে অংশ পড়ে তাহার উপরেই এক্ষণে কুম্ভমেলা, মাঘমেলা প্রভৃতি উৎসবাদি হইয়া থাকে।

শ্রীতারাপদ বন্দোপাধ্যায়।

ধ্রুবলালের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১২৯৫ সালের ১৮ই বৈশাখ অপরাহ্ণ ৫টা ৩৫ মিনিটের সময় ৺ধ্রুবলাল দত্ত বর্দ্ধমানে জন্ম হয়। একদিকে সেই সময়ে প্রবল ঝাড়্যা ও বৃষ্টি

হইয়া নিদারুণ গ্রীষ্মের দিনে ধরা স্নিগ্ধ ও সুশীতল করিতেছিল, অন্যদিকে ধ্রুবলালের পিতা সুবিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর সম্পাদক এবং বাঙ্গালার প্রধান প্রধান মাসিক পত্রিকা গুলির সাহিত্য, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লেখক, পরম হিন্দু শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত বর্ম্মা বিষম যন্ত্রণাদায়ক দন্তরোগে শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। ধ্রুবলাল মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; পরমানন্দের সংবাদ গোবিন্দ বাবু পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারিলেন না। কে বলিবে জগতে দুর্লভ রত্ন তাঁহার অদৃষ্টে দীর্ঘকাল যে ভোগ হইবে না, ইহাই তাহার সূচনা কি না। পবিত্র গর্ভে পবিত্র ধ্রুব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদীয় জননী, ধর্ম্মময়প্রাণা, নিয়ত পরহিতেরতা, পরম নিষ্ঠা-বতী; একমাত্র সন্তান হারাইয়া ভগবৎ চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন। আমরা ধ্রুবলালের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে সঙ্কলন করিলাম, তাহাতে পাঠকপাঠিকাগণ তাঁহার জীবনের প্রধান ভাব ধর্ম্মময়তা ও মহাপ্রেমিকতার পরিচয় পদে পদে পাইবেন। তাঁহার মায়া, তাঁহার মমতা, তাঁহার প্রেম সংসার ভরিয়া রাখিয়াছিল। তিনি যেমন অতুলনীয় রূপবান। তেমনি অতুলনীয় গুণবান ছিলেন। তাঁহার প্রতি কথায়, প্রতি কার্য্যে আত্মপর সকলের সহিত ব্যবহারে সরলতা, অমায়িকতা ও উদা-রতা ক্ষরিয়া পড়িত। কি দয়া, কি মমতা, কি স্নেহ লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইতে হয়। দীর্ঘজীবী [illegible] হইলে ধ্রুবলাল বঙ্গ-সমাজের একটী উজ্জ্বল রত্ন হইতেন; বঙ্গ সাহিত্যে উচ্চ স্থান পাইতেন। তাঁহার "নিদ্রা ভঙ্গে" কবি-তার মত প্রকৃত, প্রশান্ত, স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক কবিতা অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৩১৫ সালের আষাঢ়ের "জাহ্নবী" পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার "আনত-আননা" কবিতা পড়িলে এবং আমাদের "আলোচনা" পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে তাঁহার কবিতাসকল যে মুদ্রিত হইবে সে সব পড়িলে সকলেই তাঁহার কবিত্ব প্রতিভা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কিন্তু হায়! সে মহাশক্তি, সে প্রতিভা মুকুলিত না হইতেই খসিয়া পড়িল। তিনি ১২ বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন; সুন্দর গদ্যও লিখিতে পারিতেন; একখানি উপন্যাসও লিখিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু সবই অপূর্ণ রহিয়া গেল; ২০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইতে না হইতেই ধ্রুবের জীবলীলা সাঙ্গ হইল!

ধ্রুব তখন ৩।৪ বৎসরের বালক, শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার বিসর্জ্জনের দিন প্রতিমাকে ঠাকুরদালান হইতে উঠানে নামান হইয়াছে, বরণ করিয়া বিসর্জ্জন দেওয়া হইবে। পিতৃক্রোড়স্থ ধ্রুব পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা মা দুর্গাকে নামান হোলো কেন?" পিতা বলিলেন "মা দুর্গা এইবার শ্বশুরবাড়ী যাবেন যে।" অমনি ধ্রুবের চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "কেন বাবা, মা দুর্গাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবে, তা হবে না।" ধ্রুবের পিতা—"মা দুর্গা আবার শিগ্‌গির আসবেন" বলিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে থামাইলেন। আর

কোন বালক ত এরূপ কাঁদে না; পূজার কয়দিন তাহাদের যেরূপ আনন্দ, বিসর্জ্জনের দিনও তাহাদের সেইরূপ আনন্দ।

ধ্রুব আদর্শ পিতৃমাতৃ ভক্ত ছিলেন, জীবনে একদিনের জন্ম পিতামাতার অবাধ্য হন নাই। আজকালকার ছেলেদের মত পিতামাতার সহিত বচসা বা পিতামাতাকে অপমানসূচক কথা কখন বলেন নাই। বাল্যকাল হইতেই পিতার অপেক্ষা মাতাকে অধিক ভয় করিতেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার পিতৃমাতৃ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পিতা যখন আফিসে কাজ করিতেন,তখন ধ্রুব প্রত্যহ বৈকালে সদর দরজায় দাঁড়াইয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেন; তখন ধ্রুবের বয়স আট বৎসর। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে একদিন (৩০শে ফাল্গুন সন ১৩০০ সাল) কথায় কথায় পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা তোমার বাবা (আমার ঠাকুরদাদা) কোথায়?" পিতা—"তিনি স্বর্গে গেছেন।" ধ্রুব—"বাবা তোমাকে আমি ঠাকুরদাদার মত স্বর্গে যেতে দিব না" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর বলিল "ঠাকুরদাদা আর ফিরল না, তুমিও যদি না ফের।" পিতা—"আমি যাব না" ধ্রুব—যদি হাওয়ায় উড়িয়ে নেয়ায়" পিতা—"না, তা কি কখন পারে?" "মা আমার" নামে কৈশোরে (১০ই চৈত্র ১৩০৭ সালে ১৩শ বর্ষ বয়সে) লিখিত কবিতা একদিকে তাঁহার গভীর মাতৃভক্তির পরিচায়ক; অন্তদিকে এত অল্প বয়সে সন্তানের জন্ম জননীর অতুলনীয় স্নেহ, বর্ণনাতীত আত্মত্যাগ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষমতা বিস্ময়জনক। ধ্রুব আট বৎসর বয়সে (ফাল্গুন ১৩০২ সালে) শঙ্কটাপন্ন বাতশ্লেষ্ম জ্বর বিকারে আক্রান্ত হইয়া কতক জ্ঞানে ও কতক অজ্ঞানাবস্থায় মধ্যে মধ্যে বলিতেন "মা বুঝি কাঁদ্‌ছে।" ২৩শে ফাল্গুন বলিতেছিলেন "দেখুন না, বাবা, মা কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে! ধ্রুবের জননী বলিলেন "না বাবা কাঁদ্‌ব কেন? তোমার অসুখ ভাল হয়ে গেছে; তুমি ভাল আছ।" সেইদিন বৈকালে আবার বলিল "বাবা আপনি মাকে বোঝান, মা আবার কাঁদ্‌ছে।"

ধ্রুবের পিতৃমাতৃ ভক্তির শত শত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়; কিন্তু সংক্ষিপ্ত জীবনী তাহার স্থল নহে। তাঁহার অগাধ মাতৃভক্তি ও ত্যাগের আর একটী দৃষ্টান্ত এখানে দিলাম:—

৩রা কার্ত্তিক ১৩০৪ সালে (১০ম বর্ষে) ধ্রুবের পিতা এক টাকায় ৭টি আম কিনিয়া তাঁহার দ্বারা অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। নিজ পিতা ও পিতামহী বিয়োগের পর ধ্রুবের জননী উৎকৃষ্ট আম ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। আম কয়টী লইয়া গিয়া ধ্রুব বলিল "মা তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমাকে এই ভাল আম খেতে হবে।" ধ্রুবের জননী—অত দামের আম তোমরা খাও, তোমরা খেলেই আমার খাওয়া হোল।" ধ্রুব—"না তা হবে না তুমি আমার ভাগের আম থেকে একটী খেও, আমি একটা কম খাব।" তারপর রাত্রি ১২টার সময় নিদ্রাভঙ্গে ধ্রুব পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা মা কি আম খেয়েছে?"

ধ্রুবের ছয় বৎসর বয়স হইতে তাঁহার

পিতা তাঁহাকে ও তাঁহার খুড়তুতো ভাই মিহিরকে কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত রামায়ণ সরল ভাষায় বুঝাইয়া শুনাইতেন। তাহা হইতে ক্রমে ধ্রুব নিজে সমস্ত রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন। একদিন (২৫শে ভাদ্র ১৩০৩ সালে) ধ্রুব মহাভারত পাঠে নিবিষ্ট, নিকটে উপবিষ্ট পিতার নিকট তাঁহার এক প্রতিবাসী বন্ধু নিজ স্ত্রী বিয়োগের জন্য কত বিলাপ ও আক্ষেপ করিতেছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া ধ্রুব বলিলেন "দেখুন বাবা, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, সংসারে মানুষ এই রকম, যেমন রাত্রিতে একটা গাছে সব পাখি এসে বসে, সকালে কে কোথায় যায়, তার ঠিকানা থাকে না।" (২য়) মানুষ খেলানার পুতুলের মত; পুতুল লইয়া কত যত্ন করিয়া খানিক খেলা করিলাম, তারপর সেই পুতুল যেমন ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি খেলা ফুরাইয়া যায়।"

পাঠকপাঠিকা, নয় বৎসর বয়স্ক বালকের এরূপ তত্ত্বজ্ঞান কোথাও দেখিয়াছেন কি ?

নিকৃষ্ট জীবে ধ্রুবের দয়ার দুটি দৃষ্টান্ত বলিতেছি :—

২২শে পৌষ ১৩০২ সাল দাসীকে কই ও মাগুর মাছ কুটিতে দেখিয়া ধ্রুব পিতার নিকট গিয়া বলিলেন "বাবা আজ থেকে আমি মাছ খাব না। মাছ কোট্‌বার সময় তারা যে রকম ছটফট করে, তাদের যেরূপ রক্ত পড়ে, তাদের যে রকম যন্ত্রণা হয়, তা দেখে আমার বড় কষ্ট হ'য়েছে, আমি আর মাছ খাব না" মৎস্য খাওয়ার উপকারিতা তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনি মাছ খাইতেন বটে, কিন্তু প্রত্যহ বলিতেন "বাবা মাছের যে কষ্ট, মাছ খেতে আর ইচ্ছা হয় না।" সেই বৎসরে ৭ই চৈত্র পূর্ব্বলিখিত কঠিন পীড়িতাবস্থায় কই মাছ মারার শব্দ শুনিয়া আবার বলিয়াছিলেন 'মানুষের রক্তও যা, মাছের রক্তও তাই, তাহাত ইন্দুর বিড়ালের খাদ্য, কত প্রকার কীট পক্ষীদের খাদ্য, মৎস্যও মানবের খাদ্য এই যুক্তি দেখানতে তিনি বলিয়াছিলেন— "পশুপক্ষীরা পাপপুণ্য কি তা'ত জানে না, ওরা পরমেশ্বরকেই চেনে না, তিনি আছেন কি না তাই জানে না, বুঝ্‌তেও পারে না, তা ওরা খায় বলে, আমরা কি মেরে রক্ত বার করে খাব ?"

২য় ঘটনা। ৪ঠা ফাল্গুন ১৩০৪ সালে। সম্মুখের বাড়ীতে রাজমিস্ত্রীরা একটা পেচক ধরিয়া তাহার পা বাঁধিয়া ছাদের উপর একবার চীল ও কাকদের দিকে উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতেছে, একবার টানিয়া ছাদে ফেলিতেছিল। ধ্রুব তাহাদিগকে কাতরস্বরে বলিল "কেন তোমরা ওকে কষ্ট দিচ্ছ, ও রকম কল্লে এখনি মরে যাবে, তোমরা ওকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাদের পয়সা দিব।" নিষ্ঠুরগণ তাহার কথা না শুনাতে ধ্রুব আসিয়া পিতার কাছে নালিস করিল ও বলিল, "আপনি শিগ্‌গির যান, তাদের কাছে আপনি শিগ্‌গির যান, বোধ হয়, এতক্ষণে সেটা মরে গেল।" এই বলিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ধ্রুবলাল সর্ব্বজন মান্য, বিশ্রুতনামা অক্রূর দত্তের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২ই

পৌষ ১৩০১ সালে জেঠতুতো ও খুড়তুতো ভায়েদের সহিত আলিপুরের চিড়িয়া খানা দেখিয়া ফিরিবার সময় বলিয়াছিলেন "কোথা থেকে এক কমিশনার সাহেবকে জোটালে, সাহেব আমাদের সব বাড়ী ভাগ করে দিলে, নদাদারা বাড়ী থেকে উঠে গেল—সাহেব ত ভাগ করে দিলে, আলাদা করে দিলে; কিন্তু যখন বিবাদ হবে, তখন ত সকলকে এক সঙ্গে হতে হবে। বেশ আমরা এক সঙ্গে এক বাড়ীতে ছিলুম, বেশ ছিলুম।"

সপ্তম বর্ষীয় বালকের মুখে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার মহিমা শুনুন!

৮ম বর্ষীয় বালক ১৩০২ সালে ফাল্গুন ও চৈত্রমাসে বাতশ্লেষ্ম জ্বরবিকারের সময় যতবার গৃহ দেবতার বা অন্য কোন স্থানের দেবতার চরণামৃত পান করিয়াছেন, ততবার করযোড়ে প্রণাম করিয়াছেন, একদিন দাস্তের সময় কে চরণামৃত লইয়া গিয়াছিলেন, নিষ্ঠাবান্ বালক বলিল, "হাগা হলে খাব, এখন খাব না। উক্ত পীড়ার সময় একদিন গুরুপুত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি আহ্নিক কর ত?"

আমরা ধ্রুবলালের চরিত্রের বিশেষত্ব, তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতার কথা যে বলিয়াছি—তাহার সূচনা ধ্রুবের ৯ম বর্ষ বয়সে; পাঠক পাঠিকা ঘটনাটি দেখুন:—

৮ই ফাল্গুন ১৩০৩ সালে ধ্রুব তাহার পিতাকে ও জননীকে বলিল "আজ সকালে তখন বোধ হয়, ৭টা, আমি স্বপনও দেখিনি, কিন্তু ঘুমিয়ে ছিলুম, যেন আমি হরিনাম কর্‌ছি আর প্রণাম কর্‌ছি। কিন্তু সে স্বপ্ন নয়, আমার বেশ মনে পড়েছে, তখন ঘুম ভাঙ্গেনি, তদবধি ধ্রুবলাল প্রত্যহ হরিণাম জপ করিত, হরিনাম জপ না করিয়া আহার করিতেন না। মাসাধিক এইরূপ করিবার পর একদিন জ্ঞাতি জেঠার বাড়ী ভুল ক্রমে লোজেঞ্জেস খাইয়াছিলেন। অত অল্প বয়সে এমনই প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব; বাড়ীতে ফিরিয়া মাতাকে বলিলেন, আজ তুমি আমার হইয়া মালা জপ করিও।" ধর্ম্মকার্য্যে প্রগাঢ় অনুরাগ, ধর্ম্মে বিস্ময়জনক নিষ্ঠা, বাহ্যান্তর শুচি, নির্ম্মল চিত্ত ও চরিত্রের বহু বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে পারা যায়, কিন্তু স্থানাভাব। হরিনাম জপ কয় বৎসর করিবার পর সপরিবারে ১৩০৬ সালের শেষে বক্সার ও কাশীধাম যাওয়া হইয়াছিল। তথা হইতে ফিরিয়া ধ্রুব পিতৃপিসী মহী (পিতার পিসিমাতার) নিকট শিবপূজা করিতে শিখিলেন। নিত্য নানা উপকরণ দিয়া বাণ-লিঙ্গের পূজা করিতেন। মনে পড়ে একদিন শিবপূজার উপকরণাদির অঙ্গহানি হওয়াতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে যেন স্বর্গের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। পূজার সময় তাঁহার সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ শুনিলে নাস্তিকেরও চিত্ত ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হইয়া যাইত, দূর হইতে বোধ হইত যেন সামাধ্যায়ী সামবেদ গান করিতেছেন, পৈত্রিক শ্রীশ্রীদুর্গা পূজায় তাঁর প্রতিমা গড়িয়া কোজাগর লক্ষ্মীপূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা যাবজ্জীবন করিবার প্রবর্ত্তক তিনি।

বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ায় ধ্রুবলালের

প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সুন্দর আবৃত্তি শক্তি (ইংরাজীতে যাহাকে elocution বলে) বাল্যকাল হইতেই জন্মিয়াছিল। সাবিত্রী লাইব্রেরীর ১৩শ বার্ষিক অধিবেশনে আট বৎসর বয়সে প্রাঞ্জল সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। সাবিত্রী লাইব্রেরীর স্বদর্শসাধন সমিতিতে "স্বদেশী" অধিবেশনে তিনি দুই হাজার শ্রোতার সম্মুখে নিজ রচিত"নিদ্রাভঙ্গে"কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। কয়জন ১৬।১৭ বৎসরের তরুণ যুবকের এরূপ সৎসাহস হয়? দশের নিকট সম্মান ও আদরের আকাঙ্ক্ষা তাহার বরাবর ছিল। ১৩।১৪ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ের সমপাঠীদের লইয়া "শিক্ষোন্নতি" নামে সমিতি করিয়া তাহাতে প্রবন্ধ পাঠ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রবীনের মত এক একটী চিন্তা থাকিত; নিজে সমিতির সম্পাদক ছিলেন; কোন কোনবার সভাপতিও হইয়াছিলেন। প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি, তিনি কবির প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থের Stepping Westwordএর অনুকরণে তাঁহার কবিতাটী অতি সুন্দর হইয়াছিল।

সঙ্গীত বিদ্যায়ও তাঁহার প্রতিভা বিস্ময়জনক। একদিনও ওস্তাদ রাখিয়া গান শিক্ষা করেন নাই। স্বরলিপি দেখিয়া আপনি হারমোনিয়াম বাজাইতে শিখিয়া ছিলেন; তারপর প্রায় সকল গৎ বাজাইতে পারিতেন। বাঁশী সুন্দররূপে বাজাইতেও পারিতেন। একদিন সমপাঠী গায়ক বন্ধুকে হারমোনিয়াম সংযোগে দুইবার গান বাজাইতে দেখিয়া নিজে ক্রমে ক্রমে সকল গান বাজাইতে পারিতেন। নিজে গাহিয়া ও বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন।

ব্যবসা বুদ্ধি তাঁহার বিলক্ষণ ছিল। ব্যবসায় দুটি প্রধান অবলম্বন সাহস ও পরিণামদর্শিতা তাঁহার প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার স্বদেশানুরাগ, স্বদেশপ্রীতি দেখিয়া পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয় পরিজন গর্ব্ব অনুভব করিতেন, আনন্দে বিহ্বল হইতেন। খুড়তুতো ভাই মিহির লালের সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ হইত, দুই ভাই মিলিয়া স্বদেশের উন্নতি করিবেন, স্বদেশী দ্রব্যনিচয়ের ব্যবসা করিবেন। পৈত্রিক ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখিবার, অন্নসত্র, দানসত্র প্রভৃতি খুলিবার বড় আকঙ্খা, বড় সাধ ছিল। ভাইকে বলিতেন, বসত বাড়ীর সম্মুখে বাগান ও বৈদ্যুতিক আলোকে সুসজ্জিত করিয়া ইন্দ্রপুরী তুল্য শোভা সম্পাদন করিবেন।

ধ্রুব বিবাহের পর তিন বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন; কিন্তু সেই অল্পকালের মধ্যে পত্নীকে বিদ্যা ও জ্ঞানে বিভূষিতা করিতে, ধর্ম্মৈকবলা, পরম নিষ্ঠাবতী ও সংসার কার্য্যে ঐকান্তিক অনুরক্তা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পত্নীকে লইয়া যেভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, সে কয়টী কবিতা (পত্নীকে উপহার প্রভৃতি) বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, বড়ই হৃদয় ভেদী!

ধ্রুবলাল অত্যন্ত বন্ধুপ্রিয় ছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে কয়টী প্রকৃত বন্ধুও মিলিয়াছিল। এতদূর সুরসিক ছিলেন, যে তাঁহার কথায় সকলে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত।

তিনি রূপেগুণে অতুলনীয় ছিলেন। অব

তিনি সুন্দর সাজাইতে, নিজে সুন্দর সাজিতে অশনে, বসনে, উপবেশনে সকল বিষয়ে সুন্দর ছিলেন; তাঁহার মত সৌন্দর্য্যের উপাসক অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি কবি ছিলেন, গায়ক ছিলেন, সকল বিষয়ে সুন্দর ছিলেন, অথচ এমন পবিত্র নির্ম্মল স্বভাব সংসারে কয়টী মিলিবে? জমীদার পিতার একমাত্র বংশধর (চলিত ভাষায় যাহাকে আদুরে ছেলে বলে) হইয়াও তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার ধর্ম্ম সকলের আদর্শ ছিল। তাঁহার অমায়িকতা, তাঁহার সরলতা, তাঁহার মিষ্ট-ভাষিতা, তাঁহার শিষ্টাচারিতা সমস্ত আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব কুটুম্বদিগকে মন্ত্রবৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহার বিয়োগে বিশেষ পরিতপ্ত হন নাই, এমন কেহ পরিচিত নাই। ধ্রুবলালের বিয়োগে সংসার হইতে একটী অমূল্য রত্ন অপহৃত হইয়াছে।

ইহলোক ত্যাগ করিয়াও মমতার পারাবার ধ্রুবলাল পিতামাতার সহিত এই পাঁচ বৎসর নানা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন. "মৃত্যু কোথায়" নামক পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ হইতেছে। সব হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে—মানব ইহলোক ত্যাগ করিবার সময় ইন্দ্রিয়গুলি, মন, বুদ্ধি ও সংস্কার লইয়া যায়, তাহার পরিচয় যথেষ্ট সে পুস্তকে পাওয়া যাইবে। একটীর উল্লেখ এখানে করি "নিশি শেষে" নামক একটী অসম্পূর্ণ কবিতার অর্দ্ধাংশ ধ্রুবলাল প্ল্যানচেট সহযোগে লিখিয়া দিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ আর দীর্ঘ করিতে পারি না। ধ্রুবলালের রচিত একখানি পরমার্থ-বিষয়ক সঙ্গীত পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিয়া অমৃতময় কথার উপসংহার করিলাম:—

প্রসাদীসুর—একতালা।

আর ত ভয় করি না কারে
ওরে মা দিয়েছেন, অভয় মোরে॥

প্রাণ ভ'রে ডাক্‌লে যারে,
মা ত কভু থাক্‌তে নারে।
সে যে দয়াময়ী জগন্মাতা,
পাষাণী কে বলে তারে॥

ভেসে ভেসে নয়ন ধারে,
ডাক্‌তে যদি পারিস্ যারে।
তবে বুকের ব্যথা ঘুচে যাবে,
রাখ যে পায়ে মা তোমারে॥

কালী নাম যে একবার করে,
সব পাপ তাপ পলায় দূরে।
তবে তুই কেন মন মরিস্ ভেবে,
দিনে রেতে ডাক্‌না যারে॥

নামের গুণে পাপী কত,
তরে গেল নাই ঠিকানা ত।
হোস্ না কেন যেমন পাপী,
ধ্রুবলাল তুই যাবি তরে॥

ধ্রুবলালের সংক্ষিপ্ত জীবনী বহু বিস্তৃত হইলেও এই স্থানে আমরা তাহার পরিসমাপ্তি করিয়া দিলাম।

(সম্পাদক)

পুষ্পাবতী।

—+—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—+—

হুকুমচাঁদ।

জোতারাম ও হুকুমচাঁদ দুই ভ্রাতা। জোতারাম কুটবুদ্ধি বিশিষ্ট, হুকুমচাঁদ তদ্রূপ নহে। জোতারাম প্রকাশ্যে পরম শত্রুর সঙ্গেও মিষ্টালাপ করিবে এবং গোপনে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে; হুকুমচাঁদ প্রকাশ্যভাবে শত্রুর সঙ্গে শত্রু ব্যবহার করিবে, প্রকাশ্যভাবে তাহাকে আক্রমণ করিবে, এবং যেরূপে হউক তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু হুকুমচাঁদের একটি গুণ ছিল—তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ভয় ও ভক্তি করিতেন, এবং তাঁহার আদেশ ন্যায় অন্যায় না বিবেচনা করিয়া পালন করিতেন। জোতারাম কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হস্তের পুত্তলিকা করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন তিনি কোন উচ্চ পদে থাকিতেন না, তখন হুকুমচাঁদকে বা তাঁহার জামাতাকে সেই পদে নিযুক্ত করাইয়া তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেন, হুকুমচাঁদ প্রথমতঃ অন্তঃপুরের সরবরাহকার নিযুক্ত হইলেন; জোতারামের চক্রান্তে ও রূপার অনুরোধে হুকুমচাঁদ এই বিশিষ্ট পদ পাইলেন। ইহার পর বেহারী লাল যখন অবসর লইলেন, তখন আর জোতারামের আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি হুকুমচাঁদকে দেওয়ান নিযুক্ত করাইলেন। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে সার চার্ল্স্ মেটকাফের অনুগ্রহে হুকুমচাঁদের জামাতা দেওয়ান হইলেন, হুকুমচাঁদ সকলকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রকাশ্যভাবে অবসর লইলেন। যখন বড় বড় শাসনকর্ত্তারা ও ঠাকুরগণ জোতারাম ও মহারাণীর পক্ষ ত্যাগ করিল, তখন হুকুমচাঁদ তাঁহাদের দুর্গ অবরোধ করিতে রওনা হইলেন। হুকুমচাঁদ বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি প্রকাশ্যভাবে উহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে ইতস্তত করিলেন না। প্রথম রোড় দুর্গ যখন তিনি অবরোধ করিলেন, তখন যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। যদি হুকুমচাঁদ তাঁহার ভ্রাতার কুট বুদ্ধিতে পরিচালিত না হইতেন, তবে ইতিহাসে বোধ হয় তিনি একজন প্রসিদ্ধ লোক বলিয়া গণ্য হইতেন; তাঁহার ভ্রাতার দোষের আবরণে তাঁহার গুণাবলী আবৃত হইয়াছিল। জোতারামের উপযুক্ত সহকারী রূপা, রূপার বুদ্ধির নিকটেও হুকুম চাঁদ দাঁড়াইতে পারিতেন না। তিনি রূপাকে ভয় করিতেন, এবং রূপা যাহা বলিত—তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করিতেন। হুকুমচাঁদ রাজ বাটীতেই অধিকাংশ সময় কাটাইতেন, কিন্তু তাঁহার পৃথক বাটী ছিল, রজনীতে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ হইলে তিনি তথায় আশ্রয় লইতেন। তথায় তাঁহার স্ত্রীও একটী দশমবর্ষীয়া কন্যা রেণুকা ছিল, তিনি তথায় গিয়া শান্তি পাইতেন। রেণুকা বেশ সুন্দরী ও সরলা ছিল, সে পিতামাতার বড় আদরের সন্তান।

হুকুমচাঁদ রাজবাটীর কার্য্য শেষ করিয়া বাড়ী আসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী আহারের উদ্যোগে গিয়াছে, এমন সময়ে রেণুকা দৌড়াইয়া আসিয়া পিতার শয্যায় বসিল এবং বলিল "বাবা, মা কাল পরেশনাথের মন্দিরে যাবেন, আমি সঙ্গে যাবো।" হুকুমচাঁদ তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া বলিলেন "তা যেও, এতে আর আপত্তি কি? তোমার মায়ের এসময় যাওয়ার কি প্রয়োজন হ'ল!" রেণুকা উত্তর করিল, "তা আমি জানি না, তবে শুনেছি দিদির জন্য পূজো দিবেন। বাবা! দিদি কবে আস্‌বে? রেণুকা তাহার দিদিকে ভালবাসিত, তাই তাহার এত আগ্রহ।" হুকুমচাঁদ বলিলেন—"মা! তুইও দিদির মত শ্বশুরবাড়ী গিয়া থাক্‌বি। তোর দিদি শীঘ্র আসবে।" রেণুকা বড় সন্তুষ্ট হইল। সে দৌড়াইয়া মাতাকে এই সংবাদ দিতে গেল। রেণুকার মাতা শুনিল, তাহার স্বামী ডাকিতে-ছেন। অতএব তাড়াতাড়ি আসিল। রেণুকার মাতা খুব লম্বা বা খর্ব্বাকৃতি নয়, তাহার শরীরের রং মধ্যম রকম। কোন এক সময়ে বেশ ছিল, বুঝা যায়, কিন্তু আজকাল আর নাই, মস্তকে টাক পড়িয়াছে। নাসিকায় প্রকাণ্ড একটি নথ, তাহাতে মূল্যবান মুক্তা ও প্রস্তর দেওয়া, দুই কর্ণে দুটি বড় বড় স্বর্ণের ঝুম্‌কা, মধ্যে মধ্যে হীরক খোভা করিতেছে। হস্তে বলয় কোমরে একটি স্বর্ণের ভারি গোট। পরিধানে একখানি নীলবর্ণের শাটী, বক্ষঃস্থলে রেশমের কাঁচুলী। হুকুমচাঁদ-গৃহিণী এই ভাবে আসিয়া দেখা দিলে হুকুমচাঁদ বলিলেন—"কি খবর? এত সাজ সজ্জা কেন?" তাঁহার স্ত্রী বলিল "সাজ সজ্জা আবার কি? তোমার জন্য কি কাপড়ও পর্‌বো না? কত লোকে কত কাপড় পরে, আমি কি পরি?" হুকুমচাঁদ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"তুমি পর্‌বে না তবে কে পর্‌বে। তুমি সাজসজ্জা কর্‌লেই আমার চক্ষু জুড়ায়। গৃহিণী নথ নাড়িয়া বলিল—"আর ঠাট্টায় দরকার নাই। এখন কিসের জন্য ডেকেছ তাই বল।" হুকুম চাঁদ বলিলেন—"আমি ত ডাকি নাই।" মাতা তখন কন্যার দিকে দৃষ্টি করিলে রেণুকা বলিল—"বাবা বল্‌ছিলেন, দিদি শীঘ্র আসবে, সেইজন্যে তোমাকে ডেকে এনেছি।" "দুষ্ট মেয়ে! দিদি আস্‌বে বলে ডেকে এনেছিস্‌।" এই কথা বলিয়াই গৃহিণী চলিয়া গেল, হুকুমচাঁদ কন্যাকে ডাকিয়া নিজ পার্শ্বে বসাইলেন ও বলিলেন—"রেণুকা! তুই কেমন বর নিবি বল্‌ত?" রেণুকা লজ্জায় কোন কথা বলিল না. পিতা কন্যাকে চুম্বন করিলেন। তাঁহার তখন বোধ হইল যে রাজভোগ অপেক্ষা এইরূপ দিন যাপন করায় অধিক শান্তি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অশ্বারোহী।

১৮০২ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে বেলা অবসান সময়ে একজন অশ্বারোহী কাঁতলি নদীর ধার দিয়া বেগে যাইতেছিলেন। অশ্বা-রোহী বহুদূর হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দেখিয়াই তাহা বোধ হইতেছে,

অশ্বারোহীর পরিচ্ছদ মূল্যবান বটে, কিন্তু ঘর্ম্মে আর্দ্র হওয়াতে তেমন চাকচিক্যশালী আর নাই। সঙ্গে মাত্র একখানি তরবারি, বোধ হয় পথিমধ্যে অশ্বারোহী কোনরূপ প্রতি-বন্ধকের আশঙ্কা করেন নাই। অশ্বারোহী যাইতে যাইতে একটি সরু রাস্তায় উপস্থিত হইলেন, তাহার এক পার্শ্বে নদী, অপর পার্শ্বে একটী উচ্চ পাহাড়। পাহাড়ের নিম্নেই বড় বড় পাপদ—অতএব স্থানটি দিনের বেলায় অন্ধকার। এই স্থানে আসিয়াই অশ্বের গতি হ্রাস করিতে বাধ্য হইলেন, তখন ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। কতকদূর অগ্রসর হইলেই সম্মুখে ও পশ্চাতে অশ্বের পদশব্দ শুনিতে পাই-লেন। তিনি বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে পশ্চাতে ও সম্মুখে কতকগুলি অশ্বারোহী তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তিনি জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"তোমরা কি চাও?" তাহারা কেহই উত্তর করিল না, কিন্তু এক বাক্যে সকলেই অসি বাহির করিল। তখন অশ্বারোহী বুঝিলেন, ইহাদের উদ্দেশ্য ভাল নয়, তবে সাহস এ ক্ষেত্রে বড় দরকার, তাই উচ্চৈস্বরে বলিলেন—তোমরা জাননা কাহার সঙ্গে এ ব্যবহার কচ্চ? এখনও সময় আছে, এখনও পালাও, নইলে আমি সকলকে ধরে রাজদ্বারে দণ্ড দিব। তাহারা সকলে "হো হো" করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল এবং একত্রে সকলে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অশ্বারোহী নিরুপায় হইয়া বলিলেন—"সকলে মিলে একজনকে আক্রমণ বীর ধর্ম্ম নহে, অতএব আমার সম্মুখে একজন অগ্রসর হও।" তাঁহার কথা কেহ শুনিল না, চারিদিক হইতে তাঁহাকে বেগে আক্রমণ করিল। এতগুলি অস্ত্রধারী পুরুষের হস্তে আত্মরক্ষা বড় কঠিন, অতএব তিনি অসি নিষ্কা-সন করিয়া দাঁড়াইলেন। এরূপ ভাবে যুদ্ধ অনেকক্ষণ চলিল না। অশ্বারোহী সহজেই বন্দী হইলেন। তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বস্ত্র দ্বারা বাঁধিল, এবং তাঁহার অশ্বের বল্গা ধরিয়া একজন টানিয়া লইয়া চলিল।

ক্রমেই রাস্তা সরু হইতে লাগিল। দুই দিকে নিবিড় বন, এখানে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ হইবার উপায় নাই। অশ্বারোহী চেষ্টা করিলেন, ইহাদিগকে চিনিতে পারেন কিনা, কিন্তু এই অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পারিলেন না। এক ব্যক্তি দলপতি বলিয়া বোধ হইল, সে ব্যক্তির মুখোস পরা। ক্রমে তাহারা দক্ষিণ দিকের এক রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, অশ্বারোহী বুঝিলেন—ইহারা সাধারণের গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করিল। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহারা দাঁড়াইল, দলপতি কি ইঙ্গিত করিল, তাহারা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বারোহী পথিককে অশ্ব হইতে নামাইল এবং একটী বৃহৎ বৃক্ষের সহিত বাঁধিল। অশ্বারোহী বলিলেন—"তোমাদের পরিণাম ভাল নয়, তোমরা সকলে দস্যু বলিয়া ফাঁসীকাঠে ঝুলবে। এখনও সময় আছে, সাবধান হও।" তাঁহার কথা কেহই গ্রাহ্য করিল না, সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যস্ত হইল। এক ব্যক্তি অতি শক্ত একগাছি দড়ি বাহির করিল, অপর ব্যক্তি বড় বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ঐ দড়ি দ্বারা ফাঁসি প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষেই থাকিল। অন্যান্য সকলে বৃক্ষ ঘিরিয়া দাঁড়াইল,

এবং দলপতি একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইলে দলপতি কি ইঙ্গিত করিলেন, তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি আসিয়া অশ্বারোহীর হস্তের বন্ধন ব্যতিত আর সব খুলিয়া দিল এবং আর এক ব্যক্তি আসিয়া ঐ দঁড়ি তাঁহার গলদেশে জড়াইল। পথিক বুঝিলেন আর জীবনের আশা নাই, তিনি সজল নয়নে একবার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিলেন, ও একবার বাটীর কথা মনে করিলেন। ইহাদের সঙ্গে আর তর্ক করা বৃথা—তাহা বুঝিলেন, তথাপি শেষ চেষ্টা করা উচিত—তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "আমি একজন নিরপরাধী পথিক, আমি তোমাদের কোন অপকরি করি নাই, তোমরা দস্যু—অর্থের লোভে নরহত্যা কর্‌তে কুণ্ঠিত হওনা, কিন্তু আমার সঙ্গে কোন অর্থ নাই। তবে যৎ সামান্য আছে—তাহা অনায়াসে লইতে পার। অতএব কেন অনর্থক একটি জীবহত্যা কচ্চ?" তাহারা কেহই কিছু উত্তর করিল না। তাহাদের স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিল। পথিক আর কোন উপায় না দেখিয়া সেই নিরুপায়ের উপায় সর্ব্বনিয়ন্তা দয়ালু—ঈশ্বরকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন। আরও অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইলে দলপতি আবার ইঙ্গিত করিলেন, তখন উপর হইতে দড়ি ধরিয়া টানিতে প্রস্তুত হইল। আর এক মুহূর্ত্তমধ্যেই পথিকের জীবলীলা শেষ হইবে, এমন সময়ে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন "তিষ্ঠ।" সকলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, বৃক্ষের উপরস্থ লোক আর দড়ি ধরিয়া টানিল না। দলপতি অগ্রসর হইয়া আগন্তুকের নিকট আসিলেন. অস্পষ্টালোকে দেখিতে পাইলেন, এক জটাজুটধারী গৈরিকবসন পরিধায়ী সন্ন্যাসী সদর্পে দণ্ডায়মান। দলপতি সক্রোধে বলিলেন—"তুমি কে আমাদের কার্য্যে প্রতিবন্ধক হচ্চ?" সন্ন্যাসী বলিলেন—"ধীরাজ! সাবধান হও,সর্ব্বত্র প্রগল্‌ভতা শোভা পায় না, এই যুবককে শীঘ্র ছেড়ে দাও, নইলে তোমাদের ভয়ানক অমঙ্গল।" এই কথা শুনিয়াই ধীরাজের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, তিনি সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"ঠাকুর! আমি অন্ধকারে চিন্‌তে পারি নাই, অপরাধ ক্ষমা করবেন। আমাকে এ নাম ধরে ডাকে আপনি ব্যতীত আর কেহ নাই। যাহ'ক, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।" তিনি দাঁড়াইয়া আবার ইঙ্গিত করিলে, তৎক্ষণাৎ দঁড়ি খুলিয়া লওয়া হইল, পথিককে ধীরাজ বলিলেন "আপনি কিছু মনে করবেন না, বিশেষকারণ না থাক্‌লে আপনাকে কষ্ট দিতেম না। আমরা আপনাকে খুব চিনি, আমাদিগকে আপনি চিনেন না। যাহ'ক, এই ঠাকুরের কৃপায় আজ প্রাণদান পেলেন। এক্ষণে অশ্ব লইয়া গন্তব্যপথে প্রস্থান করুন। আর কখনও এরূপভাবে একাকী এ রাস্তায় যাবেন না, বিপদ হ'তে পারে। আপনাদের অনেক শত্রু।" এই বলিয়া তাহাকে অশ্বের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। অশ্বারোহী বলিলেন—"ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।" এই বলিয়াই অশ্বে আরোহণ করিয়া চলিলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ ধীরাজ আর কিছু বলিলেন না, তারপর সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু দেখিলেন সন্ন্যাসী আর সে স্থানে নাই। তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করি-

লেন, কেহই সন্ন্যাসীকে যাইতে দেখে নাই। তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "ঠাকুর কি দেবতা? ইহার পর সঙ্গীদিগকে বলিলেন— "এক্ষণে চল, আমাদের মনীবের নিকট গিয়া সব বলি, আমাদের কোন অপরাধ নাই, তিনি যাহা করেন তাই হবে। তবে আমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই, ঠাকুর আমাদিগকে রক্ষা করবেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করেছি, তিনিই এসব জানেন।" তখন সকলে অশ্বে আরোহণ করিয়া গন্তব্য পথে চলিল এবং শীঘ্রই অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি-এ।

সংবাদ ও সমালোচনা।

শ্রমজীবী সমবায় লিমিটেড। ইহা একটী স্বদেশী পণ্য ভাণ্ডার, কয়েকজন কৃতবিদ্য সাহিত্য সেবীর উদ্যোগে এই কারবার আজ কয়েক বৎসর ৯০।২ নং হ্যারিসন রোডে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি,এ, একজন বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধীধারী, অমায়িক প্রকৃতির যুবক, ইহারই অমায়িকতা গুণে "সমবায়" এরূপ শীঘ্র উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছে, ইহাদের নিকট হইতে আমাদের জনৈক বন্ধু শীতবস্ত্র ক্রয় করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহা বাজার অপেক্ষা সুলভ, জিনিস ও মূল্যের তুলায় উৎকৃষ্ট। ইহাদের নিকট যে প্রতারণা নাই; তাহা আমরা অনেকবার পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছি। এই জন্য সাধারণকে আমরা একবার ইহাদের নিকট পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট। হাওড়ায় ইতিপূর্ব্বে বহু ম্যাজিষ্ট্রের শুভাগমন হইয়াছে সত্য কিন্তু সম্প্রতি মিঃ সি, এ, হ্যাডৌ আই, সি, এস মহোদয় হাওড়ায় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া যেরূপ দক্ষতার পরিচয় দিতেছেন, তদ্রূপ আমরা আর কাহাকেও দেখি নাই। ইনি প্রজাবর্গের অনুকূলে তাহাদের মতামত লইয়া কার্য্য করিয়া সকলের নিকট যশোভাজন হইয়াছেন। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন।

পারিতোষিক বিতরণ।—ব্যাঁটরা করোনেশন বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে হাওড়ার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় সস্ত্রীক আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উন্নতি দেখিয়া সুখী হইয়াছি।

নশীপুরাধিপতি

মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত রণজিৎসিংহ বাহাদুর।

আলোচনা, ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩১৯।

দময়ন্তী।

—:+:—

(১)

বঙ্গদেশে সীতা-সাবিত্রীর পরই পুণ্যশীলা দময়ন্তীর পবিত্র আসন। দময়ন্তীর প্রণয়, পরিণয়, বিপদ ও বিড়ম্বনা এবং স্বামী বিচ্ছেদ ও পুনর্ম্মিলনের অপরূপ ঘটনার সরস-মধুর অপূর্ব্ব কাহিনী বলিয়া এমনও বঙ্গীয় নর-নারী হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে অশ্রু বিসর্জ্জন করে। বস্তুতঃ ভগবানে নির্ভর, ধর্ম্মানুরাগ ও পাতিব্রত্যের পবিত্রতা সম্বন্ধে দময়ন্তী, সীতা ও সাবিত্রীর এক প্রান্তে প্রিয় সখীর পবিত্র আসন পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্যা।

দময়ন্তী বিদর্ভ-রাজ মহামতি ভীমের প্রাণাধিকা দুহিতা এবং নৈষধ-রাজ ধর্ম্মাত্মা বীর সেনের প্রাণপ্রতিম পুত্র পুণ্যশ্লোক নল রাজার হৃদয়-রাজ্য বিহারিণী পতিব্রতা বণিতা। পৃথিবীতে চরিত্র-মাহাত্ম্যে বিক্রমকেশরী নল যেমন উচ্চ গ্রামে আরোহণ করিয়াছিলেন, নল হৃদয়-রঞ্জিনী অপূর্ব্ব রূপশালিনী দময়ন্তীও সর্ব্বাংশে তাঁহারই অনুরূপ মহিষী ছিলেন।

দময়ন্তী রূপসী, যুবতী ও বিদুষী; কিন্তু এখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। এ অবস্থায় একদা দৈবযোগে অতুল বিক্রমশালী নলের বীর-ধর্ম্মের মধুর কাহিনী ও তাঁহার অপূর্ব্ব ধর্ম্মানুরাগ বার্ত্তা শ্রবণ এবং তাঁহার কন্দর্প বিনিন্দিত দেবদুর্ল্লভ মূর্ত্তির রসায়ন চিত্র দর্শন করিয়া, নবীনা দময়ন্তী আত্ম-বিস্মৃতা হইয়া, তাঁহারই রাতুল চরণোদ্দেশে দেব-পদে পবিত্র নির্ম্মাল্য অর্পনের ন্যায়, মুহূর্ত্তে আপনার কুসুম-কোমল প্রাণটী উৎসর্গ করিয়া দিলেন। পিতা মাতার অজ্ঞাতে—আত্মীয় স্বজন ও সখীগণের অলক্ষ্যে—দময়ন্তীর মানস বিবাহ হইয়া গেল।

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর কাহিনী একদিকে যেমন বৈচিত্র্যময়, অপর দিকে তেমনি যারপর নাই শিক্ষাপ্রদ ও কৌতুকাবহ বিচিত্র ঘটনা। প্রাণাধিকা দুহিতার পরিণয় যোগ্য বয়স উপস্থিত দেখিয়া, অপত্য বৎসল ভীমরাজ যথাসময়ে স্বয়ম্বর সভার অনুষ্ঠান করিলেন। চতুর্দ্দিকের রাজা ও রাজকুমারগণের নিকট, রাজকুমারীর স্বয়ম্বর সভার সাদর আহ্বান সূচক নিমন্ত্রণ-পত্রবহ দূত সকল প্রেরিত হইল। দুষ্যন্তকু,

মঙ্গল ঘট ও বিচিত্র পতাকা প্রভৃতি বিবিধ মাঙ্গলিক চিহ্ন ও রাজ বৈভবানুরূপ নানাবিধ চারু চিত্র ও মনোহর সাজ-সজ্জায় ভীমরাজ-ভবন অপরূপ শোভায় শোভিত হইয়া দর্শক-বৃন্দের নয়ন-মন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। সভা-গৃহের মণিময় স্তম্ভ ও সুবর্ণ-মাণিক্যের অপূর্ব্ব সাজ-সজ্জায় ভূতলে অমরাবতীর শোভার সৃষ্টি হইল। ক্রমে নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ ভীম-রাজ ভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। সমাগত রাজা ও রাজকুমারগণের সমভিব্যাহারি লোকজন ও হয়-হস্তীর পদভরে রাজপুরী টল-মল করিতে লাগিল। বিরাট উৎসবের উল্লাস-কোলাহলে বিদর্ভ নগর পরিপূর্ণ হইল।

সে উৎসবে ইন্দ্রাদি স্বর্গের দেবতাগণও স্বর্গধাম ছাড়িয়া মর্ত্তে আগমন করিলেন। * নল-দময়ন্তীর ধর্ম্ম ও চরিত্র বল পরীক্ষার্থ দেবতারা, তাঁহাদের এক জনের গলে বরমালা প্রদান করিবার ছলনায় মুগ্ধ করিবার প্রয়াসে মহারাজ নলকে ছদ্মবেশে দূত রূপে রাজকুমারী দময়ন্তীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সত্য-ধর্ম্ম-রত নল আত্ম গোপন পূর্ব্বক—অক্ষরে অক্ষরে দেব-কার্য্য প্রতিপালন করিলেন। দময়ন্তী তাঁহাকে দেব-দূত বলিয়াই মনে করিলেন। তিনি যে ছদ্ম বেশধারী নল তাহা দময়ন্তী এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করিতে পারিলেন না। নল, দেবগলে বরমালা অর্পণের জন্য দময়ন্তীকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু নল-প্রেম মুগ্ধা দময়ন্তী কিছুতেই তাঁহার হৃদয়-দেবতা নলকে পরিত্যাগ করিয়া দেবতা বা অন্য কাহারও কণ্ঠে বরমালা প্রদানে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—সেই চিত্র দর্শণ কালেই আমি মহারাজ নলকে আমার হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া রাখিয়াছি। এখন যদি দৈব বিপাকে একান্তই তাঁহাকে না পাই, বরং চিরকুমারী থাকিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে তাঁহার পরম সুন্দর দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া আজীবন তাঁহারই পদে ভক্তি ও প্রীতির মানসিক পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আপনার প্রাণে আপনি প্রীতি লাভ কিংবা অনলে আত্ম বিসর্জ্জন করিব, তথাপি অন্যের গলে বরমালা প্রদান করিয়া দ্বিচারিণী হইতে পারিব না। নলই আমার হৃদয়ের ধন এবং পতিরূপে পূজা-ভক্তি পাইবার একমাত্র আরাধ্য রতন। আমি নল ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানিনা, তাঁহার পাদপদ্ম ভিন্ন একমুহূর্ত্ত ও পতিরূপে অন্যকে চিন্তা করি না। আপনি দেবতাদের অতুল রূপ-বৈভবের কাহিনী বা দেব-দত্ত অভিশাপের বিষম অমঙ্গল সূচক ভৈরব বাণী বলিয়া কিছু-তেই আমাকে প্রলুব্ধ বা ভীত করিতে পারি-বেন না। আর আপনি অযথা মহারাজ নলের নিন্দা করিয়া রসনা কলঙ্কিত না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়। আপনি অবশ্য জানেন ও মানেন যে, মহাজন নিন্দা কীর্ত্তন ও শ্রবণ মহাপাপ। অতএব মহাশয় এরূপ পাপ জনক ঘৃণনীয় কাজ পরিত্যাগ করিয়া অচিরে এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন। অগত্যা দেবদূতরূপী ছদ্মবেশী নল তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

* লোক শিক্ষার প্রয়োজন বা সাধু-সজ্জনের পরীক্ষা গ্রহণ জন্য মাঝে-মাঝে দেবতারা মর্ত্ত্যে আগমন করেন। দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় সে রূপ বিধানেরই বশবর্ত্তী হইয় কতিপয় দেবতার মর্ত্ত্যে আবির্ভাব হইয়াছিল।

দেবতারা অন্তর্য্যামি। তাঁহারা অন্তরীক্ষে থাকিয়া নল-দময়ন্তীর সব ব্যবহার দেখিলেন—সব কথা শুনিলেন। ভাবী দম্পতি প্রথম দেব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। অলক্ষ্যে তাঁহাদের প্রতি শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল।

যথা সময় স্বয়ম্বর সভার অধিবেশন হইল। নানা দেশাগত বহুসংখ্যক রাজা, রাজপুত্র ও ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সভা মণ্ডপে উপবিষ্ট হইলেন। বহুমূল্য-রত্নালঙ্কারে ভূষিতা অপ্সরা-বিনান্দিতা রাজদুহিতা রূপসী দময়ন্তী বর-মাল্য করে সভাস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, অনুরূপ বেশ-ভূষায় বিভূষিত, সমমূর্ত্তি দিব্য কান্তি পাঁচ জন নল সেই স্বয়ম্বর সভাস্থলে উপবিষ্ট আছেন!

"একই বয়স বেশ রূপ আভরণ।
হেন কালে নল মূর্ত্তি দেখে পঞ্চজন॥
তাহা দেখি দময়ন্তী হইয়া চিন্তিত।
কি করিব, কি বলিব স্থির নহে চিত॥"

পঞ্চ নল মূর্ত্তি দর্শনে রাজবালা দময়ন্তী যুগপৎ বিস্ময়-বিষাদে নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর ইহা দৈবচক্র জ্ঞানে, ভক্তি-বিশ্বাসাদি আন্তরিক উপাদানে, তিনি শ্রীভগবানের মানস পুষ্প ও দেবোদ্দেশে স্তব-স্তুতি এবং ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবতারা তাঁহার স্তব-স্তুতিতে পরিতুষ্ট হইয়া ছলনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় মূর্ত্তি গ্রহণ এবং নল-দময়ন্তীকে স্নেহাশীর্ব্বাদ ও বর প্রদান করিয়া প্রীতি মনে দেবধামে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন দময়ন্তী প্রকৃত নলকে চিনিতে পারিয়া হর্ষ-প্রফুল্ল মনে—তাঁহার প্রাণারাধ্য ধন নলের গলে বরমাল্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। মাঙ্গলিক উৎসবের জয়-কোলাহলে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইল।

"হাত করে দময়ন্তী যোড় করি হাত।
লোকপাল তোমরা যে ত্রিদশের নাথ॥
সমস্তের সৃষ্টিকর্ত্তা জগতের পিতা।
অল্প মতি নারী আমি মনুষ্য দুহিতা॥
আমাকে মোহিলে কোন্ পৌরুষ সবার।
কৃপা কর দেবগণ মানি পরিহার॥
মনে মনে দময়ন্তী এত স্তুতি কৈলা।
ইন্দ্র আদি চারি দেব মহাতুষ্ট হৈলা॥
যাঁর যাঁর নিজমূর্ত্তি হৈলা দেবগণ।
নলে চিনি দময়ন্তী হরষিত মন॥
নলের গলেতে মালা দিল হরষিতে।
প্রণাম করিলা দেবী পড়িয়া ভূমিতে॥"

(২)

বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইলে মহারাজ নল নব-পরিণিতা ভার্য্যাসহ দেশে গমন করিলেন। যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, ততই চারিদিকে দময়ন্তীর অমিয়-মধুর চরিত্র-মহত্ত্ব প্রভাবে মহারাজ নল মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। পতিপ্রেমা পত্নীর সুমধুর ব্যবহার প্রতির নিকট মাত্রেই প্রীতিপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক হইতে লাগিল। ফলতঃ অনুরূপ সমাগমে পতি-পত্নী মহাসুখে সময়পাত করিতে লাগিলেন। নিয়ত যাগ-যজ্ঞ ও হোম-দানাদি পুণ্যজনক কার্য্যের অনুষ্ঠানের পুণ্য-প্রভাবে নৈষধ নগরী দ্বিতীয় অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রাজা দম্পতী বিশেষেবে প্রজা পালন ও প্রকৃতি-পুঞ্জের হৃদয়ে বিমল ধর্ম্মভাবের সঞ্চার করিয়া

নির্ব্বিরোধে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। মহারাজ নলের রাজত্বে প্রজাগণের সুখ-সুবিধার অবধি থাকিল না।

ক্রমে মহারাণী দময়ন্তীর চন্দ্রসেন নামক পরম সুন্দর পুত্র ও ইন্দ্রসেনী নাম্নি এক কন্যারত্ন প্রসূত হওয়ায় মহাত্মা নল আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন। ফলতঃ পতিব্রতা পত্নী, প্রিয়-দর্শন পুত্র-কন্যা এবং প্রজারঞ্জক রাজার যথার্থ প্রাপ্য রাজভক্তি লাভ করিয়া, তিনি পরম সুখ-শান্তির সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এত সুখ-শান্তি তাঁহাদের কপালে সহিল না। নিঠুর অদৃষ্টচক্রের ঘোর আবর্ত্তনে একদা দৈব যোগে জ্ঞান-ধর্ম্মের আধার মহারাজ নলের দ্যূত ক্রীড়ায় অভিলাষ জন্মিল। তিনি পুষ্কর নামক জনৈক জ্ঞাতি ভ্রাতার সহিত পণ রাখিয়া অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন। দুষ্টমতি কলির ছলনায় রাজা আপনার সর্ব্বস্ব পণ করিলেন। কলি-চক্র প্রভাবে পুষ্করেরই জয় হইল। ধর্ম্মবীর নল জ্ঞাতি হস্তে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। এখন বিপুল নৈষধরাজ্য বা অপরিসীম ধন-রত্ন পূর্ণ ধনাগার ও রাজ ভাণ্ডারের কিছুতেই আর তাঁহার বিন্দু মাত্রও অধিকার থাকিল না। মহারাজ নলের সব ফুরাইল—মুহূর্ত্তে রাজাধিরাজ নল, তদানিন্তন ভারতসম্রাট নল, কপর্দ্দক হীন পথের কাঙ্গাল হইলেন।

মহারাজ নল প্রিয়তমা পত্নী ও প্রাণাধিক স্নেহাস্পদ পুত্রকন্যাকে শ্বশুর ভবনে পাঠাইয়া স্বয়ং বনগমনে কৃতসংকল্প হইলেন। আজন্মসুখলালিতা, স্নেহ প্রতিপালিতা রাজদুহিতা দময়ন্তী জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও দুঃখ কাহাকে বলে জানেন না; তথাপি পতিগত প্রাণা দময়ন্তী কিছুতেই পতিকে ছাড়িয়া পিতৃভবনে থাকিয়া পিতার রাজঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বাস করিতে সম্মত হইলেন না! মহারাজা নল সস্নেহ মধুর বচনে পত্নীকে পিতৃ ভবনে যাইবার জন্য অনেক বুঝাইলেন; বনের ভীষণতা ও বনবাসের বিষম ক্লেশের কথা তুলিয়া ভীতি প্রদর্শন, বা পিতৃভবনের রাজকীয় সুখ-সম্পদের মধুর আস্বাদনের কথা বলিয়া, কোনরূপ ভয় বা প্রলোভনের দ্বারা সাধ্বী দময়ন্তীর মত পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইলেন না!

দময়ন্তী রাজ দুহিতা ও রাজ বণিতা এবং চিরদিন সুখ-সৌভাগ্যের শান্তিময় ক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিতা। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই বিদর্ভের রাজ ভবনে রত্নময় আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া অপ্রতিম রাজবৈভব ও ভোগ বিলাসের অনন্ত সামগ্রী সম্ভার উপভোগ করিয়া প্রাণে প্রীত থাকিতে পারিতেন। কিন্তু পতিব্রতা সতীর নিকট পতির তুলনায় সসাগরা ধরিত্রীর বিপুল ঐশ্বর্য্যও অতি তুচ্ছ! তাই পতি-প্রেম পাগলিনী সতী পিতৃভবনে যাইতে স্বীকৃত না হইয়া পতিসহ বনবাসিনী হইবার জন্য যারপরনাই ব্যাকুল হইলেন। মহারাজ নলের স্নেহ-মধুর অনুরোধ ও উপদেশ বাণী, প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র-কন্যার স্নেহাকর্ষণ বা জনক ভবনের সুখ-সম্পদের প্রলোভন, কিছুতেই দময়ন্তীকে বনগমন সঙ্কল্প হইতে বিরত করিতেপারিল না। তিনি স্বামীকে অশেষ বিশেষ বুঝাইয়া, বিনয়-নম্র মধুর বচনে কাকুতি মিনতি করিয়া

তাঁহার নিকট হইতে বনগমনের অনুমতি চাহিয়া লইলেন।

অনন্তর মহারাজা নল জনৈক পুরোহিত ও ধাত্রী সমভিব্যাহারে স্বীয় পুত্র-কন্যাকে বিদর্ভ নগরে প্রেরণ করিয়া পত্নীসহ বনযাত্রা করিলেন।

রাজ-দম্পতি রাজপুরী ছাড়িয়া কিয়দ্দূর-পথ অগ্রসর হইলেন। বিদর্ভের অভিনব ভূপতি নিষ্ঠুর পুষ্কর, চর পাঠাইয়া তাঁহাদের বস্ত্রাভরণাদি সব কাড়িয়া লইলেন। রাজাধিরাজ নল এবং আজন্ম রাজঐশ্বর্য্যের সুখময় ক্রোড়ে লালিতা পালিতা রাজকন্যাও রাজকুল বধূ দময়ন্তী, পথের কাঙ্গাল কাঙ্গালিনীর ন্যায় দীন ভিখারী ভিখারিণীর শোচনীয় বেশে, লোকজন ও বিষয়-সম্পদ বিহীন হইয়া এক বস্ত্রে বনে গমন করিলেন।

"তবে দময়ন্তী সঙ্গে নল নরপতি।
পুরী হইতে বাহির হইলা শীঘ্র গতি॥
দারুণ পুষ্কর রাজা পাঠাইয়া চর।
বস্ত্র আভরণ কাড়ি লইলা সত্বর॥
দুই খানি বস্ত্র মাত্র পরি দুই জন।
হাটিয়া নগর পথে করিলা গমন॥"

কঙ্কর-কণ্টকাকীর্ণ বিষম বনপথে হাঁটিতে হাঁটিতে অসূর্য্যম্পশ্যা, কুসুমকোমলা রাজকুল ললনা দময়ন্তীর সুকোমল পদদ্বয় বাহিয়া শোণিত ধারা পড়িতে লাগিল। কে যেন তাঁহার নব কিশলয় সদৃশ নবনীত-কোমল পদ, অলক্তক-রক্তিম রাগে রঞ্জিত করিয়া দিল।

"ফুলের অঙ্কুর আর কণ্টক কাননে।
হাঁটিতে দেখায় ফুটে কোমল চরণে॥"

মধ্যাহ্ন গগনের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেবের সুতীক্ষ্ণ কিরণ জাল সম্পাতে অনশন ক্লিষ্টা রাজ-কুল-লক্ষ্মীর সুচারু বদন কমল হইতে প্রভাতকালীন শিশির বিন্দুর ন্যায় স্বেদ বিন্দুসমূহ ঝরিত হইতে লাগিল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। তবু তিনি আপনার অসাধারণিক সহিষ্ণুতা প্রভাবে অম্লান বদনে স্বামীর অনুগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা বিজন গহন বনে প্রবেশ করিলেন। বিষধর ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি-হিংস্র-শ্বাপদ-জন্তু সঙ্কুল ভুজঙ্গ ও ভীষণ বন ভূমি। কোন দিকে লোক-বসতির চিহ্ন মাত্র নাই, জন মানবের সাড়াশব্দ নাই।

আবাল্য রাজঐশ্বর্য্যের সুখময় ক্রোড়ে লালিত পালিত রাজদম্পতি এখন ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের উপায় বিহীন দীনহীন পথের কাঙাল। বনের অজ্ঞাতপূর্ব্ব কটু-কষায় ফল এবং যত্র-তত্র স্থিত পঙ্কিল জলই এখন তাঁহাদের জীবনধারণের একমাত্র সম্বল। তাও সকল দিন সকল বনে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, রাজদম্পতি ক্ষুধা তৃষ্ণায় ততই বড় বেশী কাতর হইয়া পড়িলেন।

"অন্ন নাহি ক্ষুধাতে, তৃষ্ণাতে নাহি জল।
দুঃখ শোকে উপবাসে হইলা বিকল॥

অবস্থার বিষম নিষ্পেষণে অনাহার-অনিদ্রায় মানব বুদ্ধি ভ্রংশ ও পাগল হইয়া থাকে। মহারাজ নলও অবস্থার কঠোর পীড়নে অনেকটা সেইরূপ শোচনীয় দশায় উপনীত হইলেন! একদা তিনি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া মাংস ভক্ষণার্থ দুইটি পাখী ধরিতে প্রবৃত্ত

হইলেন! কিন্তু তাঁহার পাখী ধরিবার উপযোগী অস্ত্র বা যন্ত্রাদি কিছুই ছিল না। অগত্যা তিনি উপায়ান্তর বিহীন হইয়া স্বীয় পরিধেয় সেই একমাত্র বসনই পক্ষীদ্বয়ের প্রতি জালরূপে নিক্ষেপ করিলেন। শক্তিশালী বিহঙ্গম যুগল প্রাণ ভয়ে সবলে তীব্র বেগে বস্ত্রসহ শূন্যমার্গে উড়িয়া গেল। কলি প্রভাবে বুদ্ধিভ্রংশ রাজা স্বীয় একমাত্র পরিধেয় বসন হারাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন।

রাণীর ঐকান্তিক শুশ্রূষায় রাজার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। রাজা এ দিগাম্বর অবস্থায় কেমন করিয়া থাকিবেন, সেই চিন্তায় বড়ই অস্থির হইলেন। তখন পতিব্রতা দময়ন্তী স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রার্দ্ধ স্বামীকে পরিধানার্থ প্রদান করিয়া তাঁহার উপস্থিত লজ্জা নিবারণ করিলেন। সাধ্বী পত্নীর প্রবোধ বাক্যে ও অঞ্চল সঞ্চালিত শীতল বাতাসে রাজা কথঞ্চিৎ শান্তি, সুস্থতা ও সান্ত্বনা লাভ করিলে পর, ফল ও জল অনুসন্ধানে উভয়ে পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

মিবার-কলঙ্ক

প্রথম সর্গ।

যেথা ললিত ছন্দে, পাপিয়া বন্দে মধুরে,
সাঁতারি' মলয় বায়;
মুখরি' কুঞ্জ, কোকিল পুঞ্জ, কাকলী লহরী
আকুলি' গায়,
সেথা, গুঞ্জরে নাকি, গুঞ্জ পুলকি, মত্ত মধুপ
মৃদুল রায়?
—হিরণ্যমোহন রায়।

পশ্চিম গগন পথে, বৃদ্ধ ভানু দেব
শাসিয়া ধরণী রাজ্য প্রচণ্ড প্রভাবে,
তনুজ পূর্ণেন্দু করে অবনীর ভার
অর্পি' এবে, ত্যাগি' সুখ, রাজত্ব-সম্ভোগ,
প্রেয়সী পদ্মিনী দলে, অভ্র নিবাসিনী
শ্বেত কাদম্বিনী কুলে বিতরি রজত,
স্বর্ণ রাশি রাশি, পরি গৈরিক বসন,
প্রস্থানিলা মৃদুপদে অস্ত বনাশ্রমে।
বিষাদ-কাতরা কণ্ঠে বিহগ নিচয়
কূজনিলা; কাকলিলা মুহুঃ উহুঃ স্বনে
আকুল কোকিল কুল, সুউচ্চ ঝঙ্কারে
কান্দিলা পাপিয়া ব্রজ; কান্দিলা বিষাদে
মৃদুল হিল্লোল রবে জাহ্নবী-নন্দিনি,
উচ্ছ্বাসে দুকূল প্লাবি'। গোধূলি দুকূলে
ঢাকিলা ধরিত্রী সতী শ্যামাঙ্গ আপন।
পূরব গগণ প্রান্তে জলদ আসনে,
কৌষিক বসন-বদ্ধ দীপ্ত ইন্দুদেব
প্রকাশিলা ধীরে ধীরে চক্রবাল শিরে।
বসুধা-অধর প্রান্তে দেখা দিল পুন
সুমৃদু হাসির রেখা। তরল-জ্যোৎস্নী,
শশধর সীমন্তিনী, জ্যোতিষ্ক-কুন্তলা,
নামিলা অমরা হ'তে যামিনী সুন্দরী;
সুস্নিগ্ধ সুরভি শ্বাস নিশ্বাসি' সঘনে,
আসিলা পদ্মাপুলিনে মৃদু মন্দ পদে।
অস্তগত ভাস্করের অস্ফুট সুরাগ-
রঞ্জিত, রক্তিমেষদ প্রতীচির পানে
নিস্পন্দ অনন্ত নেত্রে চাহি কতক্ষণ,
হায়রে অপ্রতিহত প্রভাবে, সহসা
বহিল হৃদয় মাঝে শত পথী-স্রোতে
চিন্তা-নির্ঝরিণী। ত্যা'র নীরব কল্লোলে

ডুবিল গাঙ্গেয়ী কণ্ঠ ; কাকলী লহরী
কোকিলের ; বিহঙ্গের অব্যক্ত আরাব ;
কার্য্য-ক্লান্ত ধরিত্রীর বিমিশ্রিত ধ্বনি।
খরস্রোতে অন্তরিলা নেত্র পথ হ'তে
অনিন্দ্য সুষমা রাশি সান্ধ্য প্রকৃতির ;
বিশাল অর্ণব-ভ্রান্তি স্রোত-শার্দ্দূলীর
মৃদু বীচি বিক্ষোভিত স্ফীত বক্ষঃস্থল ;
সুশ্যাম সৈকত শোভা ; দিগন্ত বিস্তৃত,
গগণ-পরশী-শীর্ষ, অস্ফুট দর্শন,
নিসর্গ-শোভিত দূর জনপদ শ্রেণী।
"অস্তাচল গত অই মার্ত্তণ্ডের মত,
ভারতের প্রজ্জ্বলিত সৌভাগ্য তপন,
অদৃষ্ট আকাশ হ'তে, বহুদিন আজি,
রাখিয়া স্মৃতির সুধু হীরক খচিত
স্তিমিত জ্যোতিষ্ক গুলি—ক্ষণদীপ্ত হায়,
কালের তিমির গর্ভে গিয়াছে ডুবিয়া।
উত্তরে—জ্যোতিষ্ক-পথ-রোধী শৈলপতি
দক্ষিণে—বারিধি-স্নাত পবিত্র 'কুমারী',
পূরবে—'চট্টল', চিরপ্রকৃতি-নিলয় ;
পশ্চিমে—বিধৌত-সিন্ধু-শাখা 'পঞ্চনদ',
এ বিশাল ভারতে যেই দিকে আজি
ফিরাই এ নেত্র হায়, হতাশ-মিশ্রিত
শ্মশানের তপ্ত বায়ু বহে নিরন্তর !
বাসবের বজ্রনাদ, কোদণ্ড নির্ঘোষ
রাঘবের, পাণ্ডবের গাণ্ডীব টঙ্কার ;
শচীর গরিমা, শুচি সতীত্ব সীতার,
অপূর্ব্ব সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কৃষ্ণার
হয়েছে ভারতে আজি কবি কল্পনার
সৃজিত, অলীক স্বপ্ন, আকাশ কুসুম !
হায়রে সে বৈজয়ন্ত, অযোধ্যা, হস্তিনা,
কালের কঠোর দণ্ডে, নিয়তি চক্রের
অবিরাম নিষ্পেষণে হ'য়ে চূর্ণীভূত,
রয়েছে পড়িয়া আজো ; শৃগাল-চর্ব্বিত
শুষ্ক ইক্ষুদণ্ড যেন, চির-রণজয়ী
কালের সমরে কিম্বা ভগ্নদূত যেন।
কিংবা কেন অতদূরে করিবে গমন?
'সত্য' নহে, 'ত্রেতা' নহে, নহেরে 'দ্বাপর'—
সেদিনের কথা, আজি হায়রে সেদিন,
শত শত 'মেরাথান' 'থারমপলীর'
পবিত্র শোণিত বিন্দু, অস্থি, মজ্জা যা'র
প্রতি রেণু রন্ধ্রে আজো রয়েছে নিহিত ;
'বাপ্পা'-'সমর' 'কুম্ভ' 'হামীর' 'সংগ্রাম',
'প্রতাপের' বীর-পদাচিহ্ন অগণিত,
হৃদয়-নিঃসৃত তপ্ত রুধির রঞ্জিত
প্রতি গিরিবর্ত্মে যা'র রয়েছে আজও
অঙ্কিত ; 'পদ্মিনী', 'পান্না' 'করমদেবী'র
পবিত্র চরণ রেণু প্রতি স্থানে যা'র
রয়েছে মিশ্রিত দৃঢ় মৃত্তিকার সনে ;
অণুমাত্র যাঁহাদের পদাচিহ্ন ধরি,
অগণিত বাণীপুত্র,—মহাভাগাবান,
তুলি' দর্পে কালজয়ী কীর্ত্তির নিশান,
গেছে রাখি' ধরাতলে, স্মৃতির মন্দিরে
হেমময় চির-চারু অমর মূরতি,
হায় সে' চিতোর আজি—ব্রহ্মাণ্ড-প্রতীর্ণ
নিপুণতা-নিদর্শন সৃষ্টি কৌশলের—
রয়েছে লুটা'য়ে, যেন শ্মশানের' পরে
শত ছিন্ন, ধূসরিত জীর্ণ পতাকাটি।
কালের খনির গর্ভে, চির সমুজ্জল
—মণি-শ্রেষ্ঠ পান্না জিনি—যেই পান্না পানে
অঙ্গুলি হেলায়ে গর্ব্বে, আজিও বিধাত

সুপবিত্র প্রভুভক্তি শিখায় জগতে,
কি কুক্ষণে কৃতঘ্নতা তীব্র হুতাশন
পশি' সে খনির গর্ভে, পুড়ি' ভস্মরাশি
করিল সে পুণ্যভূমি, হায় পরিণত
শ্মশানে, অবোধ নর বুঝিবে কেমনে,
কোন ক্রূর বিধাতার দীপ্ত অভিশাপে ?
কালের কঠোর নেত্র, নিয়তি চক্রের
অবিরাম আবর্ত্তন, ধাতার আহ্বানে (ও)
হায়রে ভুলেও কভু নাহি চায় ফিরে ;
নাহি করে গতি রুদ্ধ ক্ষণেকের তরে (ও) !"
হেন রূপে চিন্তা স্রোতে, অশ্রুর প্লাবনে,
হতাশের ঘন-দীর্ঘ নিশ্বাস পবনে,
মানস তরণী খানি চলিল ভাসিয়া
কল্পনা-কাণ্ডারী সাথে, বহি' ধীরে ধীরে
ভূতসিন্ধু। কতক্ষণে উতরিলা আসি,
ষোড়শ শতাবদীর যবন-বেষ্টিত,
পুণ্যভূমি 'রাজবারা'—হৃদয়-শোভিনী,
শূরত্বের, সতীত্বের দৃঢ় ভিত্তি' পরি
প্রতিষ্ঠিত, স্বাধীনতা সুন্দরীর স্বীয়
বিশ্ব শ্রেয়ঃতম প্রিয় লীলা নিকেতন,—
শোভিত মাধব-বক্ষ কৌস্তভ যেমতি—
উচ্চ শ্বেত-সৌধ-চূড় চিতোর নগরে।
নীরব প্রকৃতি ; স্বচ্ছ, তমল তিমিরে
প্লাবিত ধরণী-বক্ষ। অসিত নিশির,
অনঙ্গদেবের যেন ফুল ধনু খানি,
শোভিছে গগণ প্রান্তে তনু শশধর ;
সুনীল সাগর বক্ষে,—স্থির অচঞ্চল—
সৌর-কর-প্রজ্বলিত দ্বীপ খণ্ড যেন
উঠিছে সলিল-শয্যা ত্যজি' ধীরে ধীরে।
জ্বলিছে অম্বর ব্যাপি জ্যোতিষ্ক নিচয় ;
যেন নীল মখমল চন্দ্রাতপ তলে
দীপিছে দেউটি মালা ; নন্দন কাননে
বিকচ মন্দার রাশি—নয়ন-নন্দন,
শোভিছে অথবা যেন। নীরবে লুটা'য়ে
সুষুপ্তি সতীর কম চরণ যুগলে,
ল'য়ে কোলে কার্য্য-ক্লান্ত সন্তান নিচয়ে,
লভি'ছে বিরাম এবে চিতোর সুন্দরী।
সুপ্রশস্ত, রক্ত রাজবর্ত্ম উভপাশে
রাজিছে পাটল, শুভ্র, চারু অট্টমালা ;
বিচিত্র বিপণি শ্রেণী। দীপ স্তম্ভ সারি
রয়েছে নয়ন মুদি' দাঁড়ায়ে নীরবে।
কোথাও বা স্তম্ভ হেলি' শান্তিবক্ষঃ কেহ,
ধরাতলে একমাত্র মোক্ষ প্রদায়িনী
গঞ্জিকা-নন্দন প্রিয় চরস প্রসাদে,
কভু মৃদু, মৃদুতর, কভু বা স্বগত,
খরতর গর্জ্জনে কভু গরজি' সহসা,
সুষুপ্ত খেচর প্রাণে আতঙ্ক সঞ্চারি,
আলাপিছে একে একে বিশ্ববাসী যত
বিচিত্র রাগিণী সনে—জড়িত রসনা-
সম্ভূত, কিম্ভুত এক বীভৎস মিশ্রিত
অব্যক্ত আরাব। পুন কভু তুড়ী ন্যায়ে,
করিয়া বদন খানি বিকট ব্যাদান,
করিছে উৎকট ধ্বনি ! চমকি' সভয়ে,
হায়রে, হতাশ চিত্তে শূন্য পাত্র লোভী,
অনভুক্ত হতভাগ্য বক্র অকিঞ্চিৎ
নিমেষে বিদ্যুৎ-লম্ফে, দীর্ঘ দ্রুত পদে
অদূর ঝোপান্ধকারে হইছে অদৃশ্য।
পরি' স্বর্ণ বীচি মালা, হেলিয়া দুলিয়া
নাচিয়া, সুদূর-শ্রুত অস্ফুট সুনাদে
গাহি কুলু কুলু কণ্ঠে অবিশ্রান্ত তানে,

চুমিয়া পশ্চিম প্রান্ত ধরা-সুন্দরীর,
উদ্দেশি জলধীশ্বরে, আরাবলী-সুতা
চলিয়াছে অভিসারে ; ভীম অজগর,
বরাজ-সম্ভূত যেন বিচিত্র ভুবনে,
চলেছে বাসুকি পদে। মণিরূপে তা'র
শোভিছে তরঙ্গোপরি শুভ্র ফেন রাশি।
সুশ্যাম সৈকত দেশে, উচ্চ-শ্বেত-চূড়
মর্ম্মর প্রাসাদ মালা চিতোর পতির,
সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্যে যিনি বৈজয়ন্ত ধামে,
শোভি'ছে বিশাল দেহ করি' প্রসারিত,
হিমানী-মণ্ডিত যেন 'ধবল' শিখর।
বাহিরি' সে হর্ম্ম্য হ'তে রক্তিম বরণ
মর্ম্মর নির্ম্মিত দু'টি সোপান বীথিকা
পশেছে বেরিশ গর্ব্বে, যেন সৌধ-পতি
প্রক্ষালিছে লাক্ষারস-সুরঞ্জিত স্বীয়
সুচারু চরণদ্বয়। অন্তরে দোঁহার
রাজিছে স্তম্ভ-শোভিত বিশাল তোরণ।
কৃতান্ত-কিঙ্কর-কায় প্রতীহারী কুল
করে করে দীর্ঘ শূল,—ভীম প্রহরণ—
বদ্ধ কোষে তীক্ষ্ণ অসি, ত্রিশূলী-বিক্রমে,
ভ্রমিছে গম্ভীর, ধীর চরণ বিক্ষেপে।
নীরবে তোরণ-শিরে নহবত-মন্দিরে,
নির্ব্বাত বাদিত্র-বিন্দুশয্যা তলে বসি'
বাদক নিচয়, ত্যজি নিদ্রা একে একে,
হতেছে সজ্জিত। বেষ্টি প্রাসাদ-ঈশ্বরে,
সুউচ্চ, প্রকার মালা, উপেক্ষি হেলায়
পরাক্রম অগণিত ভীম অভিযান,
[illegible] আছে খাড়া, ভীষণ ভ্রূকুটী,
[illegible], যেন কালাগ্নি-বেষ্টন
[illegible] বদনে।

প্রতীপ পুলিনে—যেন 'নন্দন' কুঞ্জে—
শোভিছে রাণার প্রিয় প্রমোদ উদ্যান।
অদূরে পাদপ শিরে, অস্ফুট-দর্শন
প্রকাশিছে তুঙ্গ শীর্ষ বৃক্ষ-বাটিকায়।
নীরব নিস্তব্ধ ধরা। এহেন সময়ে
বহি' জন-প্রাণী-শূন্য রাজ বর্ত্ম পার্শ্ব,
কে অই শুভ্র-বসনা সন্তর্পণে অতি,
কভু মৃদু, কভু দ্রুত, দ্রুততর পুন,
থমকি' সহসা কভু চলেছে একাকী?
আবৃত আপাদ কণ্ঠ সুশ্বেত বসনে;
অদৃশ্য অবগুণ্ঠনে বদন মণ্ডল?
কিন্তু যেন তবু অই গুণ্ঠন বিদারি'
কি এক অচিন্ত্য চিত্র—গলিত অধরে,
উচ্চাশার পূর্ব্বাশার উষার তরল
রক্তিম সুরাগ; নেত্রে—কোটর প্রোথিত
দৃঢ়তার মাধ্যাহ্নিক অনন্ত-অনল;
কুঞ্চিত ললাটে' সান্ধ্য স্বচ্ছ তমোচ্ছায়া
নিরাশার,— ক্ষণে ক্ষণে পাইছে প্রকাশ।
ফণী-কল্প কুটিলিত পলিত চিকুরে,
আঁখি-মুগ্ধকর, স্নিগ্ধ ধবলতার জ্যোতি
হইছে বিকীর্ণ! কে তবে এ বর্ষীয়সী?
নিঝুম নিশীথে হেন কি উদ্দেশ্য কোথা
সমাধিতে, উদ্‌যাপিতে কোন মহাব্রত
জীবনের, হেন দৃঢ়, অটুট সঙ্কল্প
পোষি হৃদি মাঝে, একে চলেছে একাকী?

হেনকালে সমস্বরে পরতীর হ'তে,
বিদারিয়া নিস্তব্ধতা নিষুপ্ত নিশির,
সহসা উঠিল গাহি' প্রাহরিক গীতি
বিচিত্র বিহগ কণ্ঠ। না হ'তে নীরব,
নূপুর-ঝঙ্কৃত রবে [illegible]

ভবানী মন্দির হ'তে করিলা ঘোষণা
ত্রিযামার তৃতীয় প্রহর। স্তরে স্তরে
তরল তিমির অঙ্কে নৈশ সমীরের,
মিশিল সে শব্দঃ-স্রোত ; বাড়া'য়ে দ্বিগুণ
নিস্তব্ধতা যামিনীর। অমনি সহসা
ঐকতান সহযোগে উঠিল বাজিয়া
কুসুম-কোমল-কণ্ঠে, বরষি শ্রবণে
সুধা প্রস্রবণ, যেন অনঙ্গ দেবের
মন্দার বাদিত্র ধ্বনি, প্রাসাদ তোরণ-
শিরোদেশ হ'তে মরি, প্রভাতী সঙ্গীত।
নন্দন কাননে যেথা বায়ুকুলেশ্বর
উঠিল। চমকি', শুনি' সে মধুর ধ্বনি।
করিলা প্রেরণ ত্বরা চিতোর নগরে
সুশান্ত তনয়ে স্বীয়, পরাগ-ভূষণে
সাজাইতে ফুলকুলে—সদ্যঃ প্রস্ফুটিত
আসিলা ত্বরিত পদে উষার আদেশে
'প্রভাত নক্ষত্র' দেব পূর্ব্বাশার পথে,
জানাইতে স্বীয় কর্ত্রী আদিত্য-দূতির
শুভ আগমন বার্ত্তা, ধরা-সুন্দরীরে।
পশিতে শ্রবণ প্রান্তে সে নিক্কণ স্রোত,
দাঁড়াইলা অকস্মাৎ থমকি' রমণী ;
চিন্তি' ক্ষণকাল যেন, চকিত চরণে
উত্তরিলা আসি রাজ-তোরণ সম্মুখে।
করিতে প্রবেশ, এক ভীষণ-দর্শন,
শূলপাণি প্রতীহারী—কৃতান্ত দোসর—
আসিলা ধাইয়া ; করি রুদ্ধ পুরোভাগ,
সুধাইলা গর্জ্জি' রোষে ঘূর্ণিত নয়নে ;—
"কে তুমি রমণী' হেন ঘোর নিশা কালে,
পশিছ নিঃশঙ্কে হেন রাজপুরি মাঝে,
উপেক্ষিয়া হেলাভরে শমন দোসর,—
সশস্ত্র প্রহরী দলে ? খুলিতে গুণ্ঠন,
সসম্ভ্রমে নমি শির, সশঙ্কিতে ত্বরা
দিলা ছাড়ি' পথ দ্বারী ; প্রবেশিলা বামা।

শ্রীনরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধিলিপি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বামী ও স্ত্রী।

অবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার আদিম অধিবাসী। অতি সৎস্বভাব সম্পন্ন খ্যাতি প্রতিপত্তি ও যথেষ্ট। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই একবাক্যে বলিবে যে অবিনাশ বাবুর ন্যায় ওরূপ অমায়িক ও পরোপকারী লোক দেখি নাই। তাঁহার দুই পুত্র হরেন্দ্র নাথ ও সুধীর চন্দ্র এবং একটী কন্যা প্রভাবতী। প্রভা সকলের কনিষ্ঠ বলিয়া পিতা মাতার অতিশয় আদরের ধন। মাতা ঠাকুরাণী প্রভাকে কখন চক্ষের অন্তরাল করেন না। পিতাঠাকুর মহাশয় প্রভাবিহনে পলকে প্রলয় গনেন। প্রভা পাতের কাছে না বসিলে তাঁহার আহার হয় না, বাবা এটী খাও ওটী খাও বলিবে, তবে তিনি আহার করিবেন। অবিনাশ বাবুকে কখনও দাসত্ব স্বীকার করিতে হয় নাই বা, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরাও কেহ কখন করেন নাই। যশোহর জেলার অন্তর্গত চৌবেড়িয়া তাঁহাদের বিশাল জমিদারী। কর্ত্তা মহাশয়কে প্রায়ই জমীদারিতে থাকিতে হয়, প্রজাবর্গের দুঃখোপশমন করিতে তিনি নিয়ত চেষ্টিত। সামান্য কর্ম্মচারীর

উপর ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। প্রজাদেরও বিশেষ ইচ্ছা যে তিনি সেই স্থানেই বসবাস করেন। অবিনাশ বাবুরও সেই ইচ্ছা, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত প্রভার বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব।

প্রভার বয়স দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; দিব্যি টুকটুকে রং, পাতলা পাতলা ঠোঁট দুইখানি, আকর্ণবিস্ফারিত ইন্দীবর বিনিন্দিত চক্ষু, সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল, মুখখানি ঠিক লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর মত; তাহার উপর নিতম্ব চুম্বিত ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ কেশরাশি। যৌবনের আগমনে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট। এক কথায় প্রভা দেখিতে অতি সুন্দরী। বালিকা এখন আর কাহার সাক্ষাতে বাহির হয় না, সে সর্ব্বদাই লজ্জায় কুঞ্চিত। একদিন আহারাদি সমাপনের পর গৃহিণী কর্ত্তাকে বলিলেন—তুমি ত বেশ নিশ্চিন্ত আছ, আমাদের প্রভার বয়স বাড়ছে না কমছে, তুমি ত এখনও বিবাহের নাম পর্য্যন্ত মুখে আন না। এরি মধ্যে লোকে কত কথা বলছে তা জান।

"আমি কি নিশ্চিন্ত আছি। যার তার হস্তে মেয়েটিকে ত সমর্পণ করা যায় না।"

"কেন হরিহর বাবুর ভাগিনেয় সুরেশের সঙ্গে দিলে হয় না। ছেলেটি যেমন নম্র তেমনি সচ্চরিত্র, এম, এ, পড়ছে।

"কি জান, একে ত মাতুলালয়ে বাস, তার পর গরীব, আর আমাদের ত ঐ একটি বই মেয়ে নয়।"

"তাতে কি হয়েছে, আমাদের যা কিছু আছে, তার সিকি অংশও প্রভা পাবে, তা হলেও কি আর চলবে না?

আমার ত একান্ত ইচ্ছা সুরেশের সহিত প্রভার বিবাহ হয়; কারণ এক সঙ্গে মা কমলা ও বীণাপাণির বরপুত্র হওয়া বড় কঠিন; আর এ হলে আমার প্রভাকে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে না; আমাদের ঐ নূতন বাড়ী খানা তাদের দিলেই চলবে।

ভ্রান্ত মানব! আজ তুমি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কন্যার সুখের জন্য দরিদ্র-হস্তে কন্যাদান করিতে ব্যথিত হইতেছ! কিন্তু তুমি কি জান না নিয়তির ইঙ্গিতে পর্ব্বত ধূলিকণায় পরিণত হয় এবং ধূলিকণা আবার অভ্রভেদী মহীধরে পরিণত হইয়া থাকে।

অবিনাশ বাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া গৃহিণীর মতেই মত দিলেন ও বলিলেন—আগে তার মাতুলকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁরও ত মত হওয়া আবশ্যক।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবাদৃকন্যা।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গাছ পালার বড় সখ; এজন্য তাঁহার বাটী সংলগ্ন একটী উদ্যান আম্র, লিচু, নারিকেল প্রভৃতি নানাবিধ ফলের গাছ ও বেল, জুই, মল্লিকা গোলাপ টগর প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা সজ্জিত; মধ্যে মধ্যে কামিনী ফুলের ঝোপ। উদ্যান মধ্যে স্বচ্ছ বারি পূর্ণ

সরোবরের চতুর্দ্দিকে গাঁদা ফুলের গাছ। নির্ম্মল সলিলে তাহার প্রতিবিম্ব দেখিয়া বোধ হয় যেন কে জল মধ্যে পুষ্পোদ্যান বসাইয়াছে। এ বাগানের কর্ত্রী প্রভা, কোথায় একটি পাকা পাতা আছে সেটী ভাঙ্গিয়া দিবে-গাছের গোড়ায় ঘাস হইয়াছে, তাহা মালিকে তুলিতে বলিবে, এ সমস্ত প্রভার কাজ; ইহাতে অন্যের অধিকার নাই। যদি কেহ দৈবাৎ একটী গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার উপর প্রভার অভিমানের সীমা থাকে না।

একদিন দারুণ শীতের শীতল প্রভাতে দিনমণি যখন সারারাত প্রণয়িনী কমলিনীর বিরহে অতিশয় ম্রিয়মান হইয়া পাণ্ডুবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাকাশে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছেন। সেই সময় প্রভা বাগানে আসিয়া প্রথমে সরসীর স্বচ্ছ সলিলে স্নান করিল এবং সেই আর্দ্রবস্ত্রে শিবপূজার নিমিত্ত পুষ্প চয়নে প্রবৃত্ত হইল।

বালিকা প্রভা শিশির-স্নাতা সদ্য প্রস্ফুটিত যূথিকার ন্যায় কোমল স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য বিভূষিতা। কুসুম কোমলা বালিকার অঙ্গে লাবণ্য যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। বৃষ্টি বিধৌত মধ্যাহ্নের নলিনীর ন্যায় প্রভার মুখখানি অনুপম কান্তিতে ঢল ঢল করিতেছে। আকর্ণ বিস্তৃত সুঠাম নয়নযুগে কুটিল কটাক্ষ নাই, শান্ত উজ্জ্বল-করুণ-কোমল-মধুর-দৃষ্টিতে হৃদয়ের সরলতা প্রকাশিত হইতেছে। ভ্রমর কৃষ্ণ অলকাবলী অসংযতভাবে মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে বিকীর্ণ হইয়া নিসর্গ সুন্দর মুখের শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। আরক্তিম ও শুভ্রকের বসন হইতে বারি বিন্দু গড়াইয়া ... কপোলদেশ বহিয়া ... দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। তপন কিরণ শোভিত পদ্মদলের ন্যায় রক্তিম রাগ রঞ্জিত ওষ্ঠাধরে পবিত্র মৃদুহাস্য সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছিল।"

সেই নিরুপম মাধুর্য্যময়ী বালিকা পুষ্পচয়ন করতঃ সাজি হস্তে ধীরে ধীরে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার তৎকালিন সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেবীমূর্ত্তি ও সুললিত গঠন, অথচ স্নিগ্ধকান্তিবিশিষ্ট সরল মধুর পবিত্র মৃদু-হাস্যবিজড়িত মুখশ্রী যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি কখনই তাহা ভুলিতে পারিবেন না।

প্রভা প্রত্যহই এইরূপ সময়ে বিশ্বেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হন, তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন অনূঢ়া গিরিবালা গৌরী শিবতুষ্টি-সাধনে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কি জানি কোন্ মহাবলে আজ তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কই আর কদাপিত এরূপ হয় নাই! তিনি যতবার ভগবান একলিঙ্গের ধ্যানে নিমগ্ন হন, ততবারই এক সুন্দর যুবকের অনিন্দনীয় মধুর মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইতেছে কেন? প্রভা তুমিত অনেকবার এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছ এবং আপন মনে নিভৃতে আপনার হৃদয়ের ভালবাসাটুকু প্রদান করিয়া মনে মনে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছ। এই সৌম্য মদনমোহন মূর্ত্তি তাঁহারই, ভাল করিয়া দেখ, চিনিতে পার কি না? প্রভা পরক্ষণেই দেখিল যেন দেবাদিদেব তাঁহাকে বলিতেছেন "বৎসে! তোমার তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমার হৃদয়ে যে অনিন্দ্যসুন্দর যুবকের প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হইয়াছে উনিই তোমার পতি।" প্রভা আর স্থির থাকিতে পারিল না।

ভগবান পার্ব্বতীনাথের চরণ তলে গললগ্নীকৃত বাসে কৃতাঞ্জলিপুটে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল ও বলিল "দেব!—আপনার আজ্ঞাই দাসীর শিরোধার্য্য." এই বলিয়া সরলা বালিকা ভক্তিভরে দেবাদিদেবের পূজা'দ সমাপন করিয়া গাত্রোত্থান করিবে এমন সময় জননী ডাকিলেন—"মা প্রভা! তোমার শিবপূজা সাঙ্গ হইয়াছে কি?"

তখনই বীনাবিনিন্দিত মধুর কণ্ঠে প্রভা উত্তর দিল "যাচ্ছি মা!" শিব বাক্য কদাপি অন্যথা হইবার নহে। বাস্তবিকই সুরেশের মাতুল সেইদিন প্রভাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন।

প্রভা জননীর নিকট আগমন করিল।

"মা! শীঘ্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন কর; হরিহর বাবু তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন, তোমার বিবাহ হইবে!"

প্রভা বড়ই লজ্জিত হইল এবং ধীরে ধীরে জননীর হস্ত হইতে বসনখানি লইয়া পরিধান করিল, তিনি তাঁহাকে মনোমত করিয়া সাজাইয়া দিলেন।

প্রভা ধীর পদ বিক্ষেপে পিতার সহিত যথায় সুরেশের মাতুল বসিয়া আছেন, তথায় উপস্থিত হইল এবং প্রণাম করিল।

হরিহর বাবু একটী মোহর দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নাম কি মা? প্রভা লজ্জাবিজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল শ্রীমতি প্রভাবতী দেবী।

সেই দিন পঞ্জি কাদি নির্ঘণ্ট করিয়া আগামী ২৬শে তারিখে শ্রীমান সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত প্রভাবতীর শুভ পরিণয় সম্বন্ধ হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মাতুলালয়ে।

প্রভাত হইয়াছে দিনমণি পূর্ব্বাকাশ সুন্দর রক্তবর্ণে রঞ্জিত করতঃ ধীরে ধীরে উদিত হইতেছেন। বৃক্ষবিতানের মধ্যে বসিয়া কলস্বর সহচর তাহার স্বভাব সুন্দর সুললিত স্বরে দিনমণির অভ্যর্থনা করিতেছে। বিটপী সমূহ শিশির স্নাত হইয়া তুষার ধবল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। শ্যামল নবদূর্ব্বাদলে শিশির বিন্দু সকল পড়িয়া মুক্তার ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছে, ভিক্ষুকগণ প্রভাতি গীতে দশদিশি প্রতিধ্বনিত করিতেছিল কেহবা শ্যামা বিষয়ক, কেহ কৃষ্ণ বিষয়ক, কেহবা দেহতত্ব গীতি গাহিয়া জীব জাগরণের সহায়তা করিতেছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি দেহতত্ব বিষয়ক এই গীতটি গাহিতেছিল—তাহা এইরূপ।

"আমার আমার বলি কেবল আমিত আমার নয়'
আমার বলে যাঁ'পাই কেবল মনে ভেবে দেখিনা॥
আমার পিতা আমার মাতা আমার ভগ্নী
আমার ভ্রাতা,
আমার ভিন্ন কই না কথা আমার ভিন্ন জানিনা।
আমার ঘর, আমার বাড়ী, আমার টাকা
আমার কড়ি,
আমার যে সব মনে করি, মনের ভুল তা বুঝি
না॥
আমার দেহ ভবে, তাও ছেড়ে যেতে হবে।
একলা আমায় যেতে হবে সঙ্গে কেউতো যাবেনা॥

এমন সময় এক সুন্দর যুবাপুরুষ অবিনাশ বাবুর বাটির সম্মুখে পদচারণা করিতেছিল। ভদ্রবংশোচিত পরিচ্ছদে যুবকের দেহ সজ্জিত।

দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি কাহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

"কিহে, সুরেশ বাবু যে, কতক্ষণ এসেছেন, আমাকে একবার কি ডাকিতে নাই।"

"না ভাই, আমি এখনিই আসিতেছি, আপনাকে ডাকিব মনে করিতেছিলাম, তা আর ডাকিতে হইল না, আপনি বেড়াইতে যাইবেন না?"

"না, আজ আমার যাওয়া হইবে না, আমার আজ অনেক কাজ আছে, পরশ্ব প্রভার বিবাহ, তাহার আয়োজন করিতে হইবে।"

"কোথায় বিবাহ হইবে।"

"সে কিহে, তুমি যে আশ্চর্য্য করলে! লোকে কথায় বলে 'যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়সির ঘুম নাই; তোমারও ঠিক তাই হইয়াছে। তোমারই সহিত বিবাহ; অথচ তুমি জান না।"

"দেখুন সুধীর বাবু, আমি গরীব বলিয়া আমাকে এরূপ অপদস্থ করিবেন না। আপনারা আমাকে যতটুকু অনুগ্রহ করেন, তাহাই যথেষ্ট। তদপেক্ষা অধিক আশা করা আমার পক্ষে বাতুলতার পরিচায়ক ভিন্ন আর কি হইতে পারে।"

"আপনি ও কি কথা বলিতেছেন, আপনার মাতুল হরিহর বাবু কি কিছুই বলেন নাই, আমার বোধ হয় আপনি এখানে ছিলেন না।"

"না, আমি গত কল্য রাত্রে আসিয়াছি, রাত্রে মামাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নাই, আজ প্রাতঃকালে উঠিয়াই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।"

"আচ্ছা আপনি বাটি যাইলেই আমার কথার সত্যাসত্য অনুভব করিতে পারিবেন।"

বাস্তবিক সুরেশ বাবু প্রায় দুই সপ্তাহ কলিকাতায় ছিলেন না; তিনি জনৈক আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে পুরী গিয়াছিলেন এবং যেমন পূর্ব্বে প্রতিদিন প্রাতে সুধীর বাবুকে বেড়াইতে যাইবার জন্য ডাকিতে আসিতেন, অদ্য সেইরূপ ডাকিতে আসিয়াছিলেন।

"আচ্ছা আপনি এমন বাটী যান, আপনার মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করুন।

সুরেশ ধীরে ধীরে তথা হইতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। একি আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, যাহার আমি সেবক হইবার উপযুক্ত নহি; সে কি না আমার দাসী হইবে। হৃদয় স্থির হও! একদিন যখন প্রভাকে পাঠাভ্যাসের সহায়তা করিতেছিলাম, সেইদিন হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলাম "আমি তোমায় বড় ভালবাসি" সরলা বালিকা সেই অবধি আর আমার সম্মুখে বাহির হয় নাই, এবং এই অপরাধের জন্য ঈশ্বরের চরণে আমি কত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি এবং লজ্জায় ২।৩ দিন তাহাদের বাটি পর্য্যন্ত যাই নাই; তাহাতেও সুধীর কত দুঃখিত হইয়াছিল! কৈ আমি ত ইহার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। শেষে কি আমি পাগল হইলাম। ভাবিতে ভাবিতে সুরেশ বাবু বাটির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যার আশ্রয় লইলেন।

"সুরেশ! কাল তুমি কখন এসেছ, আ

আমাকে কি একবার ডাকিতে নাই, আমি তোমাকে আসিবার জন্য গত কল্য টেলিগ্রাম করিয়াছি।"

"আমি প্রায় রাত্রি ২টার সময় আসিয়াছি। রাত্রি অনেক হইয়াছিল বলিয়া আপনাকে বিরক্ত করি নাই।"

তাহার পর হরিহর বাবু ভাগিনেয়ের নিকট একে একে তাহার বিবাহের কথা বলিতে লাগিলেন।

সুরেশ লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

"বাড়ীর ভিতর চল, তোমার মামীমা তোমার জন্য কত চিন্তা করিতেছেন।"

আচ্ছা, চলুন, যাচ্ছি।

অবিনাশ বাবুর ন্যায় একজন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য অতুল ঐশ্বর্য্যশালী জমীদারের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করা গৃহবিহীন নিরাশ্রয় দরিদ্র মাতুল-গৃহবাসী সুরেশ বাবুর পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। বিধাতার কৃপায় এখন তাহা সম্ভব হইতে চলিল, তাহার আশাতরু পুনরায় মুঞ্জরিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সুরেশ বাবু সেই অঘটনঘটন-সংঘটক বিধাতার চরণে কোটি কোটী প্রণিপাত করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-বাসরে।

আজ প্রভার বিবাহ। আত্মীয় কুটুম্বগণে বাটী পরিপূর্ণ। কোথায় বালক দল পরস্পর কলহে ব্যস্ত, গৃহিণী তাহাদিগকে—ছিঃ বাবা ঝগড়া কি করতে আছে, বলিয়া থামাইতেছেন। বাটীর কর্ত্তা শিশুদের মধ্যে কত দুগ্ধ চাই, তাহার হিসাব করিয়া গোয়ালিনীকে বলিয়া দিতেছেন। কোথাও আগত আত্মীয় শিশুপুত্রের অসুখ হইয়াছে জানিয়া তাহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। এদিকে গৃহিনী রন্ধন শালায় কি হইল না হইল, তাহার তত্বাবধারণ করিতেছেন। ক্রমে বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল, সমস্তই প্রস্তুত। সকলের পাত হইল এবং লবণ দাও, জল দাও, ইত্যাদি রবে বাটী কোলাহল ময় হইয়া উঠিল। কর্ত্তা পুরুষগণের মধ্যে এবং গৃহিণী আহারার্থী রমণীগণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দেখ বাবু লজ্জা কর না, চেয়ে চিন্তে নিও, এ তোমাদেরই বাড়ী বলিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। নহবত খানায় বেহাগ রাগিণীতে সানাই বাজিয়া উঠিল। আজ সকলের মুখে আনন্দ চিহ্ন, আজ প্রভার যে কত আনন্দ তাহা জানাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আজ সে চিরপ্রার্থীত ধন লাভ করিবে, এ আশায় তাহার হৃদয়ে আনন্দ তুফাণ বহিতেছে। বাস্তবিক বিবাহের ন্যায় আমোদ আর কিছুতেই নাই। একজন অপরিচিতের হস্তে আজ জীবন মন সমর্পন করিতে হইবে। দুইটী অপরিচিত প্রাণ এক সূত্রে গ্রথিত হইবে আজ হইতে তাহার সুখে সুখী ও দুঃখের ভাগ লইতে হইবে। হিন্দুর বিবাহ প্রেমের পূর্ণ মূর্ত্তি এ বন্ধন কখন ছিন্ন হয় না, পরজন্মে ও ইহার সহিত সম্বন্ধ থাকে। হিন্দুনারীর চক্ষে স্বামী দেবতা! এই দেবতার পূজা ও মনোরঞ্জন করাই নারী জীবনের সারব্রত। পাঠক কোন বর্ণে

কোন জাতিতে এমন প্রেমের মধুর মূর্ত্তি দেখিয়াছেন কি ?

এই সংসার রূপ সাগর মাঝে রমণীই কাণ্ডারী, যদি কাণ্ডারী সুদক্ষ হয় তরী অনায়াসে ঈপ্সিত স্থানে পৌছিতে পারে কিন্তু কাণ্ডারী যদি কাঁচা হয়, তাহা হইলে তরী অকুলে ডুবিয়া যায়। পাঠক! আপনাকে বোধ হয়, ইহার দৃষ্টান্ত দিতে হইবে না; গৃহিনীর দোষে গৃহস্থ নষ্ট, ইহা কখন না কখন আপনার নয়ন পথে পড়িয়া থাকিবে। সংসার পতিব্রতা পত্নী লাভের তুল্য সুখ আর কিছুতেই নাই। যিনি এই সুখে সুখী হইয়াছেন জগতে তাহার ন্যায় সুখী আর কে আছে!

চট্টোপাধ্যায় বাটী আজ পুষ্পপতাকায় সুসজ্জিত হইয়া নবশ্রী ধারণ করিয়াছে। আলোক মালায় সজ্জিত হইয়া অট্টালিকা শ্রেণী অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিয়াছে। সভাস্থলে নানাবিধ দেবদেবীর আলেক্ষ্য দ্বারা সজ্জিত ও তদুপরি ঢাকাই মসলিন উড়িতেছে। সভা মধ্যস্থল বহু মূল্য কার্পেট দ্বারা মণ্ডিত ও চারিদিকে পুষ্প দ্বারা সজ্জিত। ক্রমে রাত্র ৮ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইল। ঐ বর আসিতেছে, ঐ বর আসিতেছে রবে বালকগণ চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। বর সভাস্থ হইল। মাঙ্গলিক শঙ্খ ও হুলুধ্বনি সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইল। বাটীর মধ্যে রমণীগণের কোলাহল পড়িয়া গেল এবং সকলেই বর দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। লগ্ন উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া কন্যাকর্ত্তা বর বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতে ও কন্যা পাত্রস্থ করিতে অনুমতি চাহিলেন। সকলেই অনুমোদন করিলেন।

শুভলগ্নে প্রভাবতীর সহিত সুরেশের শুভ পরিণয় কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। পুরোহিত কতকগুলি মন্ত্র পড়িয়া দুটী জীবন চিরতরে এক করিয়া দিলেন।

এইবার বাসরের পালা। বর চোরের মত হেটমুণ্ডে উপবিষ্ট চারিদিকে সুন্দরীকুল তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। কেহ বা বরের কর্ণ মর্দ্দণ সুখ অনুভব করিতেছেন। কোন সুন্দরী সুবর্ণ বলয় যুক্ত হাত দুখানি মুখের নিকট লইয়া গিয়া 'কিহে বর নাকি' বলি অত লজ্জা কেন বলিয়া আপ্যায়িত করিতেছেন। কেহবা কনেকে বরের অঙ্কোপরি ধরিয়া বসাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কোন যুবতী তাহার মস্তকের কেশগুলি টানিয়া দিতেছেন কিন্তু তাতে ত তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই দেখিয়া সুন্দরীকুল বলিয়া উঠিল—ছিঃ ভাই বর! তুমি বড় বেরসিক, বাটী ছাড়িয়া তোমার জন্য সারারাত্রি জাগিয়া রহিয়াছি আর তুমি একটী মুখের কথাও কহিলে না। তবে এক কাজ কর একটী গান গাও, এই বার বর কথা কহিল বলিল—আগে আপনারা গান তারপর দেখা যাবে। অচ্ছা তাহাই হউক বলিয়া প্রভার বাল্য সঙ্গিনীগণ পঞ্চমে তান ধরিয়া গীত আরম্ভ করিল।

আজি লো দুঃখের নিশি, পোহাল সজনী তোর।
হেরলো এসেছে ওই আজি তব মনোচোর।
বাঁধ সখি বাঁধ তারে,
মিলন প্রেমের ডোরে,

যে না পালাতে পারে, হয়ে নিদয় অন্তর।
কথা কও হাসি মুখে,
দেখি মোরা মনোসুখে
মধুর মিলন হেরি, হই আনন্দে বিভোর॥

গীত শেষ হইলে প্রভার সঙ্গিনীগণ বলিল— আমরা তো গাইলাম, এইবার বরকে গাহিতে হইবে। সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, সেখানে আর কোন ওজর আপত্য চলিবে না, যেখানে ভগবান স্বয়ং হার মানিয়া "দেহিপদপল্লব মুদারং বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, সেখানে সুরেশ চন্দ্র ত কোন ছার, কাজেই গাহিতে হইল :—

"লহ ধনী প্রেমরত্ন লহ উপহার।
আজি হতে তুমি মোর আমি গো তোমার॥
এস রাখি বুকে করে, বাঁধিরে প্রণয় ডোরে।
এ নর জগতে পাতি ধর্ম্মের সংসার॥

এইরূপে বাসরের আনন্দ পরিসমাপ্ত হইতে না হইতে ধরা মাঝে ঊষার আলোক প্রকাশিত হইল। পিককুল তরুশাখে সমাসীন হইয়া সুমধুর স্বরে নব দম্পতীর কর্ণ কুহর পবিত্র করিতে লাগিল। সমস্ত রজনী বাসর-প্রকোষ্ঠে বহুলোক সমাগমে নব বর বধূর শারীরিক অবসাদ অপনোদনের জন্য মলয় সমীরণ ধীরে ধীরে গবাক্ষ পথে প্রবিষ্ট হইল ; এটা, ওটা সেটা নাড়াচাড়া করিয়া অবসাদ-ক্লিষ্ট বর বধূর গাত্রে বস্ত্র উন্মোচন করিয়া যেন ব্যজন করিতে লাগিল। আজ এই মলয় সমীরণ তাহাদের অঙ্গস্পর্শ করিয়া যেরূপ সুখ প্রদান করিল, এরূপ সুখ বোধ হয় তাহারা জীবনে আর কখন অনুভব করে নাই।

বিবাহের আমোদ প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া গেল। বরকন্তে বিদায় হইল। বিবাহ বাটীর আনন্দ কোলাহলও সেই সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া আসিল। প্রভাতের পরই সুরেশের মাতুল বর ও কন্যা লইয়া আপন ভবনে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভবিষ্যত-চিন্তা।

স্নেহময়ী কন্যা প্রভা জননীর গলা জড়াইয়া বলিল, "আজ কেমন আছ মা

"কবিরাজি ঔষধটাতে বেশ উপকার হয়েছে।"

"তবে মা আর বৈদ্যনাথে যাইবার আবশ্যক কি?"

"কবিরাজ বলেছেন এ রোগে বায়ু পরিবর্ত্তন বিশেষ উপকারী।"

যখন এখানে থেকে ভাল হ'ল, তখন আর যাবার প্রয়োজন কি? আর আমি এখানে একলা থাকিতে পারিব না ; বড়দাদা জমিদারিতে থাকিবেন, ছোটদাদা তোমাদের সঙ্গে যাইবেন। আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে।"

"উনি বলেন কি—কবিরাজের মতে হাওয়া বদ্‌লালে শরীরটা শুধ্‌রে যাবে। এতে আর চিন্তা কি মা? লোকের পিতামাতা ত চিরকাল থাকে না। এখন থেকে নিজের সংসার বুঝে না নিলে পর, বড় কষ্ট পেতে হবে মা।"

প্রভার চক্ষে জল আসিল। অভিমানে আরক্ত-ইন্দীবর-বিনিন্দিত চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, প্রভা কাঁদিতে লাগিল।

"ছিঃ মা! তুমি কাঁদছ কেন, আমরা ত একবারে যাচ্ছি না, আমরা মাস ছয়েকের মধ্যে ফিরে আসব এবং এই যাত্রায় তীর্থ পর্য্যটন করবো মনস্থ করেছি। ভয় কি সুরেশ রহিল, তোমার কৈলাস দাদা রহিল, তিনি তোমাদের দেখবেন, আর আমরা সপ্তাহে সপ্তাহে পত্র লিখিব।"

এমন সময়ে অবিনাশ বাবু সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও বলিলেন—"পাগলী বুঝি আবদার ধরেছে।"

"প্রভা বলছে সে এখানে একলা থাকতে পারবে না, ও আমাদের সঙ্গে যেতে চায়।"

"সেকি মা, এমন অন্যায় আবদার কেন?"

প্রভা বলিল না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, তোমরা যেও না।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সস্নেহে কন্যার পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইয়া বলিলেন—'মা, তোমাকে রামায়ণ, মহাভারত পড়াইয়াছি, তাহাতে কি দেখ নাই; স্বামী পরম গুরু, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য গতি নাই। যতদিন অবিবাহিত ছিলে, ততদিন যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতে, এখন তোমাকে তাঁহার কথামত চলিতে হইবে। মা! সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তীর কথা ভাবিয়া দেখ; বিশেষতঃ তুমি পবিত্র হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; তোমার মুখে ও কথা বলা সাজে কি মা।"

যৌবনোন্মুখী প্রভা পিতার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। তিনি পিতার স্বভাব ভালরূপ অবগত ছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা না করিয়া ছাড়েন না। প্রভা নিরুত্তর হইল।

এমন সময়ে বাহির হইতে কে ডাকিল—"মা।"

কর্ত্রীঠাকুরাণী সে স্বর চিনিতে পারিলেন। প্রভা ঘোমটা দিয়া দূরে সরিয়া বসিল। গৃহিণী বলিলেন—"এস বাবা, ভিতরে এস।"

সুরেশ চন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, আজ কেমন আছেন?"

গৃহিনী বলিলেন—"আজ বেশ ভাল আছি, কবিরাজি ঊষধটার বেশ উপকার হয়েছে।"

সুরেশচন্দ্র বলিল—"ঈশ্বর তাহাই করুন, আপনি শীঘ্র নিরাময় হউন।" তা যদি এখানে থেকে উপকার হল, তাহালে আর পশ্চিমে যাওয়ার প্রয়োজন কি?

অবিনাশ বাবু এইবার কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন—'সুরেশ, হাওয়া বদ্‌লান চাই বই কি, তোমার মার যে অসুখ, তাতে হাওয়া বদ্‌লান বিশেষ কর্ত্তব্য। বোধ হয়, ইহাতে তুমি অমত করিবে না।

সুরেশ চুপ করিয়া রহিল, এ কথার কি উত্তর দিবে, তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না। হাজার হউক জামাই ত বটে, পরের ছেলে কি না।

অবিনাশ বাবু বলিলেন—দেখ সুরেশ, আমি মনে করিয়াছিলাম, কোন বড় লোকের ছেলে দেখিয়া কন্যার বিবাহ দিব। কিন্তু আজ কালের বাজারে বড় লোকের মধ্যে সচ্চরিত্র পাওয়া দায়। যাহা হউক, তোমার শিক্ষা, সৌজন্য ও বিনয় দেখিয়া আমি তোমার

সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছি। কিন্তু সাবধান, ভবিষ্যতে যেন তোমার চরিত্রে কোন কলঙ্ক না হয়। আমি মনে করিয়াছিলাম, পশ্চিম হইতে আসিয়া বিষয়াদির বন্দোবস্ত করিব কিন্তু কি জানি কখন কি ঘটে, তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হওয়া ভাল। আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক তোমার ও প্রভার নামে এবং আর অর্দ্ধেক আমার দুই পুত্রের নামে উইল করিয়াছি। এই দেখ তাহার নকল; বলিয়া অবিনাশ বাবু সুরেশের হস্তে একখানি কাগজ দিলেন।

সুরেশ অত্যন্ত মনোনিবেশের সহিত সেখানি পাঠ করিলেন, পড়া শেষ হইলে তাহার মুখে প্রচুর পরিমাণে আশা ও আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। অবিনাশ বাবু পুনরায় বলিলেন, দেখো সাবধান, তুমি আজ হইতে এতবড় জমিদারির মালিক হইলে, মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া কাজ করিও; যেন কুসংসর্গে মিশিয়া অধঃপাতে যাইও না। আর দুঃখীর দুঃখ মোচনে নিয়ত চেষ্টা করিও। মানুষকে ঘৃণা করিও না। দেখো যেন আমার পূর্ব্ব পুরুষের নামে কলঙ্কারোপ না হয়।

সুরেশ অবনত মস্তকে সমস্ত শুনিলেন ও চুপ করিয়া রহিলেন।

অবিনাশ বাবু স্বীয় কন্যা প্রভার প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"মা প্রভা!—স্বামীই রমণীর শ্রেষ্ঠ দেবতা. তাঁহাকে ভক্তি করিও. দেখ যেন কখনও তাঁহার অনাদর করিও না। স্বামী ভিন্ন নারীর আর অন্য গতি নাই। সুতরাং স্বামীব্রত, ধর্ম্মাচরণ বলিয়া স্বতন্ত্র কিছুই নাই; পতি ভক্তিই রমণীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। মা! তুমি বুদ্ধিমতী, বোধ হয় আর তোমাকে অধিক বলিতে হইবে না। আশীর্ব্বাদ করি, চিরদিন স্বামীর সেবায় অতিবাহিত করিও।

তৎপরে তিনি পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আগামী শুক্রবার শুভদিন আছে, অতএব সেই দিনেই আমরা তীর্থযাত্রা করিব। বোধ হয় ৪ ৫ মাসের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।

এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল "উকিল বাবু আসিয়াছেন।" অবিনাশ বাবু ও সুরেশ চন্দ্র বাহিরে গমন করিলেন।

ক্রমশঃ।

বৃদ্ধা রমণী।

(১)

ওহে মূঢ় নরকুল, কিবা মোহে প্রেমাকুল,
চেয়ে দেখ দীনহীন নারীর বদন।
গোলাপ-আনন যার শোভার আধার ছিল
ঘৃণার পুতলী এবে কর নিরীক্ষণ
যাহার সৌন্দর্য্যে মন হতো অচেতন।

(২)

পলাশ নয়ন বাণে, কত সুখ হতো প্রাণে
চঞ্চল পলক তার রাহু গ্রাসে পড়ি,
চাহেনা আনন্দধারে, যা দেখিয়ে আত্মহারা
পুরুষ হৃদয় সদা মগ্ন মোহ-ঘোরে,
নাই সে সৌন্দর্য্যরাশি গেছে চিরতরে।

(৩)

গর্ব্বিত সধবা যারা সৌন্দর্য্যের অহঙ্কারে
তারা এই বৃদ্ধা ভাব কর বিলোকন,
অসার গরব জ্ঞান ত্যজি আত্ম অভিমান
চিরস্থায়ী ধর্ম্মধন কর সংরক্ষণ,
প্রকৃত সৌন্দর্য্য-হবে হবে সুশোভন।

(৪)

কুঞ্চিত কুন্তল রাশী মারুত হিল্লোলে ভাসি
সুবাসে হরিত প্রাণ স্বর্ণ দেহে মিশি,
তাহে চূণ-কালি দিয়ে কে যেন দিতেছে কয়ে
অত্যাশ্চর্য্য পরিণাম ভাব ধরাবাসী,
দু'দিনেই ছাড়খার হয় রূপ রাশি।

(৫)

দুর্গন্ধ পুরিষ ভরা কৃমি কীট রমণীরা
হয় কি মানব ভোগ্য ভাব একবার,
তাহে পুনঃ শক্তি ক্ষয়, পরমায়ু হ্রাস পায়
দেব, ধর্ম্ম, উচ্চ আশা হয় সার যার—
এ ঘৃণ্য সুভোগ্য বস্তু নহে সে সবার।

(৬)

অস্থায়ী ভবের সুখ লভিবারে এত দুঃখ
কেন ভোগ ওরে জীব, মানব জীবনে
আছে এক উচ্চ কাজ নাহি তাহে ঘৃণা লাজ,
পবিত্র বিশুদ্ধ শক্তি পাইবারে প্রাণে—
মনেপ্রাণে ডাক সেই ভকত জীবনে॥

শ্রীবিপিন চন্দ্র চৌধুরী।

সংবাদ ও সমালোচনা।

"হিন্দুসমাজ"। এইনামীয় একখানি মাসিক পত্রিকা আমরা পাইয়াছি। কয়েক জন প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, অধঃপতিত হিন্দুসমাজের অন্তর দুর্দশা দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে এই উপাদেয় মাসিকপত্র খানির প্রচার করিয়াছেন। অনেক উপদেশ পূর্ণ, আবশ্যকীয় প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য অতি সৎ ও মহৎ, কিন্তু হায়! এ অধঃপতিত সমাজের কি আর উন্নতি হইবে? হিন্দুসমাজের কথা ভাবিলে বাস্তবিক বুক ফাটিয়াযায়! ইহার উদ্ধার সাধনের চেষ্টা যাঁহারা করেন, সে সকল মহাত্মার নিকট আমরা চিরঋণী। নবীন সহযোগী দীর্ঘজীবী হউন, পরিচালকবর্গের আশা পূর্ণ হউক, আমরা ভগবানের নিকট কায়মনে ইহাই প্রার্থনা করি।

নন্দিনী। একখানি মাসিক পত্রিকা, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস গুপ্ত মহলানবীশ কর্তৃক সম্পাদিত ১ নং ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, শিবপুর পোষ্ট, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। আমরা এই নব প্রকাশিত মাসিক পত্রের পাঁচ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, পাঠে যতদুর জানা গেল—তাহাতে নন্দিনী পরিচালন কার্য্যে ভবিষ্যতে খুব ভাল হইবারই আশা করিতে পারা যায়। সম্পাদক মহাশয় এ কার্য্যে নূতন ব্রতী হইলেও সম্পাদন কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতেছেন। ইহার অনেক প্রবন্ধই সুপাঠ্য। আমরা নবীন সহযোগিনীর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

নিষ্ঠাবান। এবার বড়লাটের ভারত সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছেন—আমাদের বদান্যবর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নসিপুরাধিপতি মাননীয় মহারাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর। উপযুক্ত পাত্রেই ভার ন্যস্ত হইয়াছে। মহারাজ এই কার্য্যে যশোযুক্ত হউন ইহাই প্রার্থনা। এবার আলোচনার সহিত মহারাজার একখানি সুন্দর প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

প্রার্থনা ও সাধনা।

মা বিনে মোর কিছুই নাই।

মা বিনে মোর্ কিছু নাই,—
মাই মোর সম্বল।
শুধু বালি ভব-মরু, মা মোর তায় পান্থ-তরু,
একি মাত্র ছায়া জল, প্রাণ জুড়ানো স্থল ;
মাই মোর সম্বল।
চাওয়া মাত্র মার পানে, শান্তি পাই যে শুষ্ক প্রাণে
মাই আমার ক্ষুধার অন্ন, মাই আমার তৃষ্ণার জল
পাই দেহে বল,
মাই মোর সম্বল।
দয়াময়ীর নাম বলে, শুকনো ডালে ফল ফলে,
শুকনো গাঙে বন্যা আসে, মরা মানুষ উঠে বসে,
এমনি নামের বল,
মাই মোর সম্বল।
মা যদি মোর ফিরে চায়,
মূখ খুলে মূখ নাচে গায়,
আনন্দ না ধরে তায়, পঙ্গু গিরি লঙ্গে' যায়
দেহে পেয়ে বল,
মাই মোর সম্বল।
যদি পাই মায়ের পাশ, নাহি চাহি স্বর্গবাস,
মাকে-পেলে নরক ভাল, নরকানল শান্তি জল,
শান্তিময় স্থল,
মাই মোর সম্বল।

শ্রীজগবন্ধু চৌধুরী।

বিজনে।

(আলাইয়া—একতালা)

—•: :•—

(আমি) বিজনে করব্ সাধনা
কেবল বিজনে যুগলচরণের অনিবার
স্মরণ কামনা।
চির আকাঙ্ক্ষিত যুগল চরণ,
মানস-বিজনে বসাব যখন,
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভেসে যাবে মন
ঘুচিবে প্রাণের যাতনা।
নাহি ভালবাসি জন কোলাহল,
তাহে চিত্ত কেবলি চঞ্চল,
কোথা হ'তে আসি, দুঃখ বিঘ্নরাশি'
শেষে, বিনাশে মনের বাসনা।
বিজনে মথিয়ে ভাবের সিন্ধু,
তুলিব বিবিধ রতন ইন্দু,—
নিবেদিয়ে, পদ সুধার বিন্দু—
পিয়ে, যাবে বিষয়-ভাবনা।
ডাকিতে ডাকিতে ভক্ত সঙ্গ পেলে
প্রেম আলিঙ্গনে লব কোলে তুলে,
ভক্ত সহ মিলি, দিয়ে করতালি'
বাজাব প্রেমের বাজনা।

দীন— শ্রীরসিক লাল দে।

পুষ্পাবতী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজা অভয়সিংহ।

ক্ষত্রীয় যুবক রাজা অভয়সিংহ শেখর রাজার নিকট হইতে আসিয়া এক সভা আহ্বান করিলেন এবং বৃদ্ধ পাত্র মিত্রদিগের নিকট রাজ্য রক্ষার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। এক জন অতি বৃদ্ধ মন্ত্রি বলিলেন—"আপনার পিতামহের সময় হইতে আমি রাজকার্য্য দেখিতেছি, চিরকাল জোতারামের সঙ্গে বিবাদ। চিরদিন জোতারাম এই রাজ্য গ্রাস করিয়া নিজের উদর পূর্ণ করিবার জন্য সচেষ্ট, কিন্তু এতদিন আর তাহা হয় নাই। এখন সে দেখিতেছে যে বালক রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাই শীঘ্র এই রাজ্যের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাবে। আমাদের সৈন্য সংখ্যা অল্প, ক্ষুদ্ররাজ্য, জয়পুরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'তে পারি এমন ক্ষমতা নাই। তবে জোতারামের বুঝা উচিত যে সিংহের বাচ্চা সিংহ হয়, শৃগাল হয় না। রাজা অভয়সিংহ তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ হইতে নিকৃষ্টরূপে অসি ধারণ করেন না। তথাপি আমাদের কৌশল অবলম্বন করাই উচিত।" একজন যুবক উঠিয়া বলিলেন—"এ অবস্থায় আবার কৌশল কি? আমরা আত্মরক্ষার জন্য সকলেই অস্ত্র ধারণ করবো। আমার মত এই যে, আমরা আরও সৈন্য সংগ্রহ করি।" যুবক উপবেশন করিলে আর একজন বৃদ্ধ অমাত্য বলিলেন—"রাজস্থানে এমন সুন্দর রাজ্য নাই, ইহা ক্ষুদ্র বটে কিন্তু শস্য পূর্ণভূমি—শ্যামল দুর্ব্বাদল আর কোথায় পাওয়া যায়? এমন স্বর্ণভূমি সহজে কেহ ছেড়ে দেয় না। আমরা যে ভাবেই হউক এ ভূমি রক্ষা কর্‌বো। অসহায়ের ও দুর্ব্বলের সহায় স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি আমাদিগকে রক্ষা কর্‌বেন।" এই সব কথা শুনিয়া রাজা সেনাপতি মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, মহীসিংহ বলিলেন "যুদ্ধ ব্যতীত কোন উপায় দেখ্‌ছি না। আদেশ হ'লেই আমি আরও সৈন্য সংগ্রহ করি ও তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করি। রাজা অভয়সিংহ যে স্থানে সিংহাসনে উপবিষ্ট, সে স্থানে ভয়ের কোন কারণ নাই।" রাজা অভয়সিংহ সব শুনিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—"আপনারা সকলেই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক কেহ নাই,ইহাই আমার বিশ্বাস, তাই আজ আমার মনের কথা বল্‌ছি। যুদ্ধ আমি ভালবাসি, বীরের সন্তান বীরই হয়,সে পথ অবলম্বন করিতে আমার দ্বিধা নাই কিন্তু বিবেচ্য এই যে জয়পুর রাজধানীর সৈন্যের নিকট কি আমরা দাঁড়াইতে পারিব? তাহারা সুশিক্ষিত, তাঁহাদের রীতিমত অস্ত্র শস্ত্র আছে, তাহাদের বন্দুক কামান আছে, আমাদের কি আছে? আমাদের সম্বল তরবার ও বর্শা। অতএব কৌশল অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। আমি সে উপায়ও স্থির করেছি। আমি জনৈক পিতৃবন্ধুর নিকট পরামর্শ পেয়েছি, তাঁহার সদুপদেশ আমার মনোনীত হ'য়েছে।

এক্ষণে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি, আপনারা সে বিষয় অনুমোদন করেন কি না। আজ-কাল ইংরেজগণ ভারতের সম্রাট, তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধে কেহই অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। তাঁহাদের আদেশ লঙ্ঘন করে, এমন কেহ ভারতে আজ কাল নাই। উঁহারা দয়ালু, পর-দুঃখকাতর, সদ্বিচারক। আমি তাঁহাদের আশ্রয় লইতে চাই।" বৃদ্ধ মন্ত্রি তখন আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—"আমি এ মতের সমর্থন করি। আমি ও শুনেছি ইংরেজ-গণ ন্যায় বিচারক। আমাদের যে অপরাধ নাই, তাহা বেশ বুঝ্‌তে পারবেন। তাঁহা-দিগকে পত্র লেখা হ'ক।" রাজা বলিলেন "পত্র লেখা হ'য়েছে. সে জন্য আর চিন্তা নাই।"

ইহার পর সভা ভঙ্গ হইল, রাজা সন্তুষ্টচিত্তে বিশ্রামাগারে গেলেন। বিশ্রামাগারে নানাবিধ ছবি টাঙ্গান আছে—অধিকাংশই মেনকা, উর্ব্বশী রম্ভা, শকুন্তলা, প্রভৃতির ছবি। রাজা শয্যায় শয়ন করিয়া ঐ সব ছবি দেখিয়া বলিলেন—বস-ন্তোৎসবে যে বালিকাকে দেখেছি, তার সঙ্গে এদের কাহার তুলনা হয়?" তিনি সমস্ত ছবি-গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে লাগিলেন, অবশেষে বলিলেন—'না, সে যেন ব্রীড়াবনত-মুখী আর ইহারা সকলেই যেন প্রগল্‌ভা, বসন্তের রাণী ঠিক যেন বসন্তেরই রাণী" এই বলিয়া যে স্থানে কাম ও রতির ছবি ছিল, সে স্থানে উঠিয়া গেলেন, এবং রতির সুন্দর মুখ খানি দেখিয়া বলিলেন,—এই মুখের সঙ্গে কতকটা তুলনা হয়। কিন্তু বালিকাটী কে?"—এই বলিয়া আবার শয়ন করিলেন, দুটি দাসী দুটি পাখা হস্তে লইয়া আসিয়া দুই ধারে দাঁড়াইল, তিনি বলিলেন—এখন যাও, আর দরকার নাই।" তাহারা চলিয়া গেল। রাজা মনে মনে বলিলেন" এই ভীলদের মধ্যে এ স্বর্ণলতা কোথা থেকে এল? আর একবার দেখতে হবে, কিন্তু এখন ত সময় পাচ্ছি না। চারি দিকে শত্রু। পিতার মৃত্যুর পর হইতে আমার আর শান্তি নাই। যদি এই গোলমাল মিটে যায়, তবে আবার আমি আরাবলি পর্ব্বতে যাবো। বালিকাটী দেখিবার জিনিষ বটে, দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়। রাজার আজ কিছুই ভাল লাগতেছিল না, কতক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কুটীরে।

অশ্বারোহী সন্ন্যাসীর কৃপায় বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে অগ্রসর হইলেন। অনেক পথ চলিয়া গেলেন, রাস্তা যেন ক্রমেই পর্ব্বত-সঙ্কুল পাদপ-আচ্ছা-দিত হইয়া এই রজনী যোগে চলিবার অনুপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একে রাত্রিকাল, তাহাতে আবার পথ সুপরিচিত নহে, পথিক আর যাইতে পারিলেন না। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন—ইহাই তাহার ভাবনার বিষয় হইল। এই সকল স্থানে যে বসতি আছে, তাহা তাঁহার বোধ হইল না কোনরূপ আলোকও তিনি দেখিতে পাইলেন না। তখন অশ্বের

গতি তাহার প্রতি অর্পণ করিয়া, নিজে চুপ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন, অশ্ব মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে একটি অস্পষ্ট আলোক দেখা গেল, পথিক তখন আশান্বিত হইয়া আলোকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হঠাৎ আলোক অদৃশ্য হইল। তিনি মনে করিলেন আলেয়া দেখিয়াছেন, আবার একটু পরেই আলো দেখা গেল। তিনি অশ্বের গতি সেই দিকে ফিরাইলেন। যতই যান, ততই যেন আলোক সরিয়া যাইতে লাগিল, তিনি তখন বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু উপায় নাই, এক স্থানেত আশ্রয় লইতেই হইবে, আবার সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া সেই দিকে চলিলেন। প্রায় একমাইল পথ চলিবার পর দেখিলেন কয়েকটি বড় বড় বৃক্ষের মধ্যস্থলে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর, সেই কুটীরে আলো জ্বলিতেছে। কুটীরটি অস্পষ্ট আলোকে ঠিক বুঝা যাইতেছে না। অনুমান করিয়া লইলেন।

তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বটিকে একটি বৃক্ষে আবদ্ধ করিলেন, তার পর ধীরে ধীরে কুটীরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া, ফাঁক দিয়া দৃষ্টি করিলেন। অনেকক্ষণ কিছু দেখিতে পাইলেন না, তার পর দেখিলেন একটি বালিকা আলোকের নিকট বসিয়া একখানি বস্ত্র সেলাই করিতেছে, কুটীরে অপর কোন লোক নাই। তখন পথিক আর এক সমস্যায় পতিত হইলেন, একাকিনী বালিকার নিকট কেমন করিয়া উপস্থিত হইবেন। কিন্তু নিরুপায় ভাবিয়া দ্বিধা করিলেন না, দ্বারে করাঘাত করিলেন।

বালিকা চমকিয়া উঠিয়া বলিল—এত শীঘ্র এসেছ,—সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, কিন্তু সম্মুখে এক সশস্ত্র সুন্দর যুবককে দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইল। পথিক দেখিলেন—বালিকা পরমাসুন্দরী, কিন্তু অযত্নে প্রতিপালিতা, পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র, গাত্রে কোন অলঙ্কার নাই। তিনি বালিকাকে আশ্বস্ত হইতে বলিলেন—আমি রাজপুত, আমার দ্বারা স্ত্রীলোক ও বালকের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। আমি পথ ভ্রান্ত পথিক, রজনীযোগে কোথায় যাব, তাই তোমার এই কুটীরে অতিথি, যদি চলে যেতে বল, কোন বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন কর্‌বো। বালিকা কি ভাবিল, তার পর বলিল—আপনি আসুন, বাহিরে বিপদ হ'তে পারে। যুবক কুটীরে প্রবেশ করিয়া একখানি কাষ্ঠাসনে বসিলেন. বালিকা মৃত্তিকায় উপবেশন করিল। যুবকের মনে হইল এমন সুন্দরী রাজধানীতেও দেখা যায় না, বনে কেমন করিয়া জন্মিল। তার পরে বলিলেন,—তুমি বনে কেমন করে আছ? আর তোমার কে আছে। বালিকা অনায়াসে উত্তর করিল—"আমি একাকিনী নই, আমার মা বাহিরে গিয়াছেন, শীঘ্র আস্‌বেন, বাবা কখন আস্‌বেন বল্‌তে পারি না। তিনি কখনও রাত্রে আসেন, কখনও বা আসেন না, কখনও দুই তিন দিন পরে আসেন।" বালিকার কণ্ঠস্বর. অতি মধুর, যুবক সেই অমিয় পান করিতেছিলেন। তিনি বুঝিলেন—বালিকা কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা, বোধ হয় কোন কারণে তাহার পিতা মাতা গোপনে অরণ্যে বাস করিতেছেন। বালিকার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ

কি চতুর্দ্দশ হইবে। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"তোমার নাম কি? তোমরা এমন স্থানে বাস কচ্ছ কেন?" বালিকা উত্তর করিল—আমি বাল্যাবধি পিতা মাতার সঙ্গে এখানে বাস কচ্চি,কেন বাস কচ্ছি,তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার নাম লীলাবতী।" এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে কে আবার দ্বারে করাঘাত করিল। বালিকা দৌড়াইয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া বলিল—"মা! কে একজন রাজপুত অতিথি এসেছেন, তুমি শীঘ্র এস।" একটি প্রৌঢ়া রমণী বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিল, দেখিল একটী সুন্দর পরিচ্ছদধারী যুবক কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছেন। যুবক তাহাকে দেখিয়াই আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন—মা! আমি বড় বিপদে পড়ে আপনাদের আশ্রয় নিয়েছি। নইলে এই রাত্রে আপনাদিগকে কষ্ট দিতেম না। আমি পথভ্রান্ত, রাত্রে কোথায় আশ্রয় লইব,সেই চিন্তায় বিভোর হইয়া চলিতেছিলাম, ভগবানের কৃপায় এই আলোক দেখে আমি এইদিকে এসেছি। আপনার কন্যা আশ্রয় দিয়াছেন, এখন আপনার যেরূপ অভিপ্রায় হয়।" স্ত্রীলোকটী বলিলেন,—আমাদের এ বনে কেহ কখনও আসে না, আপনি প্রথম অতিথি। এই বালিকার পিতার ইচ্ছা নয় যে, কেহ তাঁহার পর্ণকুটীরে উপস্থিত হয়,তিনি বরং বিরক্ত হইবেন। আমি এই কন্যা নিয়ে একাকিনী আছি,আপনিও বিপদে পতিত। যা হ'ক, আর কোন উপায় নাই, আপনিও আজ রাত্রি থাকুন, কল্য প্রত্যূষে উঠে চ'লে যাবেন।" এই বলিয়া অতিথির সম্মুখে নানারূপ আহার্য্য, যাহা এই দরিদ্রদের কুটীরে সম্ভব, তাহা স্থাপন করিল। অতিথি তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া বলিলেন—"মা! আপনারা এস্থানে বিশ্রাম করুন, আমি বাহিরে এক বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন কর্‌বো।" পথিকের এই কথা শুনিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন—এই কুটীরের সংলগ্ন একটি পত্রের চালা আছে, তাহাতে আমাদের গরু থাকে, তাহার পার্শ্বে যে স্থান আছে,তাহাতেই আমরা দুজনে থাকতে পার্‌বো, আপনি এই ঘরে থাকুন। পথিক কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন—তা হ'তে পারে না, আমি সেই স্থানে যাচ্ছি, আপনারা এখানে থাকুন। আমি পুরুষ, যেখানে ইচ্ছা থাকিতে পারি,আমার কোন ভয়ের কারণ নাই, কিন্তু আপনাদের ভয় যথেষ্ট আছে, আপনাদিগকে দেখিলেই অনুমান হয়,একসময়ে আপনারা উচ্চাসনে সমাসীন ছিলেন, দৈবের কারণে এই অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে কখনও কষ্ট করেন নাই, এখন যথেষ্ট কষ্ট করিতেছেন। তথাপি এই বনের মধ্যে দস্যু তস্করের ভয় অধিক, আপনাদের সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। আপনারা অদ্য নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান, আমি বাহিরে থাকিয়া পাহারায় নিযুক্ত থাকবো। এই বলিয়াই পথিক উঠিলেন এবং বাহিরে গিয়া একটি স্থান পরিষ্কার করিয়া তাহাতে খড় বিছাইয়া শয়ন করিলেন। এই অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হাস্যের উদয় হইল, বহু কষ্টে তাহা সম্বরণ করিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মাতা তখন কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কন্যাকে বলিলেন,—লীলা! এ পথিক

কতক্ষণ হ'ল এসেছে? লোকত ভাল বোধ হচ্চে।" মেয়ে উত্তর করিল—তুমি আসিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে এসেছে। এ ভদ্রলোক নিশ্চয়, দস্যু নয়। তুমি সন্দেহ করোনা। তখন উভয়ে শয্যায় শয়ন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দস্যুহস্তে।

পথিক নিদ্রায় বিভোর হইলেন। যখন রজনী প্রায় তৃতীয় প্রহর, তখন একটি কোলাহলে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিলেন যে কুটীরের দ্বারে চারি পাঁচ জন লোক সমবেত হইয়াছে. সকলের হস্তেই মশাল ও অস্ত্র। তখন বুঝিলেন—দস্যুরা কুটীর আক্রমণ করিয়াছে। সামান্য কুটীরবাসীদের কি অর্থ আছে যে, দস্যুদের লোভ হইল? এই প্রশ্ন তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল. কিন্তু তখনই মনে হইল, একটি রত্ন এই কুটীরে আছে, হয়ত সেই লোভে উহারা আসিয়াছে। তখন অসি হস্তে বাহির হইলেন, এবং বিনা বাক্যব্যয়ে উহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপ আক্রান্ত হইবে, দস্যুদের ধারণা ছিল না, দস্যুরা জানিত এ কুটীরে পুরুষ কেহ নাই, তাই নিশ্চিন্ত হইয়া লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিল। কুটীরে তৈজসপত্র সামান্য ছিল, কিন্তু দস্যুদের সন্দেহ ছিল, কোন স্থানে লুক্কায়িত ধন আছে, অতএব সমস্ত কুটীর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। লীলাবতী ভয়ে এক কোণে বসিয়াছিল, দস্যুরা তাহার হস্তপদ বন্ধন করিল, প্রৌঢ়াকে কিছু বলিল না। পথিক এই অবস্থায় আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া কুটীরের বাহিরস্থ লোকদিগকে ভীষণ বেগে আক্রমণ করিলেন, এক জন ভূমিতে পতিত হইল, আর কয়েকজন ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। তখন তিনি কুটীরে প্রবেশ করিলেন. তথায় মাত্র দুইজন লোক ছিল, সহজে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া তিনি লীলাবতীর বন্ধন খুলিয়া দিলেন। দস্যু দুটি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া পলায়ন করিল। পথিক বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন কেহই আর নাই, তখন আবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রৌঢ়াকে সান্ত্বনা করিলেন। প্রৌঢ়া বলিলেন,—বাবা! তোমার জন্য আজ আমাদের জীবন, ধন, মান, সব রক্ষা হ'ল। তুমি চিরজীবি হয়ে থাক। আজ যদি লীলার পিতা এখানে থাকৃতেন—এই কথা বলিতে বলিতেই একজন দীর্ঘাকার পুরুষ কুটীরে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন—একজন অপরিচিত ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে. তিনি বিস্মিত হইয়া প্রৌঢ়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। মেয়েটি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া আসিয়া বলিল—বাবা তুমি এসেছ? আজ যে বিপদ, ডাকাত পড়েছিল। এই ভদ্রলোক অতিথি আমাদিগকে রক্ষা করেছেন। ডাকাতেরা আমাকে বেঁধেছিল। পুরুষটি মেয়েকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া নিজের স্ত্রীকে বলিলেন—কি ঘটনা হয়েছে, ইনি কোথেকে এলেন।" স্ত্রীলোকটি উত্তর করিলেন—"গত সন্ধ্যার পর ইনি পথ হারাইয়া এখানে উপস্থিত হন, আহা-

রাদির পর বাহিরে গোশালে শয়ন করেন, প্রত্যুষে চলিয়া যাবেন, হঠাৎ রাত্রে কতকগুলি দস্যু আমাদিগকে আক্রমণ করে ও লীবাবতীকে বন্ধন করে, ইনি তখন উহাদিগকে আক্রমণ করেন ও তাড়াইয়া দেন। ইনি না থাকিলে আজ আর আমাদিগকে দেখ্‌তে পেতেন না। এতক্ষণ পথিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন.এখন অবসর বুঝিয়া বলিলেন—"তবে আমি বাহিরে যাই, রাত্রি প্রায় শেষ হইল—আমি একটু পরেই রওনা হইব।" পুরুষটি আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—রাজপুতেরা অকৃতজ্ঞ নয়। আপনি আমার স্ত্রীর ও কন্যার প্রাণ রক্ষা করেছেন, আজ এখানে থাকুন, কাল যাবেন। "পথিক বলিলেন—আমার জরুরি কার্য্য আছে, নতুবা থাকিতে আর আপত্তি কি ছিল?', কিন্তু রাজপুত বীর কিছুতেই ছাড়িলেন না, বলিলেন মধ্যাহ্নের পর যাবেন।" পথিক হঠাৎ লীলাবতীর দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন—সে চক্ষু দুটি যেন তাঁহাকে থাকিতে বলিতেছে। তিনি আর আপত্তি করিতে পারিলেন না।

পথিক তখন বাহিরে গেলেন, এবং নিজ শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। ভোর হইলে উঠিয়া নিজের অশ্বটির অনুসন্ধান করিলেন ও তাহাকে বৃক্ষ হইতে খুলিয়া আনিয়া—ঘাস ও জল দিলেন। গৃহস্বামী মৃগমাংস আনিয়াছিলেন, তাহাই রন্ধন হইল। আহারাদির পর গৃহস্বামী বাহিরের সেই গোশালায় আসিয়া পথিকের নিকট বসিলেন। পথিক বলিলেন—"আমি ত চ'লে যাচ্ছি। কিন্তু যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আপনার পরিচয় দিবেন কি? এই বনের মধ্যে অসহায় অবস্থায় বাস কচ্চেন কেন?" গৃহস্বামী কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"আপনার পরিচয় দিবেন কি? আমার অনেক শত্রু, তাই ভয় হয়, কাহাকে কি বলি।" পথিক বলিলেন—"আমার পরিচয় দিতে কোন আপত্তি নাই। আমি সামোদের ঠাকুর বেহারী সানের পুত্র মথুরা সান, কোন কার্য্যোপলক্ষে শেখাবতী গিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় এইরূপ বিপদে পতিত হইয়া আপনাদের দ্বারে অতিথি হ'য়েছি।" এইকথা শুনিয়াই গৃহস্বামী আনন্দিত হইয়া মথুরা সানকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"বেহারী সান আমার এক সময় বন্ধু ছিলেন, এখন আমি অর্থহীন ও সহায় হীন। যাহ'ক তোমাকে বল্‌তে কোন বাধা নাই, আমি শেখাবতীর একজন ঠাকুর, সুজাওন খাঁর অত্যাচারে দেশত্যাগী হ'য়েছি। আমার বোধ হচ্চে, তাহারই লোক গত রাত্রে আমার এই নির্জ্জন কুটীর আক্রমণ করেছিল। যখন তাহারা টের পেয়েছে, তখন আর আমার এখানে থাকা হবে না। অন্যত্র যাবো। ওদের উদ্দেশ্য ছিল লীলাবতীকে হরণ, ভগবান রক্ষা করেছেন। তুমি সময়ে সব জান্‌তে পার্‌বে, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর মথুরা সান অশ্বারোহণে রওনা হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রূপা।

রূপা অন্তঃপুরের প্রধানা দাসীমাত্র হইলেও মহারাণীও তাহার কথা অবহেলা করিতে সাহসী হইতেন না। অন্তঃপুরের অন্যান্য লোকে রূপার ভয়ে অস্থির হইত। রূপা শাসন করিতে জানিত—রূপা মিষ্ট কথা দ্বারা লোককে বশ করিতেও জানিত। স্বয়ং মহারাজ কুমার রূপাকে ভয় ও ভক্তি করিতেন। রূপা কুমারকে প্রতিপালন করিয়াছিল, ক্রোড়ে করিয়া রাখিত—তাই রূপাকে তিনি এত ভালবাসার চক্ষে দেখিতেন। তবে বাহিরে ও অন্দরের লোকে তাহার প্রতি যথেষ্ট অসন্তুষ্ট ছিল। রূপা তাহা বুঝিত—যত দিন সে ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারে, তাহা সে করিবে। জোতারামের নিকট রূপা পরাজিত ছিল। জোতারাম যাহা বলিত তাহার অন্যথা করা রূপার ক্ষমতা ছিল না।

রাত্রি এক প্রহর অতীত, শশাঙ্কদেব আকাশে উদয় হইয়া হাসিতেছেন, কোন স্থানে একটুও মেঘের সঞ্চার নাই। সুনীল আকাশ আজ বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। এমন সময়ে মহারাণী একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। বাতায়ন খোলা আছে—চাঁদের কিরণ তন্মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া মহারাণীর বক্ষে পতিত হইয়া সুন্দর অমলধবল করিয়া তুলিয়াছে। কুমার অন্য একটি কক্ষে নিদ্রিত। মহারাণী তাই একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতেছেন। সংসারের নানা খেলা ত তিনি দেখিলেন, এখন কি কর্ত্তব্য? রাজ্য তিনি পরিচালনা করিতেছেন—জোতারামও রূপা তাঁহার দুই হস্ত। উহাদিগকে নিজ আয়ত্তাধীনে রাখিতেই হইবে। আজকাল ইংরাজগণ ভারতবর্ষে যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে হস্তগত করিতে হইবে। কিন্তু বেহারী খানকে কোন রূপে জব্দ করাও চাই, এমন কি যদি তাঁহার জায়গীর হইতে দূর করিয়া দেওয়া যায়, তবেই মঙ্গল; নতুবা একদিন সে মস্তক তুলিতে পারে। সর্ব্বাগ্রে তাঁহার বিনাশ সাধন দরকার। এই রূপ চিন্তা করিয়া তিনি রূপাকে ডাকিলেন, রূপা তৎক্ষণাৎ আসিয়া মহারাণীর পায়ের নিকট বসিল। মহারাণী একটু হাসিয়া বলিলেন—"রূপা! জান ত আমাদের কত প্রতিবন্ধক পার হতে হচ্চে, এখনও যে একটা বিঘ্ন আছে, সে বিঘ্ন দূর করিবার কি উপায়?" রূপা নিতান্ত নম্র ভাবে বলিল "আমরা প্রাণপণে আপনার হিত চেষ্টা কচ্চি। আপনার খেয়ে মানুষ, আপনার যাহাতে মঙ্গল হয়। তাহা দেখবোই। আপনি আদেশ করুন, কি করিলে আপনার বিঘ্ন দূর হয়, যদি এই ক্ষুদ্র প্রাণ দিয়াও সে কার্য্য হয়—তাহা করবো। আমাদের ধন, প্রাণ, সকলই আপনার।" রাণী সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"রূপা! বেহারী খানকে জব্দ না করতে পারলে, আমার শান্তি হচ্চে না, আমি শুনেছি সে ইংরেজদের নিকট গিয়া আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা কচ্চে। এখন সেই উপায় অবলম্বন করে, জোতারামের সঙ্গে পরামর্শ কর তাঁহার মাথায় সমস্ত বুদ্ধি আনবে।" রূপাও তাহাই চায়, সে দেখিল ঔষধ ধরিয়াছে, সে পূর্ব্বাপর

যাহা চেষ্টা করিতেছিল, তাহা সফল হইবার উপক্রম হইয়াছে। তখন সে গম্ভীর ভাবে বলিল—"বেহারী সান কি এত দুষ্ট? সে কি আপনার অনিষ্ট করবে? এই রাজ্যের প্রজা, এই অন্নে চিরদিন প্রতিপালিত, সে কি আপনার বিপক্ষে দাঁড়াইবে? আমার যেন বিশ্বাস হয় না।" রাণী ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—"তোর বিশ্বাস না হ'লে কি হবে, আমি যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। তুই একবার জোতারামকে গুপ্ত দ্বার দিয়া নিয়ে আয় দেখি।" রূপা আর বিলম্ব করিল না। একটি আলোক লইয়া গেল, এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে জোতারামকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। জোতারাম সসম্মানে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন, রাণী তাঁহাকে একখানি আসনে বসিতে বলিলেন—তিনি বসিলেন। রাণী বলিলেন—"মন্ত্রি! আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত, আমি জানিতে পেরেছি বেহারী সান আমার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে অনেক বলেছে। আমি এই চাই যে, বেহারী সানকে তাড়াইয়া দেওয়া হউক। জোতারাম বলিলেন—"বেহারী সান এমন কি অপরাধ করেছে? আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, কিন্তু একজন প্রসিদ্ধ ঠাকুরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেই—বহুলোক আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে।" মহারাণী—বলিলেন "আমি অত বুঝি না, আমি জানি আপনার বুদ্ধির নিকট সকলে পরাজিত, আমি যখন ইচ্ছা করেছি, তখন যে কোন রূপেই হউক, তাহা পূর্ণ করিতে হইবে।" রূপা বলিল—"মহারাণী যা বল্‌বেন, আমরা তাই কর্‌বো। এর জন্য আবার দ্বিধা কি? আদেশ সঙ্গত কি অসঙ্গত তা দেখার অধিকার আমাদের নাই।" রূপার কথায় জোতারাম বলিলেন—"তবে কুমারের দ্বারা ভারতের গবর্ণর জেনারল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে পত্র লেখা হউক, যদি ইংরেজরাজ আমাদের হস্তগত থাকেন, তবে আর কোন ভাবনার বিষয় নাই; আর যদি তাহা না হয়, তবে আমরা কৃত কার্য্য হ'তে পার্‌বোনা। রূপা বলিল।"—বেশ, সেই বুদ্ধিই ভাল। এখন এস, তোমাকে রেখে আসি। মহারাণী বলিলেন—' আপনি তবে এখন যান, যখন দরকার হবে, রূপা আপনাকে নিয়ে আস্‌বে।" জোতারাম সসম্মানে অভিবাদন করিয়া বিদায় হইলেন। রূপা একটি আলোক হস্তে অগ্রে অগ্রে চলিল। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ মহারাণী উহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিলেন। তার পর বলিলেন"—জোতারাম রাজ্যের কর্ণধার, জোতারামকে হাতে রাখতেই হবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সামোদ-দুর্গ।

বেহারী সান জয়পুর রাজ্যের একজন প্রধান ঠাকুর। যখন তিনি বাধ্য হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন, তখন তিনি সামোদ-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জোতারাম তাঁহার প্রধান শত্রু—তাঁহার প্রাণ নাশ ও সম্পত্তি নাশ করিতে কৃত

সত্বর তিনি নিজ জায়গীরে আসিলেন। সে স্থানের প্রজারা সকলেই তাহাদের মনীবের প্রতি অনুরক্ত, এমন কি তাহার জন্য প্রাণ দান করিতেও কুণ্ঠিত নহে। বেহারী খানের একমাত্র পুত্র মথুরা খান প্রজারা-রঞ্জক। মথুরা খান বীর পুরুষ এবং সুশ্রী, সৈন্যগণকে ও প্রজাদিগকে স্নেহ করিতেন। কয়েক দিন হইল মথুরা খানকে কার্য্যোপলক্ষে শেখাবতী পাঠান হইয়াছে, এখনও কেন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে না, তাই বৃদ্ধ বেহারী খানের ভয়ানক চিন্তা হইয়াছে। এদিকে জোতারাম তাঁহার বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত করিতেছেন, হয়ত ইংরেজগণের সহায়তায় তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারেন। সামান্য সম্পত্তি লইয়া তিনি বাস করিতেছেন, একমাত্র ক্ষেত্রীর রাজা তাঁহার সহায়। যখন সকল ঠাকুরকে ক্ষমা করা হইল, কেবল ক্ষেত্রীর রাজা ও বেহারী খানকে ক্ষমা করা হইল না, তখনই বুঝা গেল রাজ সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইবে। তিনিও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, এবং একমাত্র পুত্রকে সহায়তা প্রার্থনায় শেখাবতীতে প্রেরণ করিলেন। এদিকে বেহারীখান ইংরেজ গবর্ণমেন্টের নিকটে বিস্তারিত এক আবেদন পত্র পাঠাইলেন। পূর্ব্বে ইংরেজরাজ তাঁহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন সে প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

সামোদ-দুর্গ পরিখা বেষ্টিত, দুর্গটি পাহাড়ের গাত্র হইতে সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত, সহজে যে কোন শত্রু দুর্গে প্রবেশ করিতে পারে, এমন সম্ভাবনা নাই। দুই দিকে দুটি মাত্র দ্বার, তাহাও সন্ধ্যার পরই তুলিয়া রাখা হয়, বিশেষ কারণ ব্যতীত কাহাকেও রাত্রে তথায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। কয়েক জন সশস্ত্র সৈন্য দ্বারের নিকট প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। একটি রক্তবর্ণ নিশান দুর্গের মস্তকের উপর দাঁড়াইয়া বায়ুতে সর্ব্বক্ষণ উড়িতেছে।

বেলা অবসান সময়ে দুর্গের একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া বেহারী খান পুত্রের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এমন সময়ে বাহিরে তুর্য্য ধ্বনি হইল, মথুরাখান দুর্গে প্রবেশ করিলেন এবং অবিলম্বে পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। বেহারীখান পুত্রকে পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মথুরা খান পিতার নিকট সমস্ত বিবরণ বলিলেন, কেবল লীলাবতীর কথা বলিলেন না। এই কথা শুনিয়া বেহারী খান কতক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন, তার পর বলিলেন—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তুমি যে রক্ষা পেয়েছ ইহাই যথেষ্ট, আর তোমাকে এরূপ বিপদে পাঠাবো না। এখন রাজ্যের কি উপায় হল? মথুরা খান উত্তর করিলেন" আমি শেখর রাজার নিকট গিয়েছিলেম, শুনলেম রাজা অভয়সিংহও তাঁহার পরামর্শের জন্য গিয়াছিলেন। ইংরেজদের সহায়তা ব্যতীত রক্ষার আর উপায় নাই। শেখর রাজা স্বয়ংবড়লাট সাহেবের প্রতিনিধিকে পত্র লিখেছেন। কিন্তু এসব বিষয় অতি গোপনে রাখতে হবে, নইলে শেখর রাজার অনিষ্ট হ'তে পারে। আর আমার মতে সুজাওল খাঁ ভয়ানক অত্যাচারী, তাহার অত্যাচার নিবারণ করা কর্ত্তব্য।" বেহারীখান বলিলেন—একথা

গোপনই থাকবে, আমিও ইংরেজগবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখ্‌ছি। যদি ভগবান থাকেন, তবে কেহ অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বেনা। আর সুজাওন খাঁর কথা—বড় অত্যাচারী তার আর ভুল কি? কিন্তু খাঁ সাহেব বলশালী, বহুলোক তাঁহার অধীনে—আমার সাধ্য কি যে তাকে পরাজয় করি। তবে কৌশলে যদি কিছু করা যায়, তাহার চেষ্টা করা যাইবে। তোমায় আর সে বিষয়ে চিন্তিত হতে হবে না। জোতারামের অত্যাচারে আমরা জর্জ্জরিত, দেখি ভগবান কি করেন। ঈশ্বর ভাল মন্দ বিচার কর্‌বেন। আর যে বনবাসী ঠাকুরের কথা বলিলে,তিনি আমার নিকট এলে আমি সাদরে গ্রহণ করতেম ও তিনি আমার একজন প্রধান সহায় হতে পারতেন। আমিও তাঁহার সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের যথেষ্ট চেষ্টা কর্‌তেম। এখন তুমি যাও, বিশ্রাম করগে। একবার রাজা অভয় সিংহের নিকট তোমায় যেতে হবে। তাঁহার পিতা আমার বন্ধু ছিলেন, তিনি অবশ্য আমার সাহায্য করিবেন। রাজা অভয়সিংহ ধার্ম্মিক, বলিষ্ঠ ও নির্ভীকচিত্ত, ঈশ্বর তাঁহাকে জোতারামের কোপ হইতে রক্ষা কর্‌বেন। মথুরা সান সমস্ত শুনিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন, বেহারী সান কতক্ষণ তাহাকে দেখিয়া পরে বলিলেন—"ঈশ্বর এই বালককে রক্ষা করুন। একমাত্র বংশধর আমার এই সম্পত্তির মালিক। তবে মথুরা বেশ ধার্ম্মিক, ও বীর পুরুষ; অভয় সিংহের সঙ্গে তাহার সখ্যতা হওয়ার সম্ভাবনা,কারণ উভয়ে এক প্রকৃতির লোক। এই জন্যই আমি কেন্দ্রীদেশে এই বিপদ সঙ্কুল সময়েও পুত্রকে পাঠাইয়াছি।" ইহার পর বৃদ্ধ একটি বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া অদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন—সন্ধ্যার অন্ধকার সমস্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, কেবল বড় বড় দু একটী বৃক্ষ অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। দুর্গ সহজে কেহ আক্রমণ করিতে পারিবে না বুঝিলেন কিন্তু যদি ইংরেজরাজ তাহাকে রক্ষা না করেন,তবে আর উপায় নাই, নিশ্চিতই পরাজিত হইতে হইবে, এবং ধন প্রাণ সব বিনষ্ট হইবে। তিনি বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিয়া সায়ং সন্ধ্যাবন্দনাদির জন্য দেবালয়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি, এ।

দোল-পুর্ণিমা

—•:•:—

দোল-পূরণিমা-নিশি আহা কিবা সুখময়!
দোলাইয়া তরুলতা দক্ষিণ মলয় বয়।
অদূরে ঝিল্লীর রব,
ফুটেছে তারকা সব,
উঠেছে চাঁদের আলো, আলো ক'রে দশদিক্
জলিছে জোনাকীগুলি থেকে থেকে ঝিকমিক্।
বাজাইয়া ঢাক ঢোল
ঘন ঘন তুলি রোল
সুখে গ্রামবাসী করিতেছে আনন্দ বিমল।
আজি তারা যেন দুখ্‌ জালা ভুলেছে সকল।
সকলে মেখেছে ফাগ,
সুন্দর রক্তিম রাগ,

রাঙা তরু, রাঙা লতা, রাঙা পাতা ফুল ফল;
রাঙা তীর চুমে চলে রাঙা জাহ্নবীর জল।
গলাগলি মিশামিশি,
চোখে মুখে খেলে হাসি,
পুলকে পূরিত হিয়া নাহি আত্ম নাহি পর।
শুধু প্রাণে প্রাণে বহে যায় প্রীতির লহর।
রজনী গভীরা হল,
সকলি নীরব হ'ল,
নিদ্রা-মাঝে থেমে গেল আনন্দের কলতান।
কেন এ নীরব রাতে কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ?
এই দিনে এই ক্ষণে
কি যেন কি পড়ে মনে
কোনো ব্যথা-ভরা-গাথা যেন বিস্মৃতি-স্বপন!
তাই বুঝি থেকে থেকে জলে ভরে দুনয়ন!
এমনি মধুর রাতে
এই মধু পূর্ণিমাতে
এমনি মগন সুখে পঞ্চনদ বাসীগণ—
"গুর্জরের" ক্ষেত্রে রণ বাধিল তখন।
গেল স্বাধীনতা মান
দিল প্রাণ বলিদান
ক্ষণ আগে ছিল যারা আনন্দেতে নিমগন।
সেই কথা-স্মৃতি লয়ে জলে ভাসে দুনয়ন।

৺ধ্রুবলাল দত্ত।

কবিতা।

আদি কবি বাল্মিকীর দৃঢ় তপস্যায়,
পুণ্য তোয়া তমসার তটে করুণার
আর্দ্র চক্ষে উচ্চারিলা বেদমার বাণী,
নৃশংস নিষাদ পানে বক্র দৃষ্টি হানি,
ধীরে অতর্কিত পদে, কিংবা পুষ্পরথে
ত্রিদিবের কোন এক শান্তি কক্ষ হতে,
সহসা তরুণ স্নিগ্ধ অরুণ জ্যোতিতে
উজলিয়া দিগ্‌দেশ, পূত সুরভিতে
প্রক্ষিয়া সে গন্ধবহে, আনন্দ সঞ্চারি
ধরাতলবাসী মনে, অনূঢ়া কুমারী
"মানিষাদ প্রতিষ্ঠাম" মনোহর মালা,
তপস্বীর পূত কণ্ঠে পরাইলা বালা,
এরূপে আপনি হয়ে আত্ম নিবেদিতা
তপস্বীর তপঃ ক্লেশ নাশিলা কবিতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রার্থনা সঙ্গীত।

ভৈরবী—ঠুংরি।

(১) আমি কি হে প্রভু এমনি অভাগা,
প্রাণের এ জ্বালা কি জুড়াবেনা?
দিবানিশি মোর কেঁদে কেঁদে যায়,
নয়নের জল কি মুছাবেনা?
বুকভরা দুখে কতই যে ডাকি
শুনেও কি তুমি তা' শুনিবে না?
হৃদয়ের ব্যথা তুমি না বুঝিলে
আর তাহা কেহ ত বুঝিবে না!
শত দোষে দোষী তোমর চরণে
সে সকল দোষ কি ক্ষমিবেনা?
দীন হীন দাস আমি যে তোমার
এ ভেবে ও কি পদে রাখিবেনা?

---

(২) না মিটিল আশা কেবলি নিরাশা
ভবে আসা আমার সার হ'ল।
(আমার) গেল দিন বয়ে খেলাধূলা লয়ে
আমার উপায় কি হ'বে ব'ল!
(আমি) যত মনে করি মায়া মম ছাড়ি
ডাকি প্রাণ ভরি—"ওমা শঙ্করী
(তত) কি মায়ার টানে কোথায় কে জানে
নিয়ে যায় টেনে বুঝিতে নারি,
(ওমা) বড় সাধ মনে বসি নিরজনে
পূজিতে যতনে রাজীব পদ।
(সে) সাধে বাদ ওমা সেধোনা গো মা
দিয়ে পদ রাঙা ঘুচা বিপদ।

৺ধ্রুবলাল দত্ত।

উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক।

সপ্তম পত্র।

লোকে বলে—এ জীবন নিশার স্বপন। বস্তুতঃ, যখন আমি আলোচনা করি, মানুষের শক্তি কিরূপ সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ রহিয়াছে; যখন আমি চিন্তা করিয়া দেখি, এ দুঃখময় জীবন বহনের উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়া কিরূপে মনুষ্যের সকল প্রযত্ন নিয়োজিত রহিয়াছে;—তখন আমারও মনে স্বতঃই একথা উদিত হয়,—এ জীবন নিশার স্বপন। যখন আমি ভাবিয়া দেখি, মনুষ্য জীবনের কতিপয় রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য কিয়দ্দিন উৎসুক্য প্রকাশপূর্ব্বক পরিশেষে অদৃষ্টে আত্মসমর্পণ করিয়া কিরূপ নিশ্চিন্ত হয়; এই সংসার কারাগৃহে অনুক্ষণ আপনাকে বন্দীর অনুরূপ অনুভব করিয়াও, সেই কারাপ্রাচীরের গাত্রে অলীক ও অপ্রাকৃত সুখের চিত্র চিত্রিত করিয়া কিরূপ প্রীতি বোধ করিতে থাকে;—যখন এ সকল কথা মনে উদয় হইতে থাকে, সখা, তখনই আমি নির্ব্বাক হই, নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে থাকি, হৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখিতে থাকি। কিন্তু, হায়, কি ফললাভ করি? কোনও বিশ্বাস, সত্য অথবা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরিবর্ত্তে, কল্পনার আরও নিষ্ফল প্রয়াস, আরও অনুজ্জ্বল চিত্র, মায়াবিনী ভ্রান্তির আরও কুহকময়ী রচনা দেখিতে থাকি। চারিদিকে সংশয়ের অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসে। তখন এই অসীম পৃথিবীর শত সহস্র মানবের মত, আমিও নিজকে অবস্থাস্রোতে বিসর্জ্জন দিয়া ও নিজকে আত্মজ্ঞানবিমূঢ় জনগণ মধ্যে পরিগণিত ভাবিয়া, বৃথা আক্ষেপ করি। বিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, বালকগণের কষ্টকলাপে উদ্দেশ্যের কোনও স্থিরতা লক্ষিত হয় না। কিন্তু শিশুমতি বয়োবৃদ্ধেরাও যে অল্পবয়স্ক বালকদিগেরই মত জীবনের উৎপত্তি বা পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তামাত্র না করিয়া সংসার-কাননে উদ্দেশ্যহীনের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে থাকেন,—কেবল, বালক যেমন কখন মিষ্টান্নের লোভে, কখন বেত্রাঘাত ভয়ে কোনও কার্য্যে অগ্রসর, কোনও কার্য্য হইতে পশ্চাৎপদ হয়, সেইরূপ পুরস্কারের প্রত্যাশায় কিম্বা শাস্তির ভয়ে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত ও নিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন, কোনও আদর্শের অনুসারে স্বীয় চরিত্র গঠিত বা ইহজীবনের কার্য্যপ্রণালী উদ্ভাবিত করিয়া লয়েন না, ইহা তাঁহারা অস্বীকার করিলেও, আমি প্রত্যক্ষদৃষ্টবৎ সত্য বলিয়া মনে করি। সখা, তুমি হয়ত বলিবে যাহারা বালকদিগেরই মত ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে না, যাহারা সুখের ক্রীড়াপুত্তলী হস্তে পাইলেই আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, যাহারা বর্ত্তমান সুখে রত ও উপস্থিত প্রমোদে মত্ত হয়ত অভাব অনুভব করিলেই যাহারা তাহা মুখে ব্যক্ত করিয়া থাকে, এবং শিশু যেমন একটী অভিলাষিত বস্তু প্রাপ্ত হইলে, অপরটীর অভিলাষে স্নেহময়ী জননীর নিকট রোদনচ্ছলে আপন প্রার্থনা ব্যক্ত করে, সেইরূপ সম্ভোগের পর সম্ভোগান্তরে যাহাদের চিত্ত ধাবিত হয়,—তুমি হয়ত বলিবে এ জগতে একমাত্র তাহারাই সুখী। যাহারা একরূপ অল্পে পরিতৃপ্ত, তাহারা

সুখী সন্দেহ কি? বস্তুতঃ যাহারা ধন, মান, কিম্বা পার্থিব পদে পরিতৃপ্ত হইয়া, আপনাদিগকে পার্থিব দেবতা অথবা বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া অনুভব করেন, তাঁহাদের এরূপ স্বপ্নে সন্তোষের কথা স্মরণ করিলে, মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়। পক্ষান্তরে যিনি এ বিশাল সংসারে নিজকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অনুভব করেন, তিনি এ সকল পার্থিব প্রয়োজনের অকিঞ্চিৎকরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিয়া থাকেন,—"হে ধনিন্! তোমাতে ও দরিদ্র আমাতে কোনও বিভিন্নতা দেখি না। দরিদ্রের প্রাণান্তকর জীবন সংগ্রাম ও তোমার ধরণীকে সুরপুরীতে পরিণত করিবার সগর্ব্ব প্রয়াস—এ দুয়ের উদ্দেশ্যের কোনও বিভিন্নতা দেখি না। দরিদ্রের ন্যায় তুমিও এ সংসারে স্বীয় সুখের চিত্রে স্থায়িত্ব বিধানের জন্য একান্তমনে প্রযত্ন করিতেছ; কেবল উভয়ের সুখভোগের তারতম্য এইমাত্র প্রভেদ।" শান্তি বল, সুখ বল, এতাদৃশ মহাত্মার দুর্লভ নহে। মনুষ্যজ্ঞানে যদিও তিনি নিজ শক্তির ক্ষেত্র সঙ্কুচিত দেখেন, তথাপি মুক্তির অভ্রভেদ দৃশ্যে নিরন্তর তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট রহিয়াছে। সংসার কারাগৃহে তিনি আপনাকে বন্দী বোধ করিলেও, কারাক্লেশ দুর্বিসহ হইলে, কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া মুক্ত হইবার কৌশল তাঁহার করতলগত রহিয়াছে।

অষ্টম পত্র।

কোন্ কোন্ স্থানে আমার চিত্ত স্বতঃ অনুরক্ত, তাহা তুমি জান। তুমি জান নির্জ্জনাবাস আমার কত আকাঙ্ক্ষার বস্তু এবং নির্জ্জন প্রকৃতির সেই দৃশ্যচয় আমার চিত্তের অভিমত করিয়া নিরূপণ করিতে কত প্রীতি অনুভব করি। এই স্থানে একখানি কুটির পাইয়াছি—এরূপ কুটীর যাহা সর্ব্বাংশে আমার অভিলাষের অনুরূপ, ইহা একটী ক্ষুদ্রগিরিগাত্রে রচিত। এস্থান ওয়ালহিম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত এবং নগর হইতে অর্দ্ধযোজনান্তরে অবস্থিত। এই গিরিশৃঙ্গের উপর দণ্ডায়মান হইলে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহের উন্মুক্ত দৃশ্য নয়ন পথে পতিত হয়। এস্থানে একটী পান্থনিবাসও আছে। এক সহৃদয়া প্রবীণা এই পান্থনিবাসের কর্ত্রী। ইহার চরিত্রে বেশ একটু মাধুর্য্য আছে। আমি ইহারই নিকট হইতে প্রয়োজনীয় মদ্য চা, কাফি প্রভৃতি লইয়া থাকি। আবার আমার আনন্দের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্যই যেন উপাসনা মন্দিরের পুরোদেশে দুইটী তরু শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গনভূমি স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দরিদ্র কৃষককুলের পরিচ্ছন্ন পর্ণকুটীর সেই প্রাঙ্গণের প্রান্তরেখায় কেমন শোভা পাইতেছে! এরূপ নিভৃত অথচ এরূপ মনোরম স্থান তোমার কল্পনায় আসিবে না। সহৃদয়া পান্থনিবাসকর্ত্রী আমার অনুরোধে এই স্থানে টেবিল ও চেয়ার প্রেরণ করিলে, আমি এই মনোজ্ঞ প্রকৃতির অন্তরালে বসিয়া কাফি পান করিতে করিতে হোমর পাঠ করি। এই স্থান পূর্ব্বে আমার অপরিজ্ঞাত ছিল। একদা দৈবযোগে অপরাহ্ন ভ্রমণে বহির্গত হইয়া এই স্থানে উপনীত হই। সে অতি

রমণীয় দিনই ছিল। কৃষকগণ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে গিয়াছিল। দেখিলাম—একটী চতুর্বর্ষবয়স্ক বালক একটী সুকুমার শিশুর রক্ষণভার গ্রহণ করিয়া সেই মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট রহিয়াছে—নিকটে আর জনমাত্র নাই। দেখিলাম বালক একবার শিশুটীকে তুলিয়া বুক্ষে গ্রহণ করিতেছে, কখন নিজ বাহুদ্বয়ে বৃক্ষের পত্র গ্রথিত করিয়া শিশুর জন্য আসন রচনা করিয়া দিতেছে। শস্য ক্ষেত্রের শ্যামশোভা দর্শনের আগ্রহে বালকের চঞ্চল নীলিম নয়ন যুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছিল; কিন্তু বালক, শিশুর স্বাচ্ছন্দে মনোযোগী হইয়া, নিজ অবস্থানের একভাবই রক্ষা করিতেছিল। পবিত্র ভ্রাতৃস্নেহের সেই নিদর্শনে আমার অন্তর পুলকিত হইল। ক্ষেত্রের একদেশে একটী লাঙ্গল পতিত ছিল। আমি তাহারই উপর আসীন হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সহিত ভ্রাতৃস্নেহের সেই প্রীতিকর চিত্র চিত্রে অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভ্রাতৃদ্বয়ের চিত্রাবসানে, প্রত্যক্ষীভূত আরও কতিপয় বস্তু দৃষ্টবৎ অনুক্রমে সন্নিবেশিত করিয়া দেখিলাম, অনতিকালমধ্যে, কল্পনার নিরপেক্ষ জ্যোতি-চিত্রে অতি চমৎকার ভাব ও নিপুণতা পরিস্ফুট করিয়াছে। অদৃষ্টে, চিত্রাঙ্কণে কেবল প্রকৃতির অনুকরণ করিবার যে সঙ্কল্প পূর্ব্ব হইতে ছিল, তাহা আরও বদ্ধমূল হইল। প্রাকৃতিক দৃশ্য অনুকরণে নিঃশেষিত হইবার নহে। প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার হইতে নিত্য নব রত্ন সংগ্রহ করিয়াই কবি ও চিত্রকর

কাব্য ও চিত্রের সমৃদ্ধি সাধন করিতে পারেন এ বিষয়ে বিধি ও সূত্র, সমাজ পরিচালকের জন্য প্রবর্ত্তিত বিধান সমূহেরই ন্যায় ক্ষীণ শক্তি। তবে যেমন সমাজের শিক্ষাসম্পন্ন কোনও ব্যক্তি সমাজ-বিধানের উল্লঙ্ঘন না করিয়া তাঁহার সমাজের, অথবা তাঁহার প্রতিবাসীর, বিদ্বেষী হইতে পারেন না; সেইরূপ যে চিত্রকর চিত্রাঙ্কণ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া তুলিকা সঞ্চালিত করেন, তাঁহার তুলিকা হইতে একেবারে অস্পৃশ্য অথবা উপহসনীয় চিত্র অঙ্কিত না হইতে পারে, কিন্তু বিধি ও সূত্রের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিয়া দাও, তাহা হইলে সেই পরিমাণে সৌন্দর্য্যও পরিবর্দ্ধিত হইবে না? তুলনা করিলে সৌন্দর্য্যের লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই সাধিত হয়, স্বীকার করিতে হইবে। ইহাও অবশ্য বলিব, যে এই বিধি ও সূত্র প্রতিভার স্বচ্ছন্দগতির অন্তরায় স্বরূপ। প্রতিভা ও প্রেমের গতি তুলনা করিয়া দেখা যাউক। মনে কর, যথা, কোনও যুবক যুবতী প্রণয়িনীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগে তাহাকেই তাহার জীবনের ধ্যান ও জ্ঞান করিয়াছে। যুবতী যে তাহার স্নেহময় হৃদয় রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বরী—ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত যুবক কোনও আয়াস স্বীকারে পশ্চাৎপদ নহে, কোনও স্বার্থত্যাগে সঙ্কুচিত নহে। এমন সময়ে কোনও স্থিরপ্রজ্ঞ ব্যক্তি আসিয়া যুবককে এরূপে সম্বোধন করিতে পারেন,—"বৎস! মনুষ্যের কোমল প্রকৃতি হইতে লালসাময় অনুরাগ প্রসূত হয়,—এজন্য উহা সর্ব্বদা সুসংযত রাখিবে। যদি কোন কর্ত্তব্য অসম্পাদিত না থাকে, তখনই

কেবল প্রণয়িনীর চিত্তবিনোদনে নিযুক্ত হইতে পার। আর্থিক অবস্থার অনুরূপে প্রণয়িণীকে প্রেমোপহার দিবে—সে উপহারেও বাহুল্য করিবে না।" এরূপ নির্দ্দেশ পালন যদি যুবকের সম্ভব হয়, সকলে তাহাকে সঞ্চয়কারী স্বীকার করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যুবকের তাদৃশ অনুরাগে গম্ভীরতা নাই। বিধি ও সূত্রের নির্দ্দেশে পরিচালিত চিত্রকরের অবস্থা ইহার অনুরূপ। তাহার চিত্র-ভ্রম বা প্রমাদ রহিত হইতে পারে, কিন্তু, সে চিত্রে, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ন্যায় সজীব ও উৎফুল্ল ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রতিভা স্রোত অবাধে প্রবাহিতা হইতে চায়। স্বকার্য্য-কুশল কতিপয় ব্যক্তি যদি সে স্রোতের গতি সংযত না করিত, তবে তাহার উন্মুক্ত প্রবাহবেগ দেখিয়া জগৎ আজ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত। এই কর্ম্মকুশল ব্যক্তিগণ সেই স্রোতের তীরাশ্রয়ী হইয়া তথায় রুচিময় ধম্ম ও উপবন নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং প্রতিভাক স্রোতোচ্ছ্বাসে সতত সশঙ্ক থাকিয় কৌশলে পরিখাদি রচনাপূর্ব্বক প্রতিভা-স্রোতকে প্রতিহত করিয়া সযত্নে আত্মরক্ষা করিতেছে।

শ্রীঃ—

নবীন চন্দ্র

(১৩১৯ সনের ১০ই মাঘ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে স্বর্গীয় কবিবর নবীন চন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতি সম্মানার্থ সভায় পঠিত)

হে কবি,
বিরলে বসি ভাবিতেছি তব মুখখানি
প্রতিভার ছবি।
পলাশীতে তেজ বীর্য্য, রাজনীতিজ্ঞান ;
রৈবত-কুরু-প্রভাসে কি আদর্শ মহান ;
কিবা পুণ্য স্রোতস্বতী হৃদয়ের তব
অমিতাভ অমৃতাভে বহিতেছে নব !
যে দিকে ফিরাই আঁখি প্রতিভার ছবি ;
অক্ষরে অক্ষরে হেরি তোমাতে, হে কবি।
আদর্শ স্ত্রীজাতি চিত্র—চিত্র সুশিক্ষার—
করিয়াছ পত্রে পত্রে চিত্রিত তোমার।
রঙ্গমতী—জীবনের ম্লান চিত্রখানি—
চিত্রিয়াছ কত দুঃখে, আহা রে না জানি !
পূরবে নবীন চন্দ্র হইয়া উদয়
যে শান্ত আলোকে পূর্ণ জগত-হৃদয়
করিয়াছ, নাহি তার অন্ত কোন দিন।
রবি-অভ্যুদয়ে কিম্বা হেমচন্দ্রে লীন
হয় নাই কণামাত্র কিরণ তোমার ;
যত যাবে দিন তত ঊর্দ্ধে সবাকার
উঠিবে নবীন চন্দ্র—হে চির-নবীন,
কৃষ্ণ পক্ষে বক্ষ তব না হইবে ক্ষীণ।
বঙ্গবেদী-পুরোভাগে স্বর্ণ সিংহাসনে
রবে তুমি চিরদিন অজেয় অমর।
হে কবি-সম্রাট্, যেন জন্মজন্মান্তরে
নেহারি তোমারে মোরা সবার উপর।

* * *

অহিফেন-মুগ্ধ, মিরজাফরের মত
মুক, হে ভারতবর্ষ, মেলিয়া নয়ন
আদর্শ-নবীন গ্রন্থে নবীন আলোকে
নবীন কর্ত্তব্য পথ কর বিলোকন।

কি আদর্শে স্ত্রী-চরিত্র করিবে গঠিত,
কি আদর্শে পুরুষের বাঁধিবে পরাণ,
কি আদর্শে ধর্ম্মপথ করিবে চালিত,
কি আদর্শে নিয়োজিবে রাজনীতিজ্ঞান,
কি আদর্শে সমাজেরে করিবে গঠিত,
কি আদর্শে দম্পতীর করিবে মিলন,
কি পবিত্র শক্তিবলে বিষম শক্তিরে
বাঁধি সমতায়, গড়ি জাতীয় জীবন
হবে অগ্রসর,—কবি নিরজনে বসি
চিত্রিয়া রেখেছে হের আদর্শ তোমার।
নির্জ্জীব ভারতবর্ষ, কর ধীরে নিরীক্ষণ
গড়াও সোণার ক্ষেত্রে সুবর্ণ সংসার।
দেখিবে হরিকুলেশ আসিবে ফিরিয়া
সুদুর পশ্চিম হতে, পুনঃ সুদর্শন
ভদ্রা-সত্যভামা-সুলি-শৈল-ভবানীরে
করিবে সোণার ক্ষেত্রে সুখে নিরীক্ষণ।
পার্থ অঙ্কলক্ষ্মী ভদ্রা, পার্থের মূর্চ্ছায়
যোদ্ধা ও সারথীরূপে করিবে সমর;
ভীত দুর্য্যোধন-কর্ণ-দুঃশাসন যত—
পাপমূর্ত্তি মুহূর্ত্তেকে হইবে অন্তর।
ঐ শুন মৃদুকণ্ঠে করিয়া আহ্বান
কে গাইছে; কি মধুর কি মোহন তান!
"না দিদি আমরা নারী, বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রু মিত্র নাই।
বরিষার ধারামত অজস্র রমণী প্রেম
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই।
• • •
মিত্রকে যে ভালবাসে সকাম সে ভালবাসা,
সেত ক্ষুদ্র ব্যবসার দায়।
শত্রু মিত্র ভরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ
সেই জন দেবতা আমার।"
সম্মোহনবাণ বিদ্ধ কে তুমি বিরাগী?
এত বন্ধনেও তব অনাবদ্ধ প্রাণ!
জগতের হিততরে সর্ব্বস্ব আপন
অকাতরে মুক্ত হস্তে করিতেছ দান।
বৃদ্ধ জনকেরে ডাকি গম্ভীর বদনে
কে বালক কহিতেছ সুমিষ্ট বচনে—
'পিতঃ হিংসাময় ভাব কর পরিহার,
হয় পদে পদে জীব হিংসা সংঘটিত।
পিতঃ জীবে কর দয়া, কর সর্ব্বজীবে সুখী,
কর জগতের হিতে প্রাণ সমর্পিত।"
না শুনিয়া উপদেশ বৃদ্ধ পিতা তব,
করিছেন বদ্ধ চক্রে নিত্য নিত্য নব,
হেরিয়া কে তুমি, দেব, অটল-হৃদয়
বাঁধিয়া কর্ত্তব্যপথে কহিছ—"নিশ্চয়
কাটি জনকের স্নেহ—স্নেহ জননীর—
জীব দুঃখে দিব প্রাণ করিলাম স্থির।
শত পত্নী, শতপুত্র, শত মাতা পিতা
করে অবরুদ্ধ পথ, হুঙ্কক, প্লাবিত
করে নয়নের জল পূর্ণ হাহাকার,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম পালিব নিশ্চয়।"
করে সুদর্শন, উচ্চে বাজাইয়া বাঁশী,
ঐ শুন কে গাইছে মাতাইয়া প্রাণ—
"এস হে ভারত-বাসী, এস এ কদম্ব মূলে;
'সোণার-ভারত' আমি করিব প্রদান।"
এক ধর্ম্ম একজাতি,
একমাত্র রাজনীতি,
একই সাম্রাজ্য নাহি হইলে স্থাপিত,
জননীর খণ্ডদেহ হবেনা মিলিত।
বাঁধি ধর্ম্মনীতি পাশে

মিলাইব অনায়াসে
জননীর খণ্ডদেহ ; করিয়া চালিত
জ্ঞানাঙ্কুশে, ভেদজ্ঞান করিব রহিত।
শিখাব এ তত্ত্ব মর্ম্ম ;
এক জাতি এক ধর্ম্ম ;
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,
সমগ্র মানব প্রজা—রাজা নারায়ণ।
এক ধর্ম্ম, একজাতি,
একরাজ্য, একনীতি,
সকলের একভিত্তি—সর্ব্বভূত হিত ;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম,
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম,—
এক মেবা দ্বিতীয়ম ! করিব নিশ্চিত
ওই ধর্ম্মরাজ্য মহাভারত স্থাপিত।"
হে কবি,
দুরলে বসি নিশি দিন আমি
পূজিতেছি পা দু'খানি—
দেবতার ছবি।

শ্রীআশুতোষ দাশগুপ্ত, মহলানবীশ।

সংবাদ ও সমালোচনা।

রামেশ্বর দুর্গ। শ্রীঅমলানন্দ বসু বি, এ, প্রণীত, একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসচ্ছলে ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনায় পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। ভাষা বেশ সরল ও প্রাঞ্জল। গ্রন্থকার সাহিত্য ক্ষেত্রের নূতন মালী হইলেও আমাদের বিশ্বাস তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক ভবিষ্যতে বেশ সুফল প্রসব করিবে, এই পুস্তক পাঠে এরূপ আশা করা যায়। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। মূল্য ॥০ আনা প্রাপ্তিস্থান খাগড়া, বহরমপুর গ্রন্থকারের নিকট।

পাঠাগার প্রতিষ্ঠা। এতদিন পরে হাওড়ার একটি ঘোর অভাব মোচন হইতে চলিল। হাওড়ার ন্যায় প্রতিষ্ঠান্বিত জেলায় একটি সাধারণ পাঠাগার বা শিক্ষা-মন্দির ছিল না। সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম হিতৈষী, উত্তর-পাড়ার স্বনাম ধন্য জমীদার রায় জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের প্রভূত অর্থ সাহায্যে এবং আমাদের সাহিত্য সুহৃদ্, বাণীর নিরবচ্ছিন্ন সেবক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় ও অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু মহাশয়ের প্রযত্নে ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। হাওড়ার লোকপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট সি, এ, রাডীস্ মহোদয় এ কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী, তাঁহার সহানুভূতি না থাকিলে এ কার্য্য এতদূর অগ্রসর হইত না। এইরূপ মণি কাঞ্চন সংযোগে যে এ কার্য্য সফল হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বিশেষতঃ লাহিড়ী মহাশয় এ কার্য্যে যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে হাওড়ার জনসাধারণ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। এক্ষণে বদান্যবর রায় জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের ন্যায় যদি দেশের ধনকুবেরগণ বাঙ্গালার দুস্থ সাহিত্যসেবীগণের অভাব ও অভিযোগ মোচন করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে দেশে সাহিত্যসেবীর আর এরূপ দুর বস্থা থাকে না। ভগবানের নিকট আমরা রায় বাহাদুর মহোদয়ের দীর্ঘজীবন ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

আলোচনার ১৩১৯ সালের সুচীপত্র।

বিষয় — পৃষ্ঠা

হিন্দু-সমাজের মুখপত্র

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

ষোড়শ বর্ষ—ষোড়শ ভাগ।

(১৩১৯ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ)।

সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—কর্ম্মকর্ত্তা—

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনা-কার্য্যালয়,—১০৮ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

Printed & Published by Jugal Kishore Singha, at the Karmayoga Printing Wo…

Howrah.

বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা, ডাক মাশুল ৵০ আনা